Boighar.com

রোকন

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

দখল

শফীউদ্দীন সরদার

বইঘর

Boighar.com

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

বাংলা সাহিত্যাকাশে শফীউদ্দীন সরদার একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। সৃজনশীল কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি আজ অনেক দূর বিস্তৃত। মূলত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। তবে উল্লখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। সেগুলোও যথেষ্ট পাঠক নন্দিত হয়েছে।

ব্লোকন

'দখল' স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লেখা রাজনৈতিক উপন্যাস। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পর একটি রাজনৈতিক দল দেশকে তাদের বাপ-দাদার পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করে দখলদারিত্ব চালাতে থাকে। এই দখলদারিত্ব কত বীভৎস্য নোংরা ও খোলামেলাভাবে হয়েছে তাই এই উপন্যাসের উপজীব্য।

এই রাজনৈতিক দলটি স্বাধীনতাযুদ্ধের সকল কৃতিত্বের একক দাবীদার আর তাদের দৃষ্টিতে অন্য সবাই রাজাকার। প্রতিবেশী দেশের ছত্রছায়ায় দেশজুড়ে চলছে জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা, সন্ত্রাস আর বোমাবাজির রাজনীতি। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, সামাজিক অবক্ষয়, সন্ত্রাস, দুর্নীতির করালগ্রাসে নিপতিত আজ বাংলাদেশ। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও শুধুমাত্র ঐ রাজনৈতিক দলটির দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের কারণে এর সুফল জনগণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতির ফলে জনগণ প্রতারিত হচ্ছে বার বার।

বইঘর

লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্বার্থকভাবে তুলে ধরেছেন বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। বইটি দেশদ্রোহীদের বুকে আগুন জ্বালাতে এবং দেশপ্রেমিকদের মনে আলো জ্বালাতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দখল

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশনায়
www.boighar.com
বাংলা সাহিত্য পরিষদ

Dakhal
Written by **Shafiuddin Sarder**
Published by Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410, 0171581255
Price Tk.80.00 Only.
ISBN-984-485-094 -0
BSP-124 -2005
www.boighar.com

দখল
শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, (ডাক্তারের গলি)
ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০, ০১৭১৫৮১২৫৫

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা-২০০৫
www.boighar.com
লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত
বাসাপ্র ১২৪

প্রচ্ছদ
ফরিদী নূ'মান

মূদ্রক
ইছামতি প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

বিনিময়: ৮০.০০ টাকা মাত্র

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

www.boighar.com

এই উপন্যাসের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য
আমি ***দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সকল কলাম লেখক,***
বিশেষ করে ***জনাব হারুনুর রশীদের*** *প্রতি*
গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

দখল

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

লেখকের অন্যান্য বই

www.boighar.com

বিদ্রোহী জাতক
ঝড়মুখী ঘর
রোহিনী নদীর তীরে
রামছাগলের আব্বাজান
বখতিয়ারের তলোয়ার
গৌড় থেকে সোনারগাঁ
যায় বেলা অবেলায়
বার পাইকার দূর্গ
রাজ বিহঙ্গ
শেষ প্রহরী
বারো ভূইয়া উপাখ্যান
প্রেম ও পূর্ণিমা
বিপন্ন প্রহর
সূর্যাস্ত
পথহারা পাখী
বৈরী বসতি
অন্তরে-প্রান্তরে
দাবানল
ঠিকানা
অবৈধ অরণ্য
অপূর্ব অপেরা
শীত বসন্তের গীত
চলন বিলের পদাবলী
পাষাণী
দুপুরের পর
রাজ্য ও রাজ কন্যারা
থার্ড পণ্ডিত
মুসাফির

১

www.boighar.com

ঃ আরে এইলোক এই-এই, হা করে এদিকে চেয়ে আছো কেন?

ঃ জি, কোন্ দিকে?

ঃ এই রাস্তার দিকে, মানে আমার দিকে!

ঃ না চেয়ে নেই, দেখছি।

ঃ দেখছো! কি দেখছো?

ঃ পাসিং-শো। উহ! সাত্যিই দেখার মতো।

ঃ পাসিং-শো! পাসিং-শো মানে?

ঃ মানে চলমান দৃশ্যাবলী।

ঃ চলমান দৃশ্যাবলী?

ঃ জি-জি, হরেক রকম দৃশ্যাবলী। এ বলে আমাকে দেখো, ও বলে আমাকে দেখো। ঐযে, ঐযে এক কানাফকির যাচ্ছে, আসলেই কিন্তু ও কানা নয়। মানুষ দেখলে কানা হয়, মানুষ কাছে না থাকলে চোখ মেলে। ঐযে-ঐদিকে-ঐদিকে যারা দাঁড়িয়ে—

ঃ থামো। তুমি আমার দিকে চেয়েছিলে কেন সেই কথা বলো?

ঃ ঐযে বললাম, দেখছিলাম।

ঃ আমাকে দেখছিলে?

ঃ জি। দেখছিলাম মানে, ঠাহর করার চেষ্টা করছিলাম?

ঃ তার অর্থ? কি ঠাহর করার চেষ্টা করছিলে?

ঃ আপনি পুরুষ না মহিলা-এইটা।

ঃ নন্‌সেন্স্! www.boighar.com

সদর রাস্তার উপর এক দোকান। এই দোকানের দিকেই আসছিল এক উগ্র আধুনিকা। বব্‌কাটিং চুল, ঠোঁটে রং, চোখে গগল্‌স্ । গায়ে ডানাকাটা টাইট এক গেঞ্জি। পরনেও ঐ একই রকম টাইট এক ফুলপ্যান্ট। গায়ে কাপড় বলতে সাকুল্যে এই দুই পীস্। কিন্তু এই দুই পীস্‌ই এতটাই টাইট যে, এতে করে গোপন অঙ্গগুলি গোপন না থেকে একেবারেই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এইদিকেই সবিস্ময়ে চেয়েছিল দোকানদার। নাম ফারুক মাহমুদ। আধুনিকাটিকে দোকানের দিকে আসতে দেখেই চোখ নামিয়ে নিলো দোকানদার ফারুক মাহমুদ। আধুনিকাটি দোকানের কাছে এসেই শুরু করলো প্রশ্নের পর প্রশ্ন। প্রশ্নোত্তরের এক পর্যায়ে মহিলাটি প্রশ্ন করলো "কি ঠাহর করার চেষ্টা করছিলে?" উত্তরে ফারুক মাহমুদ বললো-"আপনি পুরুষ না মহিলা—এই টা।

এ জবাবে মহিলাটি ধমক দিয়ে বললো, জি? মহিলাটি ফের প্রশ্ন শুরু করলো। বললো, কোন্ জংগল থেকে এসেছো? এর আগে মেয়ে মানুষ কখনো দেখোনি?

ঃ জি আগে দেখেছি। কিন্তু এখন আর দেখতে পাইনে তেমন।

ঃ দেখতে পাওনা কেন? এই সদর রাস্তায় বসে থেকেও দেখতে পাওনা?

ঃ কি করে পাবো ম্যাডাম? কোনটা ছেলে আর কোন্টা মেয়ে এইটেই বুঝে উঠতে হয়রান হই, বেশি আর দেখতে পাবো কি করে? আপনারা যা শুরু করেছেন—

ঃ শুরু করেছি মানে? কি শুরু করেছি? www.boighar.com

ঃ মেয়ে হয়ে জন্মে মরদের পোশাক পরেন কেন? আল্লাহ তায়ালা মেয়ে বানিয়েছেন আপনাদের। শত চেষ্টা করেও কি আর মরদ হতে পারবেন?

ঃ শাট্আপ্! চেহারাখানা তো বাগিয়েছো জব্বোর। এটিকেট্টা রপ্ত করতে পারোনি?

ঠিক এই সময় সেখানে এগিয়ে এলো আর এক আধুনিকা। ঐ একই রকম উগ্র। প্রথম আধুনিকাটিকে উদ্দেশ্য করে দ্বিতীয় মহিলাটি প্রশ্ন করলো, কি হলোরে বন্দনা? এত ক্ষেপাক্ষেপি করছিস্ কেন?

তাকে আসতে দেখে প্রথম আধুনিকা, অর্থাৎ বন্দনা বললো, আরে মাধুরী যে! আয় আয়, মাকাল ফল দেখ্বি তো আয়—

কাছে এসে মাধুরী বললো, সেকি! খুব ক্ষেপে গেছিস্ মনে হচ্ছে!

ঃ গেছি কি আর সাধে?

ইশারায় ফারুক মাহমুদকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, দ্যাখ্ না, চেহারা দেখলে বোঝার উপায় নেই—এমন লোক এটিকেট্ জানে না। বলে কি না, "মেয়ে হয়ে মরদের পোষাক পরেন কেন?" তুই বল্, এই যুগে এমন প্রশ্ন কেউ করে? বিশেষ করে একজন ভদ্রমহিলাকে?

মাধুরী বললো, বাদ দে এদের কথা। সব মানুষ সমান শিক্ষা পায় না। চেহারা ভাল হলেই কি মানুষ জ্ঞানীগুণী অগ্রসর মানুষ হয়, না চিন্তা-চেতনা উন্নত মানের হয়? তা হয় না। সব কিছু নির্ভর করে শিক্ষা আর পরিবেশের উপর।

ঃ মাধুরী! www.boighar.com

ঃ এ যুগেও এ সমাজে গিজগিজ করছে অনগ্রসর মানুষ। যারা অনগ্রসর, মানে ব্যাক্ডেটেড্, তারা এই রকমই বলে। এদের কথায় কান দিতে যাস্ কেন? কিছু নেয়ার দরকার হলে, সরাসরি তা নিবি আর কেটে পড়বি। এদের কি পাত্তা দিতে আছে?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা ঠিক।

কিছুটা নিম্ন কণ্ঠের হলেও সব কথাই কানে গেল ফারুক মাহমুদের। একজনের মুখের সামনে তাকে নিয়ে এমন আলোচনা কোন এটিকেটে পড়ে, তা মাথায় তার ঢুকলো না। সে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শুধু। বন্দনা এবার তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চট্‌পট্ বললো, দেখি, এক প্যাকেট ফাইভ ফাইভ সিগারেট দাওতো?

শুনে মাধুরী বললো, সিগারেট! সেকি। গতকাল বিকেলেই তো গোটা এক প্যাকেট কিন্‌লি। প্যাকেটটা ফেলে এসেছিস্ বুঝি?

বন্দনা বললো, ঠিক ধরেছিস্। রাস্তায় এসে দেখি, প্যাকেটটা আনা হয়নি। যা নেশা পেয়েছে না, তর সইছে না।

কপালে ভাঁজ পড়লো ফারুক মাহমুদের। কি তাজ্জব! মেয়েছেলের নেশা হয়েছে সিগারেটের! তর সইছে না!

কণ্ঠে জোর দিয়ে বন্দনা ফের বললো, কি হলো? চুপ্ রইলে যে? এক প্যাকেট সিগারেট দাও। ফাইভ্-ফাইভ্।

ফারুক মাহমুদ থতমত খেয়ে বললো, আমি তো সিগারেট বেচিনে বন্দনা দেবী! আপনি অন্য দোকানে দেখুন।

ঃ সিগারেট বেচোনা?

ঃ না দেবী, না।

ফের রুষ্ট হলো বন্দনা। বললো, দেবী! সে আবার কি? দেবী-দেবী করছো মানে?

ঃ কেন, আপনার নাম কি শ্রীমতি বন্দনা দেবী নয়?

ঃ আরে! দেবী হবে কেন? আমার নাম মিস্ বন্দনা হক।

ঃ বন্দনা হক?

আবার ধাক্কা খেলো ফারুক মাহমুদ। ব্যস্তকণ্ঠে বললো, দোহাই, কিছু মনে করবেন না, আপনার পিতার নাম?

ঃ মিঃ শামসুল হক।

ঃ তাজ্জব!

ঃ কেন, পিতার নাম কেন?

ঃ না-না, ও কিছু নয়। তা উনি কি মাধুরী চ্যাটার্জী, না মাধুরী মুখার্জী?

ঃ তবেরে! চ্যাটার্জী মুখার্জী হবে কেন? ওর নাম মিস্ মাধুরী মীর্যা। পিতার নাম মহসীন মীর্যা।

ঃ সাব্বাস্।

ফারুক মাহমুদের চোখে মুখে অপরিসীম বিস্ময়। বন্দনা হক দুচোখ গরম করে বললো, তার অর্থ?

ফারুক মাহমুদ খেদের সাথে বললো, মুসলমান ঘরে জন্ম আপনাদের, অথচ মুসলমান নাম খুঁজে পাননি আপনাদের আব্বা-আম্মারা? এতটাই উদাসীন আর বেখেয়াল?

বন্দনা হক ধমক দিয়ে বললো, থামো। নামের আবার মুসলমান—অমুসলমান কি আছে? ও সব কূপমন্ডুকতা কেন? নামটা আধুনিক হতে হবে না?

অনর্থক তর্কে না গিয়ে ফারুক মাহমুদ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, জি-জি, তা ঠিক।

বন্দনা হক সরোষে বললো, যত্তোসব মৌলবাদী কথাবার্তা।

এরপর মাধুরীকে বললো, আয়রে মাধুরী, ঐ সামনের দোকানে দেখি—

আর না দাঁড়িয়ে বন্দনা হক চলতে শুরু করলো। মাধুরী মীর্যা বললো, ভারসিটিতে যাবিতো?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভারসিটিতেই যাবো। সিগারেটটা নেই আগে, আয়—

চলে গেল বন্দনা আর মাধুরী। তাদের গমন পথে চেয়ে থেকে ফারুক মাহমুদ ভাবতে লাগলো—এরই নাম কাল্‌চার‍্যাল আগ্রাসন। কি ধোলাইটাই না করা হয়েছে মগজ এদের।

"ইউরেকা! এই যে চাঁদ, তুমি এইখানে?"—

আওয়াজ দিয়ে ছুটে এলো ফারুক মাহমুদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনোয়ার হোসেন।

চমকে উঠে ফারুক মাহমুদ বললো, আরে মনোয়ার তুই?

মনোয়ার হোসেন বললো, আমারও তো সেই কথা। তুই এখানে?

ফারুক মাহমুদ বললো, এখানে দোকান খুলেছি।

মনোয়ার হোসেন বললো, হ্যাঁ, সেইটাই তো শুনলাম।

তা প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেটগিরি বাদ দিয়ে একদম দোকানদারী?

ফারুক মাহমুদ হাসি মুখে বললো, দোকানদারীই বা খাটো কিসে? এটাতো ব্যবসা, মানে বাণিজ্য।

ঃ বাণিজ্য?

www.boighar.com

ঃ জি, আয় উপার্জনের সেরা পথ। শুনিসনি— রসূলের (স) কথা– সত্তর ভাগ রিযিক আছে বাণিজ্যে। আর হিন্দু শাস্ত্রের কথা বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, তদার্ধনাং কৃষি কাজে, তার অর্ধেক রাজ সেবায় আর ভিক্ষায় নৈবচ-নৈবচ?

বুড়ো আঙ্গুল নাড়তে লাগলো ফারুক মাহমুদ। মনোয়ার হোসেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, বটে।

ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যই সেরা জীবিকা, বুঝলে? আমাদের ধর্মেও ব্যবসাকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নবী করিম (স) ও ব্যবসা করতেন নিজে।

ঃ তাই যদি বুঝলি, তাহলে পাশ করার সাথে সাথে নবী করিম (স) এর প্রদর্শিত পথ বাদ দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হতে গেলি কেন?

ঃ সখে।

ঃ তাহলে আবার তা ছাড়লি কেন?

ঃ ওটাও ঐ সখেই বলতে পারিস্।

ঃ কি রকম?

ঃ জানিস্ তো, নিজে আমি বাদশাহ নই, কিন্তু মেজাজটা একদম বাদশাহর। তাই ঐ নকরীটা আমি হজম করতে পারলাম না। মানে ওটা আমার ধাতস্থ হলো না।

ঃ কেন ধাতস্থ হলো না কেন?

ঃ কি করে হবে? আগের দিন তো নেই আর—এখন হাকিমী করতে হলে অনেকটা অন্যের হুকুম মেনে করতে হয়। স্বাধীন ভাবে হুকুমজারী করার পরিবেশটা এখন আর অনেকখানিই নেই।

ঃ অনেকখানিই নেই? না থাকার কারণ।

ঃ অনেক। ছোটবড় অনেক কারণ। সব কারণের বড় কারণ বর্তমান রাজনীতি। জানিস তো, আদালতের অর্থাৎ হাকিমের বিরুদ্ধে আজকাল লাঠি মিছিলও হয়?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ তা অবশ্য জানি।

ঃ পাশাপাশি, ছোট কারণ আছে আরো অনেক। অনেক ক্ষেত্রেই দারোগা পুলিশেরা টাকা খেয়ে জেল-জামিন দেয়াটা আগেই ফায়সালা করে ফেলে আর সেই মোতাবেক পরোক্ষভাবে চাপ ফেলে হাকিমের উপর। চাকরীর উপরওয়ালারাও মাঝে মাঝে ঐ একই ভাবে হস্তক্ষেপ করে হাকিমের হাকিমীর উপর। এর সাথে রাজনৈতিক কারণটা তো প্রকট ভাবে আছেই। রাজনৈতিক নেতা উপনেতা আর পাতিনেতাদের ফোন আর বদলী করার হুম্‌কি ধমকি এটা প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সব পুলিশ-দারোগা, উপরওয়ালা আর রাজনৈতিক নেতা-উপনেতারা যে এমনটি করেন, তা নয়। তবে যাঁরা করেন তাদের সংখ্যা যাঁরা করেন না তাঁদের চেয়ে ঢের বেশি। কি দরকার ঐ ঝামেলার মধ্যে থাকার?

ঃ কিন্তু অন্যেরা তো আছেন?

ঃ থাকবেনই তো। আমার মতো ফকিরের বাচ্চার বাদশাহর মেজাজ নয় সবার। আর আমার মতো "ব্যোম কেদারনাথ" অবস্থাও নয় তাঁদের। তাঁদের ঘাড়ে বউ-বাচ্চা, তথা পাঁচ দশটা পোষ্যের দায়-দায়িত্ব আছে। কলজেটাও তাঁদের আমার চেয়ে অনেক বেশি পুরু আর ভবিষ্যতের চিন্তাটাও অনেকের আমার চেয়ে অনেক বেশি পোক্ত।

ঃ বটে!

ঃ তাছাড়া, সবাই যে আমার অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন আর হচ্ছেন, তাও নয়।

ঃ বুঝেছি। কিন্তু আমার কথা, হাকিমগিরিই যদি ছাড়লি, তাহলে এই দোকাকনদারী কেন? কলেজ ভারসিটিতে ঢুকলেও তো পারতিস্। এমন তো আর

দেরী হয়ে যায়নি কিছু। যে ব্রিলিয়ান্ট এডুকেশান কেরিয়ার তোর সে দিকে গেলে শিক্ষা ডিপার্টমেন্ট লুফে নিতো তোকে। নিশ্চিত জীবিকা আর নিরাপদ জীবন।

ঃ সেটাও তো ঐ চাকরী-অর্থাৎ রাজসেবা। জীবিকার মান অনুসারে এর স্থান তিন নম্বরে। অর্থাৎ, ভিক্ষার একটু উপরে। তার চেয়ে বাণিজ্য হচ্ছে একদম স্বাধীন, সম্মানজনক আর কিং সাইজ জীবিকা। এটা ছাড়া আর করবো কি? ঐ ভিক্ষায় নৈবচ-নৈবচ?

হাসতে লাগলো ফারুক মাহমুদ। ক্লীষ্ট হাসি হেসে মনোয়ার হোসেন বললো, হুঁঃ! আজীবন তুই পাগ্‌লাটেই রয়ে গেলি।

ঃ তাই তো থাকবো। তাই থাকতেই আমি ভালবাসি। "অল্ গ্রেট্ মেন্ আর ম্যাড্ মেন," বুঝলি? আমি কি ঐ ছাগল মার্কাদের দলের কেউ? সে কথা যাক, তুই দেশে ফিরলি কবে?

ঃ সপ্তাহ খানেক হবে। গত পরশু শুনলাম তোর এই খামখেয়ালীর কথা। শুনেই তোকে খুঁজতে ছুটে বেরিয়েছি।

ঃ আচ্ছা!

ঃ কিন্তু খুঁজলেই কি আর সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়! কোথায় আস্তানাটা গেড়েছিস্-সে হদিস তো সঠিক পাইনি।

ঃ তাই? তা বিদেশ থেকে একেবারে চলে এলি, না আবার—

ঃ একদম একেবারে। আইমিন্, ফর এভার। শালা স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে মানুষ থাকে?

মনোয়ার হোসেন নড়েচড়ে উঠলো। খেয়াল হতেই ফারুক মাহমুদ শশব্যস্তে বললো, আরে আরে, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? আয়-আয়, ভেতরে এসে বোস্—

মনোয়ার হোসেনকে টেনে দোকানের ভেতরে এনে বসাতে বসাতে ফারুক মাহমুদ হাঁক দিয়ে বললো, আরে এই কদর আলী, চট্ করে যা তো, দুইকাপ চা নিয়ে আয়।

ফারুক মাহমুদের চাকর তথা এ্যাসিষ্ট্যান্ট্ কদর আলী দোকানের পাশের কামরায় কর্মরত ছিল। সেখান থেকেই আওয়াজ দিলো—কি বুল্‌লেন? চা আনতে হবি?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, দুই কাপ। জলদি—

ঃ দুইকাপ! ক্যান্, একসাথে দুকাপ খাবেন?

ঃ আরে দুকাপ খাবো কেন? মেহমান এসেছেন, মেহমান।

ঃ এ্যাঁ, মেহমান?

পাশের কামরা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেই কদর আলী উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, তাই তো! খুব চেনা চেনা মেহমান!

ফারুক মাহমুদ বললো, হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে এঁকে তুই বার কয়েক দেখেছিস্।

ঃ ঠিক-ঠিক, তাই মনে হচ্ছে। তা খালি খালি চা আনবো? দুই এক খান সিংগারা নিম্‌কী—

ফারুক মাহমুদ বাধা দিয়ে বললো, না-না, ঐ ছ্যাঁচড়া-পোড়া তেলের নিমকী সিংগারায় কাজ নেই। দোকানে বিস্কুট আছে, ঐ দিয়েই চলবে। তুই যা—

ভেতরে এসে বসে মনোয়ার হোসেন দোকানের মালপত্তর মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। সে দিকে তাকিয়ে থেকে মনোয়ার হোসেন বললো, কিরে ফারুক, মালামাল তো দোকানে তেমন দেখছিনে? যা কিছু বা আছে, তাও সবই দেশী বলে মনে হচ্ছে। এদিয়ে দোকান চলে?

জবাব দিলো কদর আলী। বললো, চলে না—চলে না। দেখছেন না, খদ্দেরের ভিড় নেই। উপায় যা হয়—তা দিয়ে দুইজন মানুষের খাওয়া পরাডা কোনমুতে চলে। চারড্যা পয়সা ডাইনে পড়ে না।

ফারুক মাহমুদ তাকিদ দিয়ে বললো, কি রে, চা আনতে গেলিনে?

কদর আলী হুঁশে এসে বললো, এই যে ভাই, যাচ্ছি—দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল কদর আলী। মনোয়ার হোসেন ঘুরে বসে বললো, সে কিরে তুই যে বললি কিং সাইজ জীবিকা? মুনাফা তাহলে হয় না কিছুই?

ফারুক মাহমুদ বললো, অধিক মুনাফার কি দরকার, কদর আলীর বেতন সহ তার আর আমার খাওয়া পরাটা চলে গেলেই আমি মহারাজ। অধিক পয়সায় করবো কি?

ফারুকের মুখে হাসি। মনোয়ার হোসেন শক্ত কণ্ঠে বললো, তামাসা রাখ্‌। দোকানের এই গরীবী হাল কেন? মূলধনের অভাব?

ঃ না-না, সে অভাব হবে কেন? একেবারেই তো নিঃস্ব নই।

ঃ তাহলে দোকানটা বড় করিসনি কেন? অধিক মালামাল কেন তুলিস্‌নি দোকানে?

ঃ কেন, আমাকে কি পাগ্‌লা কুকুরে কামড়েছে?

ঃ তার মানে?

ঃ অধিক মালামাল তুলে কি জীবনটা হারাবো!

ঃ সে কি! এর মধ্যে জীবন হারানোর প্রশ্ন এলো কি করে?

ঃ এলো না? দোকান বড় দেখলেই কি মামুর বেটারা চিঠি পাঠাবে না বার বার? বলবে না—এতদিনের মধ্যে এত লক্ষ চাঁদা দেবে তো বাঁচবে, না দিলে একদম খাল্লাস্‌?

ঃ ফারুক!

ঃ গা মেলে ব্যবসা করবি এই দেশে? তবেই হয়েছে।

ঃ তাহলে একাজে এলি কেন?

ঃ খাওয়া পরা চালানোর জন্যে করতেই হতো একটা কিছু। একমাত্র চাকুরী, অর্থাৎ গোলামী করা ছাড়া স্বাধীন ভাবে বড় কিছু করতে যাবিতো অমনি ঐ জিগির-"দাও চাঁদা। চাঁদা দাও, খাল বাঁচাও।"

ঃ আচ্ছা।

ঃ কোথাও একটা কিছু ঘটলেই এখন যেমন আওয়াজ ওঠে—"ভাং গাড়ী," তেমনি স্বাধীন ভাবে কেউ দু'পয়সা কামাতে লাগলেই এখন আওয়াজ ওঠে—"দাও চাঁদা"। একজন কষ্ট করে কামাই করবে আর এইসব কর্মবিমুখ প্যারাসাইট পরগাছারা পরের কামাই কেড়ে খাবে। পথের কুকুর-বেড়ালের চেয়েও অধিক নির্লজ্জ আর বেহায়া এই চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা। নর্দমার কৃমিকীট আর মানব জাতির নিদারুন দুশমন।

ঃ তা বটে—তা বটে।

ঃ এদের পায়ে তেল মেরে ফায়দা লুটছে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা আর মারা পড়ছে পাবলিক।

ঃ ফারুক।

ঃ আগে তো এসব ছিল না। রাজনীতি নামের দেশের এই বর্তমান বিজন্মানীতিই লালন করছে এই জঘন্য চাঁদাবাজ আর সন্ত্রাসীদের। এদের হাতিয়ার বানিয়ে ফায়দা লুটছে বেহুদা নেতানেত্রী আর ধান্দাবাজ আমলা-পুলিশ। সুযোগ পেয়ে পশু সন্ত্রাসীরা যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষের ঘাড়ে।

ঃ এটা আর নতুন কি? এ কাল্‌চার তো চলে আসছে সেই সোনার বাংলা অর্জন হওয়ার পর থেকেই।

ঃ তা আসছে। কিন্তু এটা এখন তামাম মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। নেতা-নেত্রী আর আমলা পুলিশের সকলের সমবেত সদিচ্ছা থাকলে কি আর সন্ত্রাস-চাঁদাবাজী থাকতে পারে দেশে? ওয়ান-ফোর্থের আছে তো থ্রি-ফোর্থের নেই। ওদিকে আবার চলছে "কমিউনিষ্ট পার্টি" "সর্বহারা পার্টি" ইত্যাদি ব্যানারে আর একদল সন্ত্রাসীদের নির্বিচার হত্যা। এদের পেছনেও রয়েছে অশুভ এক রাজনৈতিক মহলের হাত।

ঃ হ্যাঁ তাতো আছেই। ভূত তো আসলে সরষের মধ্যেই। ওদের উৎখাত করবে কে! তা যাক সে কথা। তুই তাহলে ঐ চাঁদাবাজদের ভয়েই দোকান বড় করতে চাস্‌নে?

www.boighar.com

ফারুক মাহমুদ জোর দিয়ে বললো, একজ্যাকট্‌লী!

আনোয়ার হোসেন বললো, কিন্তু এই অবস্থাতেই যদি চাঁদাবাজের দল এসে ভর করে তোর ঘাড়ে? চাঁদা দাবী করে?

ঃ বলবো—পয়সা নেই। দোকানে যা কিছু আছে নিয়ে যাও—বাধা দেবো না।

ঃ বটে! তাই যদি নিয়ে যায় তাহলে তার পরে করবি কি?

ঃ আবার দোকান দেবো।

ঃ তার মানে? আবার এই সব মালামাল এনে দোকানে তুলবি?

ঃ না, তখন আর এসব মালামাল নয়। তখন দোকানে তুলবো খড়ি। খাড়ির দোকান দেবো। লম্বা লম্বা আর ভারী ভারী চেলাকাঠ এনে দোকান ভর্তি করে ফেলবো।

ফারুকের মুখে হাসি। মনোয়ার হোসেন রুষ্ট কণ্ঠে বললো, নাঃ, তোর সাথে কথা বলাই এক ঝক্‌মারী, ভবিষ্যৎ নিয়ে কি তোর কোন চিন্তাই নেই? কোনই কি স্থিরতা নেই তোর ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের?

রসিকতা বন্ধ করে ফারুক মাহমুদ বললো, তা থাকবে না কেন? সবে এসে এখানে আস্তানা গেড়েছি। কিছুদিন যাক। কিছুদিন দেখি, কি ঘটে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

ঃ বটে!

ঃ একদিনেই এত অস্থির হোস্‌নে তো। তুই তো থাকছিস্‌ই দেশে এখন। অতঃপর যা করি, তোর পরামর্শ নিয়েই করবো। এবার তোর কথা বল্‌?

ঃ আমার কথা!

ঃ হ্যাঁ। বিদেশের পাট চুকিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে এলি। এখন কি করবি? চাকরী, না ব্যবসা?

একটু থেমে মনোয়ার হোসেন বললো, ও দুটোর কোনটাই নয়। করবো রাজনীতি।

ফারুক মাহমুদ বিপুল বিস্ময়ে বললো, রাজনীতি! সে কি। তুই যাবি ঐ জঘন্য কারবারের মধ্যে?

ঃ সেই ইরাদাই আছে।

ঃ আশ্চর্য! ঐ ঘৃণ্যপথ বেছে নিবি তুই?

ঃ অবাক হচ্ছিস কেন?

ঃ হবো না? আগে ছাত্র আর রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নামে সবাই স্নেহ আর শ্রদ্ধায় গদ গদ হয়ে উঠতো। এখন ও দুটোর নাম শুনলে যারপরনাই ঘৃণা জন্মে মানুষের মনে। দেশে যত অশান্তির মূল এখন এই দুই পদার্থ। একগুলো আছে লেখাপড়া নেই শুধু মারামরি নিয়ে, আরগুলো আছে জনগণের লাশের উপর সওয়ার হয়ে ক্ষমতা আর সম্পদ কব্জা করতে। মানুষের ঘৃণার তালিকায় রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা এখন ক্রমেই শীর্ষে উঠে যাচ্ছে।

ঃ ফারুক!

ঃ নগণ্য কিছু কর্মী বাদে, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কেউ আর এখন সুনজরে দেখে না। মুখের সামনে কিছু বলতে না পারলেও, আড়ালে সবাই তাদের "শালা" বলে সম্বোধন করে। তুই যাবি ঐ নোংরা আর দূষিত নীতির ধ্বজা উড়াতে।

মনোয়ার হোসেন প্রত্যয়ের সাথে বললো, যেতেই হবে। দূষিত হয়েছে বলে দূরে থাকলে চলবে কেন? দূষিত পদার্থ টাকে পিউরিফাই, মানে শোধন করতে হবে না?

ঃ শোধন করবি? তুই? হাসালি। ঐ দুর্গন্ধময় পদার্থের দুর্গন্ধ দূর করবি তুই? এতই সহজ?

ঃ সহজ না হলেও দূর করার চেষ্টাটা তো করতে হবে? আমি একা নই, আরো অনেককেই একাজে এগিয়ে আসতে হবে। দেশ চালানোর প্রয়োজনে রাজনীতি দেশে ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে। একে পরিহার করে জীবন যাপন সম্ভব নয়। কাজেই এটাকে যত শিগ্গির শোধন করা যায় ততই মঙ্গল।

ঃ তাতো বুঝলাম। কিন্তু এই কুৎসিত নীতিকে কি আর আদৌ সুশ্রী করা সম্ভব? যে হারে পচন ধরেছে এতে!

ঃ সৎ আর ঈমানদার মানুষেরা দলে দলে রাজনীতিতে এগিয়ে না এলে, সুশ্রী কখনোই হবে না। তুই তো দেখতেই পাচ্ছিস্- রাজনীতিতে এখন যারা আছে তারা প্রায় বারো থেকে চৌদ্দ আনা লোকই অসৎ আর দুর্নীতিবাজ। মুখে জনগণের ভালাইয়ের কথা বললেও, নিজের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝে না আর সেই স্বার্থসিদ্ধি যত জঘণ্য পথেই হোক।

ঃ কারেক্ট্।

ঃ এই সব কুৎসিত লোকের হাতে রাজনীতিকে একচেটিয়া ভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখলে দিনে দিনে রাজনীতি আরো কুৎসিত আর দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। ঈমানদার আর আল্লাহওয়ালা মানুষের এটাকে উপেক্ষা করে দূরে সরে থাকার আর মোটেই সুযোগ নেই! রাজনীতি তো শুধু একটা নীতিই নয়, মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করার ক্ষমতার খেলা।

ঃ মনোয়ার।

ঃ যাদের পরকালে বিশ্বাস নেই, সেইসব ভোগবাদী, স্বার্থপর, বেঈমান আর ধান্দাবাজ লোকদের হাত থেকে এ ক্ষমতা কেড়ে নিতে না পারলে মানুষের এই দুর্বিসহ ভাগ্যের কোনই পরিবর্তন আসবে না।

ঃ সেটা কি কেড়ে নেয়া সম্ভব? দুর্নীতিবাজ বেঈমানেরা রাজনীতিকে যেভাবে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে রেখেছে, আর অপরদিকে আমাদের দেশের জনগণ যেহারে নির্বোধ আর বেহুঁশ, তাতে কি এ পরিবর্তন সম্ভব?

ঃ নাথিং ইজ ইম্পসিব্ল্, মানুষের হায়াত-মউত-রেজেক ইত্যাদি গুটিকয় বিষয় যা সরাসরি আল্লাহর হাতে আছে এগুলি ছাড়া বাকি সব বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো আল্লাহ ছাপ্পড় ফেড়ে পরিবর্তন এনে দেবেন না। লাগাতার চেষ্টার মাধ্যমে মানুষের তৈরী আইন বাতিল করে দেশে আল্লাহর আইন চালু করতে পারলেই পরিবর্তন চলে আসবে আপছে আপ। দুর্নীতিবাজরা তখন বাধ্য হবে পড়ি মরি করে রাজনীতি থেকে পালাতে।

ঃ হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

এই সময় চা নিয়ে হাজির হলো কদর আলী। তাকে দেখে ফারুক মাহমুদ কপট বিস্ময়ে বললো, সোবহান আল্লাহ! তুই বেঁচে আছিস? আমি তো ভাবলাম, তুই খতম হযে গেছিস্!

কদর আলী বললো, খতম হয়ে গেছি?

ফারুক মাহমুদ বললো, মানে, তোর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। রাস্তায় বেরুলে তো আজকাল আর সব মানুষ ফিরে আসতে পারে না। হয় গাড়ী নয় গুলি, পলকেই তাদের অনেককে ভবসিন্ধু পার করে দেয়। ভাবলাম, তোকেও বুঝি তাই দিয়েছে।

কদর আলী হাসিমুখে বললো, কি যে বুলেন? ভাইজানের সবটাতেই ঠাট্টা।

ফারুক মাহমুদ ধমক দিয়ে বললো, চোপ্‌রও! বেয়াকুফ্ কাঁহাকার! কখন গেছিস্ তা খেয়াল আছে? চা আনতে কি সিলেট গিয়েছিলি?

ঃ তা যাবো কেন? এই তো পাশের ঐ ইস্টল থেকে নিয়ে এলাম।

ঃ তাহলে এত দেরী হলো কেন?

কদর আলী সদম্ভে বললো, হবিনে? ফেরেশ্ চা বানায়্যা নিলাম তো। আমি কি গাঁড়োল যে কেট্‌লী ভরা পুরানো চা গরম করে দিলো আর তাই নিয়ে এলাম? হুঁ-হুঁ বাবা, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের লোক! নতুন পানি-পাতি দিয়ে ফেরেশ চা বানায়্যা নিয়ে তবেই ছাড়লাম। দেখেন কি সুন্দর ফেলেভার—মানে চা-চা ঘেরান।

কদর আলী খুশিতে দুলতে লাগলো। মনোয়ার হোসেন প্রফুল্ল কণ্ঠে বললো সাব্বাস এ নাহলে হাকিমের অডার্লী? মানে ম্যাজিস্ট্রেটের লোক?

কদর আলী বললো, আপনিই বুলেন স্যার, কামডা কি ঠিক করিনি আমি?

ঃ ঠিক-ঠিক। একশোভাগ ঠিক। তোমাদের হাকিমের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে বলে কি আমারও পেয়েছে? ওহ, কি সুঘ্রাণ! দাও-দাও, এগিয়ে দাও—

কদর আলী চায়ের কাপ এগিয়ে দিতেই ফারুক মাহমুদ তাকে ফের ধমক দিয়ে বললো, এই রাখ্-রাখ্, চায়ের কাপ পিরীচ দিয়ে ঢেকে রাখ। খালি চা খাওয়াবি নাকি? তাড়াতাড়ি পানি আন, আমি বিস্কুটের প্যাকেট খুলি—

ক্ষিপ্র হস্তে চা ঢেকে রেখে কদর আলী পানি নিয়ে এলো। কিন্তু বিস্কুট আনতে গিয়ে ফারুক মাহমুদ কেবলই বিস্কুটের প্যাকেট বাছাই করতে লাগলো। তা দেখে মনোয়ার হোসেন হাঁক দিয়ে বললো, আরে এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করলে কি করে? বিস্কুট আনতেই চা যদি বরফ হয়ে যায়, তাহলে আর চা খাওয়া হলো কি?

বিস্কুটের প্যাকেট খুলতে খুলতে এসে ফারুক মাহমুদ বললো, নাও-নাও, জলদি জলদি দু'খানা বিস্কুট মুখে দিয়ে নাও। এমন কিছু দেরী হয়নি যে এই দুপুর বেলা চা বরফ হয়ে যাবে।

বিস্কুট হাতে নিয়ে মনোয়ার হোসেন উচ্চকণ্ঠে কদর আলীকে বললো, আরে এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের লোক, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চেয়ারে চায়ের ট্রে রাখলে—এখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বসেন কোথায়? আর একটা বসার আসন দাও—

এ সময় আশে পাশের কিছু চেনা মুখ দোকানের পাশ দিয়ে চলে গেল। তা লক্ষ্য করে ফারুক মাহমুদ কিছুটা সন্ত্রস্তকণ্ঠে মনোয়ার হোসেনকে বললো, আরে চুপ্-চুপ, বেশি ম্যাজিস্ট্রেট্-ম্যাজিস্ট্রেট করিস্‌নে তো? আমার কি নাম নেই?

মনোয়ার হোসেন বললো, তা থাকুক। যে এতদিন ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করলো, তাকে ম্যাজিস্ট্রেট্ বলবো না? তাও আবার থার্ডক্লাস সেকেণ্ডক্লাস নয়, একদম ফাস্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট।

ঃ তা হোক। তবু ম্যাজিস্ট্রেটগিরির কথা আর কখনো বল্‌বিনে। হারাম বোধে ও কথা একদম ভুলে যা।

ঃ কেন? ঐ কদর আলী যে বললো? বললো? আমি ম্যাজিস্ট্রেটের লোক?

বসার আসন এগিয়ে দিতে দিতে কদর আলী চমকে উঠে বললো, এ্যাঁ! তাই বুল্‌লাম নাকি? তওবা-তওবা! ভুল হয়্যা গেছে স্যার। আর কখনো বুল্‌বো না। এই কান ধরছি।

কদর আলী কানে হাত দিলো। মনোয়ার হোসেন ফারুক মাহমুদকে বললো, ব্যাপার কিরে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে?

ফারুক মাহমুদ বললো, কেন পারবিনে? ছোট্ট এই দোকানের সামান্য এই দোকানদার একজন ম্যাজিস্ট্রেট্—অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট্ ছিল—এ কথা শুনলে কি লোকে সন্দেহ করবে না? একজন ম্যাজিস্ট্রেট মানুষ এই ফকিন্নীমার্কা দোকান খুলে নিয়ে এখানে বসে আছে কেন—এ প্রশ্ন কি জোরদার হবে না সবার মনে? গোয়েন্দা লাগবে তো পেছনে আমার!

ঃ গোয়েন্দা।

ঃ অফ্‌কোর্স। খুনী, দাগী, ফেরারী আসামী বা কারো গুপ্তচর মনে করে গোয়েন্দারা ছায়ার মতো লেগে থাকবে আমার পেছনে। কোন্ মতলব নিয়ে আমি এখানে এসে বসে আছি—এটা বের করার জন্যে গোয়েন্দা পুলিশ জান আমার ঝালাপালা করে তুলবে। শান্তিতে আমাকে থাকতে দেবে ভেবেছিস্?

হুঁশে এসে মনোয়ার হোসেন বললো, আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেটা তো ঠিক! তা এলি কেন এখানে আর একাজে।

www.boighar.com

ঃ চেনা পরিমণ্ডল থেকে দূরে থাকার জন্যে। চেনা পরিমণ্ডলে বসে তো একাজ করা যায় না।

ঃ এলি কেন এ কাজে?

ঃ কেন একাজে এলাম, সে কথা তো খানিকটা বললামই। আরো ব্যাখ্যা চাস্ তো সে ব্যাখ্যা পরে দেবো। এখন যা বলছি, সেই কথাটা খেয়াল রাখ্। থাকবে তো খেয়াল?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা থাকবে। কিন্তু এখানে এই সদর রাস্তার উপর তাহলে এই জায়গাটা নিলি কেন আর পেলি কি করে?

ফারুক মাহমুদ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, নিলাম একান্তই প্রয়োজনে। দাঁড়ানোর তো ঠাঁই চাই একটা? আর পেয়ে গেলাম নিতান্তই বরাতের জোরে।

ঃ বরাতের জোরে?

ঃ নির্ঘাত বরাতের জোরে। মাথা গোঁজার একটু খানি ঠাঁই খুঁজে খুঁজে যখন হয়রান, কোথাও যখন পাচ্ছিনে, তখন এখানে এসে দেখি-"টু লেট্" সাইনবোর্ড এই ঘরের দেয়ালে। খোঁজ নিয়ে দেখি-পাশাপাশি এই দুই কমরাই ভাড়া দেয়া হবে। বাথরুম, কিচেন-সব কিছু আছে ঐ ভেতরের কামরার সাথে। আর ছাড়ে কে? নিয়ে নিলাম সংগে সংগে। একটায় দোকান আর একটায় বসবাস। অর্থাৎ উপার্জ্জন আর আবাস একসাথে। নেহায়েত বরাতের জোর ছাড়া কি এমনটি পাওয়া যায়?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে তো ঠিকই। তা এর মালিক কে?

ঃ এই কামরা দুটোর পেছনেই একটু ফাঁকে ঐযে এক বড়বাড়ি, ঐ বাড়িওয়ালা।

এর পরেই খেয়াল করে ফারুক মাহমুদ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, আরে নে-নে, চুমুক দে চায়ে। এবার কিন্তু সত্যিই বরফ হয়ে যাচ্ছে চা।

ঃ এ্যাঁ?

ঃ শুধুই হা করে শুনছিস আমার কথা। চা-টা বরফ হয়ে গিয়ে থাকলে, এবার কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবিনে।

তাড়াতাড়ি চায়ে চুমুক দিতে দিতে মনোয়ার হোসেন স্মিতহাস্যে বললো, না-না, তা দেবো না—তা দেবো না।

২

দেশে এখন লেগেই আছে হরতাল। একটা বড় দল এদেশের তার সমমনা সহযোগীদের নিয়ে একটা না একটা অজুহাতে প্রায় প্রতিদিনই এখন চালিয়ে যাচ্ছে হরতাল, হৈ চৈ সমাবেশ।

ক্ষমতা চায় সে দল। রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা। ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে আসা জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই এই বিশেষ দলটির। এই মুহূর্তেই ক্ষমতা চাই তাদের। ক্ষমতাটা আজীবন কুক্ষিগত করে রাখার দুর্বার এক নেশায় বরাবরই আচ্ছন্ন এই বিশেষ দলটি। তাই জোট সরকার ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে মাথা তাদের বিগড়ে গেছে। তারা-ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ফলে ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই তারা শুরু

করেছে আন্দোলন। আন্দোলনের নামে হৈ চৈ আর হরতাল। হরতালের পর হরতাল। ছোট বড় নানা ইস্যুতে দিনের পর দিন চলে আসছে হরতাল। পূর্ণ দিবস অর্ধদিবস ইত্যাদি অসংখ্য হরতালের কারণে কোন দিন কোন্ ইস্যুতে হরতাল আজকাল সেটা প্রায় ভুলেই যাচ্ছে মানুষ। অনেকেই তা ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

আগামীকালও আবার হরতাল ডাকা হয়েছে। পিকেটাররা পথে মিছিল বের করেছে হরতালের সমর্থনে। এই ঘন ঘন হরতালের কারণে পথচারী, পথের দুইপাশের দোকানদারগণ যানবাহনের চালকগণ ও জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

"হরতাল-হরতাল, আগামীকাল সকাল-সন্ধ্যা পূর্ণদিবস হরতাল"–আওয়াজ দিতে দিতে রাস্তার ওমোড় থেকে এমোড়ের দিকে এগিয়ে আসছে মিছিল। তা লক্ষ্য করে এদিকের অনেকেই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো—এইরে! সামাল-সামাল, হরতাল পার্টির মিছিল আসছে। আবার আগামীকাল হরতাল।

শুনে অন্যেরা বিরক্তির সাথে বললো, কেন গত পরশুই তো হয়ে গেল হরতাল? আলতু-ফালতু নানা রকম ইস্যুতে দিনের পর দিন হতেই আছে হরতাল। এত হরতালের পরও আগামীকাল আবার কোন্ ইস্যুতে হরতাল?

জবাবে কে একজন রসিক লোক বললো, হাতে কোন ইসু না থাকার প্রতিবাদে হরতাল। হরতাল বাদ দিলে তো আন্দোলন বাঁচে না।

এ কথায় কেউ কেউ আবার পাল্টা প্রশ্ন করলো—কেন বাঁচেনা? এত হরতাল খাওয়ানোর পরও যদি না বাঁচে তো বাঁচবে কিসে?

জবাব এলো—বাঁচানোর চেষ্টা তো করতে হবে?

আন্দোলন না থাকলে জোট সরকারের পতন ঘটাবে কি করে?

ফের প্রশ্ন—তা ঘটাতে কি আদৌ পারবে?

উত্তর এলো—কি করে বলা যায়? রবার্ট ব্রুশের অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত তো আজও উৎসাহ যোগায় অনেককে।

সব মন্তব্য উপেক্ষা করে মিছিলটা এগিয়ে আসতে লাগলো। সদর রাস্তার ঐ মাথা থেকে ক্রমেই এই মাথার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

এদিকে দোকানদার ফারুক মাহমুদ এই সময় কাঁচাবাজারে এসেছিল সদর রাস্তা ধরে কিছুটা সামনে এগিয়ে বাম দিকে ঘুরে ছোট একটা রাস্তা দিয়ে অনেক খানি দূরে কাঁচাবাজার। আকাশে আজ হঠাৎ কিছু মেঘ দেখা দিয়েছে। জমাট মেঘ নয়, ভাসা ভাসা উড়ো মেঘ। উড়ে বেড়াচ্ছে সকাল থেকে, কিন্তু বৃষ্টির কোন নামগন্ধ নেই। কাঁচাবাজারে এসে ধীরে সুস্থে তরিতরকারী শাক-ডাঁটায় ব্যাগটা ভর্তি করে নিয়ে বাজার থেকে বেরিয়ে এলো ফারুক মাহমুদ। তার কোন তাড়াহুড়া বা উদ্বিগ্নতা ছিল না। কিন্তু বাজার থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে আসতেই অকস্মাৎ শুরু হলো বৃষ্টি। কানা মেঘের বৃষ্টি। অঝরে এক পশলা ঢেলে

দিয়ে উড়ে গেল মেঘ। মাত্র মিনিট খানেকের ব্যাপার। কিন্তু এতে করেই অনেকের অবস্থা হলো মা-গোঁসাই এর চেয়েও অনেকখানি করুণ। এক মিনিটের এই অঝর বর্ষণে কিছু লোক ভিজে-চুপসে জবজবে হয়ে গেল।

হঠাৎ বৃষ্টি আসবে এ ধারণা অনেকেই করেনি। ফারুক মাহমুদও করেনি বলে ছাতা নিয়ে বেরোয়নি। তবে বাবু হয়েও বেরোয়নি। কাঁচা বাজারের নোংরা অবস্থা চিন্তা করে সে সাদামাটা পোষাকেই এসেছিল। অকস্মাৎ বৃষ্টি যখন নামলো তখন বাজারের লোকেরা বিভিন্ন চালা-ছাউনির নীচে মাথা লুকিয়ে বাঁচলো। কিন্তু ফারুক মাহমুদ ও আরো কয়েকজন বাজার ছেড়ে তখন এমন জায়গায় এসেছিল যেখানে একমাত্র স্কাইশেড্ ছাড়া কোন শেড্ ছাউনির নাম-নিশানা ছিল না। ফলে অসহায়ভাবে ভিজে গেল তারা। চালা-ছাউনির খোঁজে দৌড়াদৌড়ি করতে করতেই গোছলটা পুরোপুরিই সম্পন্ন হলো তাদের। অবশেষে মাথা লুকানোর ঠাঁই যখন পেলো, তখন বৃষ্টিও নেই, মেঘও নেই।

ভেজা বেড়ালের এই হালত্ নিয়ে ফারুক মাহমুদ আর দাঁড়ালো না। এই অবেলায় এত বেশি ভেজার দরুণ অসুখ বিসুখ হতে পারে বোধে, সে পা চালিয়ে তার দোকান-তথা আস্তানার দিকে আসতে লাগলো। ছোট রাস্তা ধরে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সদর রাস্তায় চলে এলো। কিন্তু সদর রাস্তায় এসেই সে অবাক। দেখলো এক ফোঁটা পানিও এখানে পড়েনি। এলোমেলো বাতাসে ধূলো উড়ছে রাস্তায়। তার চেয়েও বড় কথা, এই বড় রাস্তায় চলছে তখন থৈ-মাতম কাণ্ড। এ রাস্তা তখন রণক্ষেত্র।

মিছিলকারীদের উদ্দেশ্য করে কে একজন দোকানদার বলেছিল—পেয়েছেন কি আপনারা? দৈনিক হরতাল করেন কেন? আমাদের কি বেঁচে থাকতে দেবেন না? রুজি রোজগার বন্ধ করে দিয়ে আপনারা কি অনাহারে মেরে ফেলবেন আমাদের?

কয়েকজন রিক্সা-টেমপুওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা সমর্থন করেছিল। আর যায় কোথায়? মিছিলকারীরা হুংকার দিয়ে উঠে ঐ দোকানদার আর ঐ কয়জন রিক্সাওয়ালা-টেম্পুওয়ালাকে মারতে শুরু করলো। তা দেখে ক্ষেপে গেল অন্যান্য দোকানদার ও সেখানে উপস্থিত রিক্সা-টেম্পু-স্কুটার চালকেরা সবাই। তারাও ছুটে এলো এই জুলুমের প্রতিবাদে। শুরু হলো লড়াই। রাস্তাটা রণাঙ্গনে পরিণত হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ যাবত চলতে লাগলো মারামারি, হট্টগোল ও ভাংচুর। খবর পেয়ে ছুটে এলো পুলিশ। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও পুলিশ কাউকে থামাতে পারলো না। অগত্যা তারা টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করলো সবাইকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে। সেই সাথে শুরু করলো লাঠিচার্জ। এবার কাজ হলো আশানুরূপ। টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল রাস্তা। অতঃপর কাশ্‌তে কাশ্‌তে আর চোখের পানি মুছতে মুছতে যুদ্ধরত উভয়পক্ষ সহ সমুদয় লোকজন দিশেহারা হয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালাতে লাগলো পড়িমরি করে।

ফারুক মাহমুদ এই সময় বড় রাস্তায় এসে এই প্রলয়ের সামনে পড়ে গেল। এটাকে পাশ কাটিয়ে সে দ্রুতপদে সামনে এগুনোর চেষ্টা করতেই দেখতে পেলো- তার সামনে এক বোরকাপরা মেয়ে তড়িৎ বেগে সামনের দিকে ছুটতেই এক সাইকেলের ধাক্কায় এক পাশে ছিটকে পড়ে গেল। মেয়েটার হাতে ছিল বইখাতা ভর্তি এক ব্যাগ। সেই বইখাতাগুলো সব রাস্তার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। মেয়েটা পড়লো ফুটপাথে। কিন্তু তার বই খাতাগুলো পড়লো ফুটপাথের নীচে একদম রাস্তায়। পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে মেয়েটা মৃদু আর্তনাদ করে উঠলো এবং ঐ পড়ে থাকা অবস্থাতেই বইখাতা গুলো হাতড়িয়ে ব্যাগে তোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। মানুষের ভিড় এতক্ষণ কিছুটা কম ছিল এদিকে। কিন্তু টিয়ারগ্যাসের ধাক্কায় আর পুলিশের তাড়াতে দিশেহারা লোকজন হঠাৎ করে সবাই রাস্তার এই দিকটা ধরলো আর এই দিক দিয়েই পালাতে শুরু করলো। এতে করে জমে উঠলো প্রচণ্ড ভিড় এবং ধাবমান এই অগণিত মানুষের পদাঘাতে বইখাতাগুলো মুহূর্তেই ছিটকে মেয়েটার নাগালের বাইরে চলে গেল। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে খানদুয়েক বই-খাতা ব্যাগে তোলার পর অন্যগুলোর সন্ধানে ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসতেই ভিড়ের ধাক্কায় মেয়েটা-এবার শাটপাট হয়ে পড়ে গেল রাস্তার উপর। এতে করে ছুটন্ত মানুষের পদতলে তার পিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠলো। শুধু প্রকটই নয়, পিষ্ট হয় হয় অবস্থা। www.boighar.com

এ দৃশ্য দেখে চমকে উঠলো ফারুক মাহমুদ। একে মেয়েছেলে তার উপর বোরকা-আব্রুকরা এক শরীফ মেয়েছেলে। তার এই নিশ্চিত দুর্গতি ফারুক মাহমুদ সহ্য করতে পারলো না। "রে-রে" করে সে ছুটে ফুটপাথ থেকে নেমে এলো রাস্তায় এবং মেয়েটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে দুহাতে ঠেলে ধাবমান লোকদের দুই পাশে সরিয়ে দিতে লাগলো। এই প্রক্রিয়া চলতে লাগলো অবিরাম। এর ফলে মেয়েটি পদদলিত হওয়া থেকে রক্ষে পেলো ঠিকই, কিন্তু ফারুক মাহমুদ একেবারেই অক্ষত রইলো না। প্রচণ্ড ভিড় আর ছুটন্ত মানুষের দুরন্ত গতিবেগ ও গুঁতোগুঁতি সামলাতে গিয়ে ফারুক মাহমুদ কয়েকবার রাস্তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তাতে তার হাঁটুর ও হাতের কনুইয়ের কিছুটা ছাল-চামড়া তো উঠলোই, সেই সাথে তার ভেজা কাপড়জামা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রাস্তার ধূলা লেগে কদাকার হয়ে গেল। বাজারের ব্যাগটাও পড়ে গেল হাত থেকে। ছড়িয়ে পড়লো তরিতরকারী। কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না ফারুক মাহমুদের। পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফের উঠে দাঁড়িয়ে পূর্ববৎ সে সবলে রুকতে লাগলো ধাবমান লোকদের। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এরপরেই কেটে গেল ভিড়। দেখতে দেখতে রাস্তাটাও অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল। মেয়েটা ইতিমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। মানুষের ভিড়ের জন্যে কোন দিকেই যেতে না পেরে সে সেঁটে দাঁড়িয়েছিল ফারুক মাহমুদের পেছনে। অন্যকথায় ফারুক মাহমুদকে ঢাল বানিয়ে মেয়েটা আত্মরক্ষা করলো। ভিড়টা ফাঁকা হতেই ফারুক মাহমুদ দ্রুত গতিতে

খুঁজে খুঁজে মেয়েটার বই খাতা কুড়িয়ে এনে মেয়েটার হাতে দিলো এবং নিজের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া তরিতরকারী ক্ষিপ্রহস্তে ব্যাগে তুলে নিলো।

বলা বাহুল্য ফারুক মাহমুদকে তখন ভদ্রলোক বলে চেনে, সাধ্য কার? তার চেহারা তখন " যেমন খুশি তেমন সাজো" প্রতিযোগিতার পাগলের মতো। রাস্তার ধূলা মেয়েটির হাতে-পায়ে আর কাপড় চোপড়ে লাগলেও শুকনো ছিল বলে সেগুলো তেমন কদাকার হলো না। আল্‌গা হয়ে যাওয়া শাড়ি-জামা-বোরকাও সে তড়িৎবেগে সামলে নিয়েছিল। কিন্তু ভেজা থাকার দরুণ ফারুক মাহমুদের পোষাকে আর হাতে-পায়ে-চুলে-গালে রাস্তার ধূলোমাটি এমনভাবে সাপ্‌টে লেগে গিয়েছিল যে, তাতে তার চেহারাটা খুবই কদর্য হয়ে গিয়েছিল। সেরেফ পথের একজন কুলি-কামিন ছাড়া তাকে কোন ভদ্রলোক বলে অনুমান করার কিছু মাত্র উপায়ই রইলো না।

বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে ফারুক মাহমুদ মেয়েটিকে ব্যস্তকণ্ঠে বললো, যান-যান, রাস্তা ছেড়ে শিগ্গির ঐ ফুটপাথে চলে যান।

নিমেষ খানেক দিশেহারা হয়ে থাকলেও, মেয়েটা তার রক্ষাকর্তাকে চিনতে ভুল করেনি। এই লোকটাই যে ছুটে এসে আর মস্তবড় ঝুঁকি নিয়ে তার সম্ভ্রম এমন কি সেই সাথে তার জানটাও বাঁচিয়েছে-এটা বুঝে উঠতে আদৌ বিলম্ব হয়নি মেয়েটার। তাই কিঞ্চিৎ সময় ফারুকের মুখের দিকে বিহ্বল নেত্রে চেয়ে থাকার পরেই জবাবে সে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললো, ধন্যবাদ, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি না থাকলে আজ আমার মান-সম্ভ্রম-ইজ্জত কিছুই বাঁচতো না। প্রাণটাও হয়তো চলে যেতে পারতো। তোমার কাছে আকণ্ঠ ঋণী হয়ে রইলাম আমি।

ফারুক মাহমুদ ফের ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, ওসব কথা থাক। তাড়াতাড়ি রাস্তা ছেড়ে ফুট পাথে উঠুন আর দূরে সরে যান। ঝড়টা পড়ে গেলেও একেবারেই থেমে যায়নি। দেখছেন না, কিছুলোক রাস্তায় এখনো ছুটোছুটি করছে?

বলতে বলতে ফারুক মাহমুদ ফুটপাথে চলে এলো এবং সামনের দিকে হাঁটতে লাগলো। তার পিছে পিছে মেয়েটাও ফুটপাথে এসে ফারুক মাহমুদকে অনুসরণ করলো। কিছুদূর এগিয়ে খানিকটা নিরাপদ স্থানে এসেই মেয়েটি ফের ফারুক মাহমুদকে ডাক দিয়ে বললো-এই যে শোনো-শোনো, হন হন করে চলে যাচ্ছো যে? তুমি কে, তাতো বলবে? এতবড় উপকার করে নীরবে চলে যাচ্ছো বাড়িটা কোথায়-তাও বলবে না?

ফারুক মাহমুদ থামলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, আমাকে কিছু বললেন?

কাছে এগিয়ে এসে মেয়েটি বললো, হ্যাঁ, বাড়ি কোথায় তোমার? মানে কোথা থেকে এলে এখানে?

ফারুক মাহমুদ ঝটপট করে বললো, বাজার থেক্কে। ঐ কাঁচা বাজার থেকে।

ঃ ও-হ্যাঁ-তাই তো! ব্যাগে তো তোমার কাঁচা তরিতরকারী দেখছি। তা ভিজলে কি করে? কাপড়জামা তো দেখছি সবই ভিজে।

ঃ বৃষ্টিতে। এদিকে বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু কাঁচাবাজারের ঐ দিকে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

ঃ তাই নাকি? তা এই অবেলায় বাজার করতে যাওয়ার কারণ? সন্ধে তো লাগে লাগে প্রায়? সকালের দিকে সময় পাওনি বুঝি?

ঃ সময়? না-না, সময়ের কোন অভাব আমার ছিল না। বাজার করতে হবে, আগে তা জানতে পারিনি-তাই। মুখে কিঞ্চিৎ হাসি টেনে মেয়েটি বললো, ও হঠাৎ করেই তাহলে বউ এর হুকুম হলো বুঝি?

বিভ্রান্ত নেত্রে চেয়ে ফারুক মাহমুদ বললো, বউ! আমার কোন বউ নেই।

ঃ বলো কি? বউ নেই।

ঃ আমার কোন বাড়িও নেই।

হোঁচট খেলো মেয়েটা। একটু থেমে গিয়ে পরে সরবে বললো, নেই? ও বুঝেছি, মুনিবের হুকুমে বাজারে এসেছিলে—তাই না?

ঃ মুনিব!

ঃ হ্যা, তুমি এখন যে বাড়িতে আছো সেই বাড়ির লোক। নিশ্চয়ই সেই লোকই এই অসময়ে তোমাকে বলেছে—তরিতরকারী নেই, শিগ্গির বাজারে যাও—ঠিক নয়?

ফারুক মাহমুদ সাথে সাথে সমর্থন দিয়ে বললো, জি-জি, একদম ঠিক। আগে কখন বলেছিল, আমি শুনতে পাইনি। হঠাৎ করে এই অবেলায় মেজাজের সাথে বললো, "সকালে বললাম না, তরিতরকারী কিছুই নেই। এখনই বাজার করে না আনলে ভাত ভর্তা করে ভাত খেতে হবে আজ রাতে।" সে কি মেজাজ তার।

ঃ তাই বলো। আমার অনুমান তাহলে একদম ঠিক। তা নামটা কি সেই লোকের?

ঃ কদর আলী—মুহম্মদ কদর আলী।

ঃ কদর আলী? তাহলে ঠিক আছে। কদর আলী মার্কা মুনিবেরা মেজাজীই হয়। এদের হুঁশ বুদ্ধি কমতো?

মেয়েটার মুখে কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠলো। সে দিকে কান না দিয়ে ফারুক মাহমুদ বললো, ওসব কথা থাক। আপনার কথা শুনি একটু। বই পুস্তক নিয়ে আপনি এই অসময়ে কোথা থেকে আসছিলেন?

মেয়েটি বললো, ভারসিটি থেকে। আমি ভারসিটির ছাত্রী। লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলাম আর সেখান থেকেই আসছি। যাওয়ার সময় রাস্তায় কোন ঝামেলাই ছিল না। ফিরে আসার সময় হঠাৎ এই ঝামেলায় পড়ে গেলাম।

ঃ বাড়ি কোথায় আপনার? এদিকেই কি?

ঃ হ্যাঁ, এই তো ঐ সামনেই। এই বড় রাস্তা বরাবর খানিকটা এগুলেই আমাদের বাড়ি।

এই সময় হঠাৎ এক মাঝবয়সী লোক ছুটতে ছুটতে এই দিকে এলো। দৌড়ের উপর থেকেই সে মেয়েটাকে লক্ষ্য করে বললো, এই যে মামণি, তুমি এখানে? কোন বিপদ হয়নি তো? রাস্তায় গোলমাল হচ্ছে শুনেই আমি ছুটে এলাম তোমার খোঁজে।

দৌড়ের উপর এসে হাঁপাতে লাগলো লোকটা। পরণে লুঙ্গি গায়ে আধময়লা বেনিয়ান কাঁচাপাকা চুলদাড়ি, মাথায় টুপি। তাকে দেখে মেয়েটি মুখের ঢাকনা মাথার উপর তুলে আবেগের সাথে বললো, এ্যাঁ, চাচা এসেছো? হ্যাঁ চাচা, বিপদই হয়েছিল। জব্বোর বিপদ। এই লোকটা না থাকলে কি যে হতো—তা ভেবেই উঠতে পারছিনে।

ফারুক মাহমুদের প্রতি ইংগিত করলো মেয়েটা। আগন্তুক লোকটা বেজায় অস্থির হয়ে উঠে বললো, সেকি-সেকি! বিপদ হয়েছিল? জব্বোর বিপদ? কি গজব! কি গজব! তা কি বিপদ হয়েছিল? কোন বদমায়েশের খপ্পরে পড়েছিলে কি?

ঃ না, কোন বদমায়েশের খপ্পরে পড়িনি। তবে যে মুসিবত হয়েছিল তা ওসবের চেয়েও মারাত্মক।

ঃ বলো কি—বলো কি! তাহলে কি হয়েছিল?

'সে অনেক কথা। সেটা পরে শুনো। আসল কথা হচ্ছে—এই লোকটা থাকার জন্যেই সে মুসিবতে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি আমার। এ না থাকলে অনেক কিছুই হতে পারতো। এই লোকটাই বাঁচিয়েছে আমাকে।'

'সোবহান আল্লাহ—সোবহান আল্লাহ '

ফারুক মাহমুদের কাছে এগিয়ে এলো লোকটা। সূর্যের আলো তখন শেষ হয়ে এসেছে। এই অবস্থাতেই ফারুক মাহমুদকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে সে বললো, আরে লোকটাকে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে, কোথায় যেন দেখেছি!

কে এই লোক?

মেয়েটা বললো চিনিনে। তবে একজনের বাড়িতে নকরী করে চাচা। বাজার সওদা করে।

ঃ এ্যাঁ, নকরী করে?

ঃ হ্যাঁ। তবে নকরী করলেও মনে হচ্ছে খুবই ঈমানদার মানুষ চাচা। তোমার মতো এতটা কিনা জানিনে, তবে খুবই ঈমানদার। কোন বদ মতলব বা বদ উদ্দেশ্য তার মধ্যে দেখলাম না।

প্রসন্ন নয়নে ফারুক মাহমুদের দিকে চেয়ে রইলো মেয়েটা। তার ঐ চাচা বললো, আলহামদুলিল্লাহ—আলহামদুলিল্লাহ! দেখে তো নওজোয়ানই মনে হচ্ছে। ঈমানদার নওজোয়ান আজকাল খুঁজেই পাওয়া যায় না।

এরপর সে ফারুক মাহমুদকে প্রশ্ন করলো—তোমার নামটা কি বাপজান?

ফারুক মাহমুদ বললো, আমার নাম ফারুক মাহমুদ।

আপনি? আপনি কি এই ভদ্রমহিলার চাচা?

জোর সমর্থন দিয়ে লোকটা বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, চাচা। চাচা বই কি? আমার নাম ইরফান আলী। সবাই বলে ইরফান মিয়া। আমি এই মা-মণিদের বাড়িতে চাকরী করি। দীর্ঘদিন যাবত আছি তো, তাই মামণি-আমাকে খুব ভালবাসে। চাচা বলে ডাকে।

ঃ ও-আচ্ছা।

ঃ আর তা ডাকবেই তো! আমি যে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি তাকে।

ঃ তাই নাকি? বেশ-বেশ। তা আপনার মা-মণি—

ঃ মা-মণির নাম ইয়াসমীন। ইয়াসমীন আরা বেগম। ভারসিটিতে পড়ে। আজ ভারসিটিতে গিয়েছিল দুপুরের পরে পরেই। ফিরতে দেরী দেখে চিন্তিত ছিলাম। ইতিমধ্যে শুনি রাস্তায় গোলমাল। ঐ খবর শুনেই তো ছুটে এলাম আমি।

এই সময় গোলমালটা আবার দানা বেঁধে উঠলো। পিকেটারেরা একজায়গায় হয়ে আবার শ্লোগান দিতে শুরু করলো। শুনেই এরা সতর্ক হয়ে উঠলো সবাই। ফারুক মাহমুদ বললো, যান-যান, আপনারা চলে যান। আঁধার হয়ে আসছে, আর রাস্তায় থাকবেন না। কখন আবার লুটপাট শুরু হয়, কে জানে।

ইয়াসমীনের চাচা অর্থাৎ ইরফান মিয়া সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো, তা ঠিক-তা ঠিক। বিশেষ করে মা-মণির আর এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। আমরা যাই। তা তুমি কোথায় থাকো বাপজান, তা তো বললে না?

ফারুক মাহমুদ বললো, এই তো, এই রাস্তা বরাবর সামনেই।

ঃ তাই নাকি? আমাদের বাড়িও তো ওখানেই। তাহলে নিশ্চয়ই আবার দেখা হয়ে যেতে পারে, না কি বলো ফারুক মিয়া? ফারুক, না কি যেন নাম বললে তোমার?

ঃ জি-জি ফারুক মাহমুদ।

ঃ আবার তাহলে দেখা হতে পারে আমাদের, পারে না?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা পারে বৈকি।

আবার আওয়াজ এলো—"হরতাল-হরতাল। আগামীকাল হরতাল"। ইরফান মিয়া লাফিয়ে উঠে ইয়াসমীনকে বললো, ওরে বাপ্‌রে। চলো-চলো, আর একদণ্ডও নয়।

ইয়াসমীনকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়েই দৌড়াতে লাগলো ইরফান মিয়া।

একদিন পরের দুপুর বেলা। দোকান খোলা রেখে ফারুক মাহদুদের চাকর কদর আলী গিয়ে পাকঘরে ঢুকলো এবং রান্নার বাদবাকী কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। দোকান বন্ধ করে আসার কথা ভুলে গেল কদর আলী। ফারুক

মাহমুদ গোছল করতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে দেখতে পেল দোকান ঘর খোলা। তাই গামছা গায়ে জড়িয়ে সে দোকানে এলো ঝাঁপ ফেলে দোকান বন্ধ করতে। ঝাঁপে হাত দিতেই নেকাব আটা এক মেয়ে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, দাঁড়ান-দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। এই সওদা কয়টা দিয়ে বন্ধ করুন দোকান। এই যে সওদার ফর্দ।

ফারুক মাহমুদ ফর্দটা নেয়ার জন্যে সামনে এগিয়ে এলে তাকে দেখে মেয়েটা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। পরে বিস্মিতকণ্ঠে বললো, একি! আপনি-মানে তুমি! তুমি কি সেই লোক নও? ঐ যে গত পরশু রাস্তায় গোলমালের সময় যে আমাকে বাঁচালো? চেহারাটা ঠিক সেই রকমই মনে হচ্ছে।

ফারুক মাহমুদও সবিস্ময়ে বললো, সেকি! আপনি—মানে আপনি কি তাহলে ইয়াসমীন্ আরা বেগম?

মেয়েটি বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই। তা তুমিই কি সেই লোক?

সেই ফারুক মিয়া?

ফারুক মাহমুদ স্মিতহাস্যে বললো, জি-জি।

ফারুক মাহমুদের গামছা-জড়ানো খালি গা লক্ষ্য করে ইয়াসমীন বেগম বললো, কি তাজ্জব। এত সুন্দর চেহারা তোমার সেদিন কি বিদ্‌ঘুটে হয়েই না গিয়েছিল।

ঃ জি?

ঃ নসীবের দোষে এই চেহারা নিয়ে তুমি অন্যের নওকর। নইলে এমন চেহারা অনেক হোমরা-চোমরার ঘরেও দেখা যায় না।

ফারুক মাহমুদ ঈষৎ লজ্জিতকণ্ঠে বললো-রাখুন তো, ওসব কথা রাখুন।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ ও সব কথা থাক। তা চাকরী করো মানে কারো বাড়িতে নয়, এই দোকানে চাকরী করো।

ঃ চাকরী!

ঃ মানে দোকানের কাজ। দোকানদারী করো এই তো? তা তোমার মুনিব কোথায়? ঐ যে মুহম্মদ কদর আলী না কি যেন নাম? সে এখানে থাকে না?

ইয়াসমীনের বিভ্রান্তিটা বুঝতে পেরে ফারুক মাহমুদ মুচ্‌কি হেসে বললো, থাকে। সেও থাকে, আমিও থাকি।

ঃ সব সময় থাকে?

ঃ চব্বিশ ঘন্টা। খাওয়া দাওয়া, শোয়া ঘুম-সব তার এখানে।

ঃ বলো কি! লোকটাতো তাহলে খুব আল্‌সে খুব আল্‌সে দেখছি। তা না হলে এইটুকুন দোকান চালাতে কর্মচারী লাগে? তা যাক। তাকে ডাকোতো দেখি। এই ফর্দের জিনিসগুলো দেখেশুনে সে-ই আমাকে দিক। দামের ব্যাপারটাও তার সাথেই মেটাই। তোমাকে যা বলে দিয়েছে তার কমেতো বেচতে পারবে না তুমি। তাকেই ডাকো।

ঃ তাকে ডাকার দরকার নেই। সে এখন পাকঘরে ব্যস্ত আছে। আমিই সব কিছু ন্যায্য মূল্যে দিতে পারবো।

ঃ পাকঘরে মানে? মালিক পাক ঘরে। পাকঘরে কি করছে?

ঃ পাকশাক নিয়ে ব্যস্ত আছে।

ঃ কার পাকশাক।

ঃ তার আমার-দুইজনেরই। পাকশাক সব সেই করে।

ঃ সে-ই করে? তুমি করো না?

ঃ আমার ওটা অভ্যাস নেই।

www.boighar.com

ঃ অভ্যাস নেই কেমন? সে-ই তাহলে পাক করে তোমাকে খাওয়ায়?

ঃ বরাবর খাওয়ায়। আর শুধু পাক করেই খাওয়ায় না। আমার কাপড় চোপড় কাচা, ঘরদোর ধোয়া মোছা, এঁটো থালা বাসন মাজা-সবই ঐ কদর আলীই করে।

ঃ কি বলছো পাগলের মতো। মালিক সব কাজ কাম করে তো তুমি করো কি? বাসার ঐ সব কাজ কাম তুমি কিছু করো না।?

ঃ না। ঐ যে বললাম—আমার অভ্যাস নেই। ওসব কাজ কাম আমি জানিনে।

ঃ তাজ্জব! মালিক সব জানে আর কর্মচারী জানে না? মানে, চাকরের অভ্যাস নেই।

ঃ চাকরের অভ্যাস আছে, কিন্তু মালিকের অভ্যাস নেই।

ঃ তার মানে?

ঃ মানে আমিই মালিক। ঐ কদর আলীই আমার চাকর বা কর্মচারী।

ঃ কদর আলীই চাকর? সেকি! সে কথা তো আগে বলোনি? সেদিনও তো বলোনি?

ঃ বলার সুযোগ দিচ্ছেন কৈ? অনুমানের উপর ভর করে এমন শক্তভাবে আমাকে নওকর আর কদর আলীকে আমার মুনিব বানিয়ে ফেলেছেন যে, এটা খণ্ডন করার সুযোগ দিচ্ছেন কই?

ঃ কি আচর্য! তুমিই মালিক? এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছো তুমিই!

ঃ জি-জি। আপনি কি করে জানলেন—এই বাড়ি আমার ভাড়া বাড়ি?

ঃ বাহ্! আমার বাড়ি আর আমি জানবো না?

ঃ আপনার বাড়ি কি রকম?

ঃ রকম মানে আমার আব্বার বাড়ি। আব্বার আমি একমাত্র সন্তান। আব্বার অবর্তমানে এ বাড়িতো আমারই। এ ছাড়া এই বাড়ির কাগজ পত্রও আব্বা আমার নামে করেছেন। এই দোকান বাড়ি, আমাদের ওবাড়ি, ওবাড়ির সাথের মিল-কারখানা সব আমারই বলতে পারেন। বিশেষ করে এই দোকান বাড়ি আর ওবাড়ির কাগজপত্র আমার নামেই।

ঃ ওবাড়ি কোন্ বাড়ি? কোন্ বাড়ির কথা বলছেন?

ঃ এই তো, এই দোকানবাড়ির পেছনে একটু ফাঁকে ঐ বড় বাড়ি-ওটাই তো আমার মানে আমাদের বাড়ি। বর্তমানে আমরা ওখানেই থাকি। আমার আব্বাই তো ভাড়া দিয়েছেন এই দোকান বাড়ি।

বিপুল বিস্ময়ে চেয়ে থেকে ফারুক মাহমুদ বললো বলেন কি! এ দোকান বাড়ি তাহলে আপনাদের? যিনি আমাকে—ভাড়া দিয়েছেন তিনি আপনার আব্বা?

ঃ জি-হ্যাঁ। খুব অল্পদিন হলো ভাড়া নিয়েছো তুমি। এদিকে আমি কিছুদিন যাবত আসিনি বলে তুমিও আমাকে চেনো না, আমিও তোমাকে চিনতাম না।

ঃ আপনি তো তাহলে মস্ত বড়লোকের মেয়ে।

ঃ তা বলতে পারেন। এই বাড়িগুলো আর মিল-কারখানাগুলো পাওয়ার পর আমরা মোটামুটি বড়লোকই হয়ে গেছি। বিশেষ করে আগের চেয়ে।

ঃ আগের চেয়ে!

ঃ আগেও অবস্থা আমাদের খুব খারাপ ছিল না। তবে বর্তমানের মতো এতটা নয়। এতটাই বা বলি কেন এর অর্ধেকটাও নয়। তখন আমরা আব্বার পৈতৃক বাড়িতে থাকতাম। এই পাশের মহল্লায় আব্বার একটা পৈতৃক বাড়ি আছে, সেই বাড়িতে থাকতাম।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আব্বা তখন ঐ মিলকারখানার মূল মালিকের অধীনে মিল কারখানার ম্যানেজার ছিলেন। মূল মালিক হিন্দু। সে ভারতে চলে যাওয়ার সময় আব্বা এই বাড়িগুলো আর মিলকারখানা সব কিনে নেন। সেই সময়ই বাড়িগুলো আমার নামে করে নেন।

ঃ কেন, আপনার নামে কেন? আপনার আব্বার নামে থাকলেও তো ভবিষ্যতে সব কিছুর মালিক আপনিই হতেন। তাঁর একমাত্র সন্তান আপনি—

ঃ তা হতাম। কিন্তু আব্বার নামে কেনায় কি যেন অসুবিধে ছিল। তাই আমার আম্মা তাঁর নিজের টাকায় আমার নামে কিনেছেন। এই বাড়িঘরগুলো নাকি আম্মার টাকায় কেনা।

ঃ বলেন কি!

ঃ হ্যাঁ। কোর্টে একটা কেস্ ছিল এই বাড়িঘর আর মিলকারখানার স্বত্ব নিয়ে। আগে তো কিছু তেমন জানতামনা। কোর্টে আমার আব্বা এসব কথাই বলেছেন বলে জানতে পেরেছি।

ঃ তাহলে সেই কেসের কি হয়েছে? মিটে গেছে?

ঃ হ্যাঁ, মিটেই গেছে শুনছি। সব খবর তো রাখিনে। এই সময় কদর আলী ভেতর থেকে ডাক দিয়ে বললো, ভাইজান, গোছলে কি গেলেন?

জবাবে ফারুক মাহমুদ বললো, হ্যাঁ, যাই। ইয়াসমীন বেগম এবার ব্যস্তকণ্ঠে বললেন দাও-দাও, আমার সওদাগুলো জলদি জলদি দিয়ে তুমি গোছলে যাও।

ফারুক মাহমুদ বললো, দিচ্ছি। কিন্তু ঘটনা কি বলুনতো? আপনি বিরাট এক

বড়লোকের মেয়ে। নিজেও আপানি মস্ত বড়লোক। ইরফান মিয়া নামের বিশ্বস্ত একজন চাকরও আছে আপনাদের। হয় তো আরো চাকর বাকর আছে। অথচ এই ভরদুপুরে আপনি এসেছেন সওদা করতে! এর আগে তো কখনো আসেননি?

ঃ না আসিনি। তবে আজ এসেছি দায়ে পড়ে। হরতালের কারণে গতকাল বাজার করা হয়নি। আজ সকাল থেকেই আব্বা আর ইরফান চাচা বাড়িতে নেই। কারখানায় কি গোলমাল হচ্ছে শুনে অন্যান্য চাকরেরাও কারখানায় ছুটে গেছে, এখন পর্যন্ত ফিরেনি। এই অবস্থায় হঠাৎ করে বাড়িতে মেহমান এসেছেন কয়েকজন। কিন্তু বাড়িতে চা-চিনি-বিস্কুট থেকে শুরু করে মশলাপাতি কিছুই নেই। বাধ্য হয়ে তাই আমাকেই আসতে হয়েছে। দাও-দাও, সওদাগুলো তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। আর দেরী করো না—

বলেই একটু হোঁচট খেয়ে থেমে গেল ইয়াসমীন। পরে অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে বললো, ওহ্‌হো, একটা বোধহয় মস্তবড় ভুল করছি আমি। গত পরশু রাস্তায় আপনাকে দেখে অতি নগণ্য মানুষ বলে মনে হয় আমার, আর তাই আপনাকে তুমি বলে সম্বোধন করি তখন। কিন্তু আপনি তো তা নন। একেবারেই কুলি মজুর নন। অসাধারণ কিছু না হলেও একজন ছোটখাটো দোকানদার। একটা দোকানের মালিক। তাই আপনাকে আর তুমি বলা আদৌ ঠিক নয় আমার। এযাবত যা বলেছি, ঝোঁকের মাথায় বলেছি। অতঃপর এ বেয়াদবী আর করবো না। অতীতের বেয়াদবীটা মাফ করে দেবেন।

ফারুক মাহমুদ বললো, আরে না-না, বেয়াদবীর কি আছে।

ইয়াসমীন আরা বললো, কি আছে তা আমি বুঝি। ও নিয়ে বিতর্কের সময় নেই। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সওদাগুলো দিন, আমি বিদেয় হই।

ফারুককে আর কথা বলার সুযোগ দিলো না ইয়াসমীন। ফর্দ অনুযায়ী জিনিস পত্রগুলো ইয়াসমীনের ঝুড়িতে দিলো ফারুক মাহমুদ। দাম দিয়েই ঝুড়ি সহ দ্রুত পদে রওনা হলো ইয়াসমীন আরা।

৩

বেশ কিছুদিন পরে ফারুক মাহমুদের বন্ধু মনোয়ার হোসেন আজ আবার ফারুক মাহমুদের দোকানে এসে হাজির হলো এবং দুবন্ধুতে বসে বসে গল্প জুড়ে দিলো। গল্পের শুরুতে ফারুক মাহমুদ বললো, তাহলে তোর যেই কথা সেই কাজ? অর্থাৎ, রাজনীতির সাথেই সেঁটে লেগে গেলি?

মনোয়ার হোসেন বললো, হ্যাঁ, তাই গেলাম। সেদিন বলেছিলাম না, আল্লাহর আইন অনুযায়ী দেশ না চললে, কারো মুক্তি নেই? মতলববাজ মানুষের মতলববাজীর দ্বারা দেশ চলবে যতদিন, ততদিন গোটা দেশের তথা গোটা বিশ্বের মানবতা চরমভাবে নির্যাতীত আর নিপীড়িত হতে থাকবে। বিশেষ করে, মুসলমানদের দুর্দশার সীমা থাকবে না। কাজেই মুসলমানদের আর এদিকে নজর না দিলে চলবে কেন?

ঃ তাই ইসলামী দলে যোগ দিলি?

মনোয়ার হোসেন মৃদু হেসে বললো, তবে কি ঐ ফ্রিস্টাইলারদের দলে যোগ দেবো? দেশের চলমান মুক্ত চিন্তার মুক্ত বিহঙ্গ মুক্ত বিহঙ্গীদের দলে?

ঃ মুক্ত বিহঙ্গ মুক্তবিহঙ্গী!

ঃ মানে নো বাধা বন্ধন। স্বধর্মের অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে যেমন খুশি তেমন চলে যারা, তাদের দলে কি যোগ দেবো?

ঃ ও, স্বধর্ম বিরোধী ঐ আব্বা-গোসাই আম্মা-গোঁসাইদের কথা বলছিস্?

ঃ জি-জি। ঐ দলে যোগ দিয়ে দিনরাত সংকীর্তন গেয়ে বেড়ালে কি আল্লাহর আইন কায়েম করা যাবে?

ফারুক মাহমুদ এবার কলকণ্ঠে বলে উঠলো—নো-নো, নেভার। বরং ঐ দল আরো ভারী করে তুললে দেশটাকে আর একটা গয়া-কাশী-বৃন্দাবন বানাতে মোটেই অধিক দিন লাগবে না।

ঃ ফারুক!

ঃ গীতা বেদ মঙ্গলঘটের পাশে মঙ্গল দীপ জ্বলে গেছে। আর একটু জোরে ঠেলা পড়লেই ব্যস্, একদম হরেরাম হরেকৃষ্ণ। আল্লাহর আইনের খোয়াবটাও দেখতে হবে না আর।

ঃ তবে?

ঃ ঠিকই আছে। রাজনীতি করলে তো ঐ ইসলামী দলই করতে হবে। এর বিকল্প নেই। কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি?

ঃ কিন্তু কাজটা বড় কঠিনরে। দেশটা নব্বুইভাগ মুসলমানের হলেও স্বাধীনতা কায়েম হওয়ার পর থেকেই সোনার বাংলার মুসলমানদের মন-মানসিকতা যে ভাবে পাল্টে গেছে, তাতে কি এখানে আল্লাহর আইন চালু করা আদৌ সম্ভব হবে!

ঃ কেন নয়?

ঃ সিংহভাগ মানুষই তো এটার বিরোধিতা করছে। এর সাথে যে মগজধোলাই চলছে, তাতে এক শ্রেণীর মুসলমান আমরণ এর বিরোধিতা করতেই থাকবে। এমত অবস্থায় আদৌ কি কোন দিন—

ঃ এমত অবস্থাতেই ইনশাআল্লাহ চলে আসবে আল্লাহর আইন। এক দিনেই হবে না, সময় লাগবে। সৎ নিয়াতে মেহনত করতে থাকলে একদিন আল্লাহর আইন জরুর চলে আসবে। এর কোন বিকল্প থাকবে না।

ঃ মনোয়ার।

ঃ আল্লাহর আইন মানে কি? সর্ব কালের সর্বোৎকৃষ্ট আইনই আল্লাহর আইন। যাতে করে সব মানুষের সব সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়, সব মানুষের ন্যায্য দাবী পূরণ হয় আর ধনী গরীব নির্বিশেষে, মানুষের সুখ শান্তি নিশ্চিত হয়—সেই আইনই আল্লাহর আইন। অথচ এমন একটা কল্যাণ মানুষ মেনে নিতে চাইছে না কেন জানিস্? চাইছে না এই কারণে যে, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে সব মানুষই অসৎ, স্বার্থপর, মতলববাজ, লোভী আর বেঈমান। নামেই এরা মানুষ, কিন্তু এদের অনেকেরই মনুষ্যত্ব একদম পচে-গলে শেষ হয়ে গেছে। যাদের তা এখনো হয়নি, তাদের পেছনে মেহনত দিতে হবে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ তাদের সমঝাতে হবে, বোঝাতে হবে, আল্লাহ আর আখেরাতের দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরানোর সর্ববিধ চেষ্টা করতে হবে। ইসলামী দল করবে যারা, তাদের অন্যদলের নেতাকর্মীদের মতো বসে বসে ব্যক্তিগত স্বার্থ গোছানোর চিন্তায় বিভোর থাকার অবকাশ নেই। বিপথগামী মানুষদের সৎপথে আনার জন্য নসিহতের সাথে সৎ আচরণ, সৎ ব্যবহার আর সৎ চরিত্রের দ্বারা এদের প্রভাবিত করতে হবে। আদর্শ জীবন আর জিন্দেগীর দিকে টেনে আনতে হবে। আদর্শ জীবন আর জিন্দেগীর প্রতি এদের অনুপ্রাণিত করতে পারলেই, অন্য কথায় এদের সৎ মানুষ বানাতে পারলেই চলে আসবে আল্লাহর আইন। দেশের অধিকাংশ মানুষ সৎ হয়ে গেলে সৎ মানুষের হাতেই ক্ষমতা আসবে তখন। অসৎদের পেছনে থেকে দাগা খেয়ে খেয়েও কালক্রমে অনেক লোক সৎপথে আসবে। কিছুটা সময়ের ব্যাপার—এই যা।

ঃ মনোয়ার!

ঃ ও হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সৎ মানুষের হাতে ক্ষমতা এলে সেই সৎ মানুষেরা সৎ আইন তৈয়ার করতে চাইবে যখন, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তখন আল্লাহর আইনই চলে আসবে তাদের হাত দিয়ে। কারণ, আল্লাহর আইন—অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহর নির্দেশিত আইনের চেয়ে আর কোন উত্তম আইনই খুঁজে পাবে না তারা।

ঃ তা ঠিক—তা ঠিক।

ঃ যে যত পাণ্ডিত্যের বড়াই-ই করুক, কুরআন সুন্নাহর নির্দেশিত ঐ নিয়ম কানুনের চেয়ে উত্তম কানুন তৈয়ার করার সাধ্য এ দুনিয়ায় কোন মানুষের নেই।

এই সময় দোকানে এক যুবক এসে মেজাজী কণ্ঠে বললো, এই মিয়া, দেখি-দেখি, একটা টুথপেস্ট দাও তো!

আলোচনা বন্ধ করে ফারুক মাহমুদ গিয়ে একটা টুথপেস্ট নিয়ে এলো। সেটা বাড়িয়ে ধরলে আগন্তুক যুবকটি নাক কুঁচকে বললো, আরে দূর! একি থার্ডক্লাস মাল দেখাচ্ছো, ভাল জিনিস দাও।

ফারুক মাহমুদ বললো, এটা খুব ভাল জিনিস। এদেশের সেরা আর বিশ্বাসী কোম্পানীর জিনিস্ এটা।

চোখ মুখ আরো কিছুটা বিকৃত করে আগন্তুকটি বললো, রাবিশ্! ও সব বাজে জিনিস ইউজ্ করিনে আমি। আমাকে ইন্ডিয়ান জিনিস্ দাও, ইন্ডিয়ান টুথপেস্ট।

ফারুক মাহমুদ ঠান্ডা কণ্ঠে বললো, ইণ্ডিয়ান টুথ্পেস্ট? না ভাই, আমার দোকানের প্রায় সব জিনিসই দেশী। পারত পক্ষে কোন বিদেশী মাল আমি দোকানে রাখিনে।'

যুকবটি অবলীলাক্রমে বললো, আরে বিদেশী হবে কেন? ভারতের জিনিস। পিওরলী ভারতীয় জিনিস চাচ্ছি আমি। ভারত বাংলাদেশ কি আলাদা দেশ যে বিদেশী বলছো?

ফারুক মাহমুদ স্তম্ভিত হয়ে গেল। স্তম্ভিত হলো তার বন্ধুটিও। তাজ্জব হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর ফারুক মাহমুদ বিস্মিতকণ্ঠে বললো, বলেন কি! ভারত বাংলাদেশ কি দুইটা আলাদা দেশ নয়?

যুবকটি স্মিতহাস্যে বললো, আরে ব্রাদার, নামকাওয়াস্তে দুইটি পৃথক দেশ হলেও আসলে তো তা নয়। আসলেই এই দুই দেশ এক দেশ।

ঃ এক দেশ?

ঃ অবশ্যই। ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক। এক পরিবার, এক ফ্যামিলি। আমরা পৃথক হতে যাবো কেন? এই দেশভাগকে, মানে বাংলাদেশের এই স্বাধীনতাকে তো মানিনে আমরা। ভারতের সাঙ্গে এক হয়ে ছিলাম, ফের এক হয়েই যেতে চাই।

ঃ তার মানে? আপনারা কি তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক?

ঃ কেন, আমরা তা হবো কেন? স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক তো ঐ মৌলবাদীরা। ইসলাম ইসলাম করে যারা, তারা।

ঃ কিন্তু তারা তো বাংলাদেশের এই স্বাধীনতাকে ভাগাড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ভারতের সাথে এক হয়ে যেতে চাচ্ছে না?

ঃ সেই জন্যেই তো স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক তারা। ভারতের সাথে এক হতে চায় না যারা, তারাই স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক। আপনজন চেনে না যারা তারা শুধু স্বাধীনতার কেন, সব কিছুরই ঘোর শত্রু।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ভারত আমাদের বড় ভাই। একই মায়ের সন্তান আমরা। এই যে এই স্বাধীনতাটা পেয়েছেন, এটাও ঐ ভারতেরই দান। ভারতীয়রাই এদেশ স্বাধীন করে দিয়েছে। ইচ্ছে করলে এই স্বাধীনতা তারা নিয়েও নিতে পারে আবার।

ঃ নিয়েও নিতে পারে?

ঃ নেবেই তো। বড় ভাইয়ের সাথে ছোটভাই বেয়াদবী করলে রাখবে কেন এই স্বাধীনতা? যতদিন বড় ভাইয়ের প্রতি ছোটভাই শ্রদ্ধাশীল থাকবে, অনুগত থাকবে, বড় ভাইয়ের হুকুম নির্দেশ মেনে চলবে, ততদিন স্বাধীনতাটা ভোগ করতে পারবে, তার বাইরে নয়।

ঃ বলেন কি?

ঃ এইটেই কথা। তা যাক এসব। ভারতীয় টুথপেস্ট না থাকে একটা ব্লেড দাও, ভারতীয় ব্লেড, আমি যাই—।

যান। ভারতীয় কোন ব্লেড নেই?

ঃ নেই! ব্লেডটাও নেই? তাহলে কি আছে তোমার দোকানে? ভারতীয় জিনিস মানেই সেরা জিনিস। সে সব বাদ দিয়ে কি ছাইভস্ম দোকানে রেখেছো তুমি?

ঃ ছাইভস্ম নয়। স্বদেশের সেরা সেরা জিনিসগুলিই রেখেছি আমার দোকানে। আমাদের এদেশের এমন অনেক পণ্য আছে যা ভারতের চেয়ে দশগুণে বিশুদ্ধ আর উত্তম।

আগন্তুক ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো, কি! ভারতীয় পণ্যের চেয়ে দেশী পণ্য উত্তম?

ঃ প্রায় পঁচাত্তর শতাংশই উত্তম। বিশেষ করে ভারত থেকে এদেশে যতমাল পাচার হয়ে আসে, তার প্রায় সবগুলোই অত্যন্ত নিম্নমানের আর ভেজাল মিশ্রিতমাল। কৃষিজাত সার-বীজ-তেল-চিনি থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি-যন্ত্রাংশ সবকিছুই খুবই নিম্নমানের। নিজের দেশে এর চেয়ে অনেক গুণে উত্তম মাল থাকতে নিম্নমানের মাল দোকানে রাখবো কেন আর দেশের পয়সা বাইরে পাঠাবো কেন?

ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে আগন্তুক বললো, আরে এই, এই মিয়া, জলে বাস করে কুমীরের সাথে বিবাদ করতে চাও? ভারতের পণ্যের বদনাম করো ভারতের দয়ার উপর বেঁচে থেকে?

ঃ ভারতের দয়ার উপর?

ঃ একশোবার।

এরপর মনোয়ার হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগন্তুক বললো, তুমি কি বলো? ঠিক নয় আমার কথা?

মনোয়ার হোসেন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনার হিসাবে একদম ঠিক। তা ভাই সাহেবের অরিজিন্যাল বাড়ি কি ভারতে?

ঃ কেন, একথা বলছেন কেন?

ঃ বাংলাদেশকে ভারতের সাথে এক করতে চাইছেন যখন, তখন তো মনে হয় বাড়ি আপনার ভারতেই আর এখনোও আপনার সব কিছু ওখানেই আছে।

উত্তেজনার সাথে আগন্তুক বললো, কখনো নয়। আমার আর আমার চৌদ্দ পুরুষের বাড়ি এই বাংলাদেশেই।

ঃ তাই নাকি? বেশ-বেশ! তা ভাই সাহেবের নামটা জানতে পারি কি?

আগন্তুক সাগর্বে বললো, আমার নাম আবুল কাশেম কানাই।

মনোয়ার হোসেন বিস্মিতকণ্ঠে বললো, এ্যাঁ, কানাই? আবুল কাশেম নামটা তো ভালই। এর সাথে আবার কানাই কেন? ওটা কি আপনার পদবী?

ঃ না, ওটা আমার ডাক নাম। নিজেই আমি এই ডাক নামটা রেখেছি।

ঃ ডাক নাম? নিজেই রেখেছেন?

ঃ হ্যাঁ, কানাই নামেই আমি অধিক পরিচিত।

ঃ তাই নাকি? বেশ-বেশ। তা আপনি তো মুসলমান। অর্থ জানেন ঐ নামের? ঐ নামটার মানে কি?

কানাই মিয়া রুষ্ট কণ্ঠে বললো, মানে! ইয়ার্কী মারছেন আমার সাথে? ডাক নামের আবার মানে কি? মানের কি দরকার?

মনোয়ার হোসেন নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক। কে আর আজকাল নামের অর্থ খোঁজে? তা বলছিলাম কি ভাই সাহেব, এ দোকানে যখন আপনার প্রিয় জিনিসগুলো নেই, অন্য দোকানে যান, এনিয়ে খামাখা পেঁচাল পেড়ে লাভ কি?

ঃ পেঁচাল! আমি পেঁচাল পাড়ছি?

ঃ না, ঠিক পেঁচাল নয়। তবে কথা কাটাকাটি করারও তো কোন কারণ নেই।

কানাই মিয়া আরো চড়া গলায় বললো, কে করছে কথা কাটাকাটি? আমি করছি?

মনোয়ার হোসেন এবার শক্ত কণ্ঠে বললো, দেখুন, এত কথারও দরকার নেই। আপনার জিনিস এ দোকানে নেই ব্যস, ফুরিয়ে গেল। আপনি অন্য দোকানে যান। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের ডিস্টার্ব করবেন না আর অনর্থক ঝনঝাট পয়দা করবেন না। যান—

ঃ কি, আমাকে অপমান করছেন? আমাকে হুকুম করছেন চলে যাবার? আমাকে চেনেন? সামান্য দোকানদার হয়ে—

ঃ তবেরে—

হুংকার দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মনোয়ার হোসেন। আবুল কাশেম কানাই এবার চমকে উঠে পথে নামলো তৎক্ষণাৎ। মাথা গুঁজে যেতে যেতে বিড় বিড় করে বলতে লাগলো—মৌলবাদী, এ ব্যাটারা নির্ঘাত মৌলবাদী!

বিদায়মান কানাই এর দিকে চেয়ে থেকে ফারুক মাহমুদ স্বাগতোক্তি করলো—এই হলো দেশের বর্তমান অবস্থা!

এই সব বেশরম ভারত প্রেমিকদের উৎপাত বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন। কি আহামরি নাম সব!

শুনে মনোয়ার হোসেন বললো, তবু রক্ষে যে, এদের সংখ্যা অধিক নয়। চিহ্নিত ঐ অশুভ মহলটির মধ্যেই এদের সংখ্যা এখনো সীমাবদ্ধ আছে। দেশের আমজনতার মধ্যে এদের বিস্তারলাভ ঘটেনি।

ফারুক মাহমুদ মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলো—অর্থাৎ?

মনোয়ার হোসেন বললো, অর্থাৎ, এরা মূলত শহর ভিত্তিক, বিশেষ করে রাজধানী ভিত্তিক লোক আর বুদ্ধিজীবী নামের কিছু দুর্বুদ্ধিজীবী মানুষ। অন্য কথায়, ঐ অশুভ মহলটির বেস্টনীর মধ্যেই এদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

ঃ তা হলেও ঐ অশুভ মহলটির ব্যাপকতাও তো কম নয়। ওদের সভা সমাবেশে অনেক লোকই দেখা যায় সব সময়। www.boighar.com

ঃ তবুও ওটা ওদের সাকুল্য সংখ্যাই বলতে পারিস। এই গোটা দেশব্যাপী ওরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একত্র হলে তো অনেক লোক হবেই।

ঃ মনোয়ার!

ঃ ওরা খুবই সক্রিয় আর সজাগ, বুঝলি। কোন সভা সমাবেশের খবর পেলেই ওরা আবাল বৃদ্ধ আর অসুস্থ-আধমরা–সবাই ছুটে এসে জড়ো হয় ওদের জনশক্তি দেখানোর জন্যে। যেমন আসে ভোটের সময়। কেউ ঘরে বসে থাকে না। কিন্তু ঘুরে ফিরে ওরা ঐ একই জনগোষ্ঠী। দেশের সর্বত্র থেকে ঐ একই লোকেরা বার বার এসে জড়ো হয় এদের সমাবেশে। একই কুমীরের বাচ্চা তিনবার করে দেখানোর মতো। এর সাথে ভাড়াটে লোক তো আছেই।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ, তাই। হাকিম হলেও, তুই মফস্বল শহরের লোক। এসব খবর রাখিস্‌নে। আমরা রাজধানীর লোক। এদের এ খেলা বরাবর দেখে আসছি।

ঃ তার মানে? তুই তো রাজধানীতে ছিলিনে। বিদেশে ছিলি। তুই এসব দেখলি কখন?

ঃ সে আর কয়দিন বিদেশে ছিলাম? যে কয়দিন বিদেশে ছিলাম তার মধ্যেও তো মাঝে মাঝেই বাড়িতে এসেছি বেড়াতে। বরাবর ঐ একই কারবার দেখে আসছি ওদের।

ঃ তা না হয় দেখলি, কিন্তু ভোটও তো ওরা কম পায় না! প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ পারসেন্ট। সংখ্যায় ওরা কম হলে এত ভোট পায় কি করে?

ঃ পাবেই তো। ওদের ভোটব্যাংক আছে না? দেশের তামাম হিন্দুসহ বৌদ্ধ, খৃষ্টান, এন্‌জিও-ফেন্‌জিও যত অমুসলমান আছে এই দেশে, তারা সবাই একচেটিয়া ভাবে ভোট দেয় এদের। সবাই এরা ইসলামের শত্রু। মুসলমানদের হাত যাতে করে শক্ত হতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য এদের সবার।

ঃ হুঁ।

ঃ সেই সাথে এদেশে আছে আবার কিছু লোভী আর মূর্খ মুসলমান। ঐ মহলকে মনে প্রাণে পছন্দ না করলেও নির্বোধেরা অধিকাংশ টাকা খেয়ে আর কিছু লোক ওদের ভাঁওতায় ভুলে হুজুগেই ভোট দেয় ওদের। সব মিলে ওদের পক্ষের ভোট ঐ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ পারসেন্টে উঠে যায়। এ অবস্থায় বাদ বাকী ঐ চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি পারসেন্ট

ভোটের মধ্যে যদি ভাগাভাগির প্রশ্ন এসে যায়, তাহলে ঐ অশুভ মহলটির গোল দেয়া আর রুখে কে?

জোরে মাথা দুলিয়ে ফারুক মাহমুদ বললো, ঠিক-ঠিক, এইটেই হলো এদেশর প্রকৃত অবস্থা আর দেশবাসীর সার্বক্ষণিক ভয়। পা ফেলতে দেশবাসী একটু ভুল করলেই একদম সর্বনাশ! টুপি ফেলে টিকি রাখার দশা হবে সবার।

নড়েচড়ে উঠে মনোয়ার হোসেন বললো, সে তো বুঝতেই পারছিস্। তা এসব কথা থাক, আমি এখন উঠবো। তার আগে বলতো, তুই নাকি সেদিন কোর্টের ওদিকে গিয়েছিলি?

ফারুক মাহমুদ মুখ তুলে বললো, কার কাছে শুনলি?

ঃ জসমত মিয়ার কাছে। ঐ যে সাব্‌সিডিয়ারী ক্লাসগুলো আমরা এক সাথে করতাম সেই হাতভাংগা জসমত মিয়ার কাছে, জসমত মিয়া তোকে ওখানে দেখেছিল। সে আমার কাছে জানতে চাইলো, তোর ওখানে কাজটা কি?

ঃ তারপর?

ঃ আমি কিছু জানিনে, তাই জবাব দিতে পারলাম না। কোথায় সেই জনসন রোড আর কোথায় তোর এই দোকান। হঠাৎ তুই ওখানে কি জন্যে গিয়েছিলি?

ফারুক মাহমুদ ঈষৎ হেসে বললো, ওখানে মানে একটা নন জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প্ আনতে গিয়েছিলাম। এই দোকানটার লেখাপড়া করে নেয়ার কাজটা মানে পাকাপাকিভাবে লেখাপড়া করে নেয়াটা এখনো বাকী আছে কিনা, তাই।

ঃ ও, এই ব্যাপার!

ঃ গতকাল সেই লেখাপড়াটা পাকাপাকি করা হয়েছে। এই যে আমার কপিটা টেবিলের এই ড্রয়ারেই আছে।

ফারুক মাহমুদ টেবিলের ড্রয়ারে হাত দিলো। এই সময় কদর আলী এসে উল্লাস ভরে বলে উঠলো—আরে মেহমান যে! সেই মেহমান! তা স্যার কখন এলেন আপনি? চা-পানি খাওয়াটা কি হয়েছে, না অমনি অমনি বসে আছেন?

কদর আলীর ব্যস্ততা দেখে মনোয়ার হোসেন হেসে বললো, কই আর হলো? যে কিপ্‌টের কিপ্‌টে তোমার এই মুনিব! শুধু মুখের কথা দিয়েই মেহমানদারী করতে চায়, পকেটে হাত দিতে চায় না। আরো অধিক ব্যস্ত হয়ে উঠে কদর আলী বললো সেকি এখনো চা-পানি হয়নি? আপনি বসুন স্যার, একটু বসুন, এখনই আমি দেখছি—

কদর আলী ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো। তাকে থামিয়ে দিয়ে মনোয়ার হোসেন বললো, না-না, সময় নেই, আজ আর সময় নেই। আমি এখনই উঠবো।

ঃ সেকি! ভাইজান এটা তাহলে করলেন কি? চা-পানি না দিয়েই এতক্ষণ বসিয়ে রাখলেন আপনাকে?

ঃ দরকার ছিল না। চা-পানি খেয়েই আমি এসেছিলাম এখানে। তুমি তোমার কাজে যাও, আমি উঠি–

আরো কয়েকদিন পরের কথা। ফজরের আযানের সাথে সাথেই উঠে ফারুক মাহমুদ ফজরের নামাজ আদায় করলো এবং বরাবরের মতো খোলা জানালার পাশে বসে অনেকক্ষণ যাবত কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করলো। এরপরে একটু হাঁটাহাটি করার জন্যে বেরিয়ে এলো ফারুক মাহমুদ। ঘরের দুয়ার বন্ধ করে রাস্তায় চলে এলো।

তার দোকানের সামনের সদর রাস্তাটা তখনও খালি। মানুষের আর যানবাহনের চলাচল তখনও শুরু হয়নি বললেই চলে। দু'একজন মানুষ আর দু'একটা রিক্সা-ভ্যান ইতিউতি ঘোরা ফেরা করা ছাড়া রাস্তাটা একদম ফাঁকা। দোকানের সামনে এই ফাঁকা রাস্তায় গা মেলে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতেই ফারুক মাহমুদের সামনে এসে দাঁড়ালো ইরফান আলী। ইয়াসমীনদের বিশ্বস্ত চাকর ইরফান মিয়া। ইরফান মিয়া এসে সালাম দিয়ে বললো, বাপজান, আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল। একপাশে এসে একটু দাঁড়ালে ভাল হয়।

সালামের জবাব দিয়ে ফারুক মাহমুদ একপাশে এসে দাঁড়ালো এবং বললো, আমার সাথে কথা! তা তুমি, মানে আপনি তো সেই ইরফান আলী? ইয়াসমীন আরাদের কাজের লোক ইরফান মিয়া?

ইরফান মিয়া বললো, জি বাপজান, আমিই সেই ইরফান মিয়া। তা আমাকে আপনি আপনি করবেন না। সবাই তুমি বলে, আপনিও তুমি বলবেন।

ঃ তুমি বলবো?

ঃ সেইটেই ভাল আর সুন্দর হবে বাপজান। চাকর-বাকর মানুষকে আপনি আপনি করলে খামাকাই লোক হাসানো হবে।

ঃ বলেন কি!

ঃ না বাপজান, "বলেন" নয়, বলো বলুন।

একটু থেমে ফারুক মাহমুদ বললো, আচ্ছা না হয় তাই হলো। কিন্তু আমার কাছেই কি তুমি এসেছো? মানে, আমি কে, তা কি চিনতে পেরেছো ঠিকঠিক?

ঃ কেন পারবো না বাপজান? আপনিই তো ইয়াসমীন মা-মণিকে সেবার রাস্তায় গোলমালের সময় বাঁচিয়েছিলেন।

ঃ হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো। কিন্তু তখন তো আমার চেহারা এরকম ছিল না। একজন মুটে-মজুরের চেহারা ছিল আমার তখন। তবু আমাকে চিনতে আজ অসুবিধে হলো না তোমার?

ঃ হয়তো কিছুটা হতো। কিন্তু ইয়াসমীন মা-মণির মুখে শুনেছি সব। উনাদের এই দোকান বাড়িটা আপনিই ভাড়া নিয়েছেন আর দোকান দিয়েছেন এখানে—কয়েকদিন আগে মা-মণি সে সব কথা আমাকে সবই বলেছেন। তা ছাড়া—

ঃ তা ছাড়া?

ঃ সেদিনও আপনাকে আমার চেনা চেনা লেগেছিল। মানে এই দোকানের দোকানদারের মতোই আপনাকে আমার মনে হয়েছিল। আপনাকে তো আগে আমি কয়েকবার দেখেছিলাম। কিন্তু ইয়াসমীন মা-মণি আপনাকে অন্যের বাড়ির নওকর বলে পরিচয় দেয়াতেই কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল।

ঃ তারপর?

ঃ এই কয়দিন আগে মা-মণি যখন বললেন, "আপনি কারো বাড়ির নওকর নন, এই দোকানের দোকানদার আপনি,"

তখনই আমার তামাম গোলমাল কেটে গেল। দোকানে এসে দেখলাম, হ্যাঁ-ঠিক, সেই লোকই আপনি।

ঃ তাই নাকি? আমার দোকানে এসেছিলে?

ঃ কয়েকবার।

ঃ তাহলে কথা বলোনি কেন আমার সাথে?

ঃ কি করে বলবো? যখনই এলাম, তখনই আপনাকে খুব ব্যস্ত দেখলাম। হয় খদ্দেরদের নিয়ে, নয় অন্যের সাথে গল্প করা নিয়ে আপনাকে খুব ব্যস্ত দেখলাম। তাই আর কথা বলা হলো না।

ঃ বলো কি।

ঃ আপনি ফাঁকা থাকলে কথা বলা যেতো। ব্যস্ত মানুষের সাথে কথা বলবো কি করে? আমি চাকর-বাকর মানুষ। আমার কথা তো কোন জরুরী কথা ছিল না। এই এম্‌নি একটু আলাপ সালাপ!

ফারুক মাহমুদ হেসে বললো, তাই নাকি? তাহলে এখন কি বলতে এসেছো? সেই আলাপ সালাপ, না জরুরী কোন কথা আছে?

হুঁশে এসে ইরফান মিয়া ব্যস্তকণ্ঠে বললো, জরুরী কথা-জরুরী কথা। এই দেখুন, আসল কথা না বলে কেবলই অন্য কথা বলছি। খুব জরুরী কথা নিয়েই আজ আমি এসেছি।

ঃ জরুরী কথা? কি সে জরুরী কথা?

ঃ আজ কিছুক্ষণ আগে আপনার এই দোকান বাড়িতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত কে করলেন? আপনি, না অন্য কেউ?

ঃ কেন বলো তো?

ঃ মা-মণি সেটা জানতে চাইলেন।

ঃ মা-মণি! কোন মা-মণি?

ঃ ইয়াসমীন মা মণি। ইয়াসমীন মা-মণি জানতে চাইলেন।

ফারুক মাহমুদ বিস্মিতকণ্ঠে বললো, তিনি জানতে চাইলেন? কেন বলো তো?

ঃ কথা বলবেন মা মণি। সেই লোকের সাথে কথা বলবেন।

ঃ কি কথা?

ঃ সেটা কি আমি জানি? আপনি বলুন না, কে তেলাওয়াত করলেন?

ঃ আমিই তেলাওয়াত করলাম। ঐ দোকানবাড়িতে তো আমি ছাড়া কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার মতো আর কেউ নেই।

আনন্দে একদম নেচে উঠলো ইরফান মিয়া বললো, আপনি! সোবহান আল্লাহ-সোব্হান আল্লাহ। তাহলে আসুন-আসুন, শিগ্গির আসুন। ইয়াসমীন মা-মণি কথা বলবেন আপনার সাথে।

ঃ কথা বলবেন মানে? কোথায় তিনি? www.boighar.com

ঃ তিনি তার বাড়িতে।

ঃ তাঁর বাড়িতে? আমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে হবে?

ঃ জি-জি। তাই তিনি বলেছেন। বলেছেন, সে লোক যদি আপনি হন, তাহলে আর কোন কথা নেই, সরাসরি আপনাকে তাঁর বাড়িতে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর যদি অন্য কেউ হয়, তা হলে কে সে লোক-তাঁর সঠিক খোঁজ-খবরটা নিয়ে যেতে হবে। আপনিই যখন সেই লোক, তাহলে আর কথা নেই। দয়া করে আসুন আমার সাথে।

ঃ তাজ্জব! আমার কুরআন শরীফ তেলাওযাত করাতে তাঁর কি ক্ষতি বৃদ্ধি হলো যে উনি তলব দিলেন আমাকে? তাতে কি তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছে?

ঃ না-না, তা ঘটবে কেন? ঐ সময় কি তিনি কখনো ঘুমিয়ে থাকেন?

ঃ তবে? আমি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করেছি- এ কথা উনি কার কাছে শুনলেন?

ঃ কারো কাছে নয়। উনি নিজের কানে শুনেছেন।

ঃ নিজের কানে? তাজ্জব! তোমাদের বাড়িতো এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আমি ঘরের মধ্যে বসে তেলাওয়াত করলাম। সেটা উনি কোথা থেকে শুনলেন? ঐ সময় কি তিনি বাড়ির বাইরে এসেছিলেন?

ঃ না-না, তখন তিনি তিন তলার ছাদে উঠেছিলেন। ঐ ছাদ থেকে আপনার এই দোকানবাড়ি তো সরাসরি দেখা যায় আর এখানকার সব কথা শোনা যায়।

ঃ বলো কি! প্রতিদিন সকালেই কি তাহলে ছাদে উঠেন উনি?

ইরফান মিয়া সরবে বললো-না-না, মা-মণি বললেন, অনেকদিন পরে এই আজকেই-উনি ঐ ছাদে উঠেছিলেন। একটু হাঁটা-হাঁটি করতে নাকি ওখানে গিয়েছিলেন।

ঃ ঐ ছাদে?

ঃ হ্যাঁ। অন্যদিন ভোরে উনি বাড়ির আঙ্গিনাতেই হাঁটাহাঁটি করেন। আজ কেন যেন ঐ ছাদে গিয়েছিলেন। তা এসব কথা থাক। যা কিছু জানতে চান, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন। এখন দয়া করে আসুন বাপজান, বেশি দেরী হলে উনি আমাকে বেজায় বকাবকি করবেন।

ফারুক মাহমুদ ইতস্তত করে বললো-কি মুস্কিল! এইভাবে যাই কি করে? পরণে লুঙ্গি গায়ে একটা যেমন-তেমন জামা! রাস্তায় কেউ নেই বলে এইভাবে বেরিয়েছি। না-না, তুমি পরে এসো। আমি বাসায় গিয়ে কাপড় জামা বদল করি।

ঃ ওরে বাপ্‌রে! আপনিই সেইলোক-এটা জানার পর আপনাকে রেখে গেলে আর রক্ষে নেই। একদম তেড়ে আসবেন। আপনি চলুন বাপজান।

ঃ কিন্তু যাই কি করে? এইভাবে কি কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে যাওয়া যায়? বিশেষ করে দো-তলায়-তিনতলায়?

ঃ না-না, দো-তলায় তিনতলায় নয়। নিচের তলায় বৈঠক খানায় যাবেন। বৈঠক খানা একেবারেই বাহির আঙ্গিনার সামনে। বাহির আঙ্গিনা থেকেই কথা বলা যায়। আপনি গেছেনও তো কয়েকবার ওখানে ঐ বাড়িভাড়ার ব্যাপার নিয়ে। আপনি লক্ষ্য না করলেও আমি আপনাকে লক্ষ্য করেছি ঠিক। চলুন বাপজান, চলুন। এ আর এমন কি খারাপ পোষাক। কিছুটা পুরাতন হলেও সব পরিষ্কারই তো আছে। উনি কি বলতে চান, কথাটা শুনেই চলে আসবেন?

ইরফান মিয়ার পীড়াপীড়িতে ফারুক মাহমুদ আর আপত্তি করতে পারলো না। ধীরে ধীরে রওনা হলো ইরফান মিয়ার পেছনে।

ইয়াসমীন আরা বেগমের আব্বার নাম আবদুর রাজ্জাক তলবদার। তলবদার তাঁর পদবী। আবদুর রাজ্জাক সাহেবের প্রপিতামহ আবদুস সবুর তলবদার তৎকালীন এক জমিদারের কাচারীর পেয়াদা ছিলেন। খাজনা আদায়ের জন্যে প্রজাদের তলব দিয়ে বেড়াতেন বলে তাঁকে বলা হতো তলবদার। সেই থেকে তাঁর বংশের পদবীও হয় তলবদার। সবুর সাহেবের পরে তার বংশধরেরা অনেকেই জাতে উঠার জন্যে তলবদার থেকে পদবীটা তালুকদার বানিয়ে নিয়েছে। তালুক না থাকলেও তারা তালুকদার বনে গিয়েছে। কিন্তু যে কারণেই হোক, আবদুর রাজ্জাক তলবদারের সেটা করা হয়নি। অর্থাৎ তলবদার পদবীটা বদলিয়ে তালুকদার করতে পারেননি। ফলে পৈতৃক তলবদার পদবীটাই আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। তবে পদবী তার তালুকদার না হলেও , বুদ্ধির তথা দুর্বুদ্দির জোরে এক্ষণে অনেক বিষয়বিত্ত হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। বিশাল এক বাড়িসহ ছোট ছোট আরো কয়েকখানা বাড়ি আর এক মস্তবড় মিল ও কারখানা এখন তাঁর কব্‌জায়।

আবদুর রাজ্জাক তলবদার সাহেব যে বাড়িতে এক্ষণে বাস করেন, সে বাড়িটা তিনতলা বাড়ি এবং আকারে বিশাল। কিন্তু এই বিশাল বাড়িতে বাস করার মতো প্রচুর লোকজন তাঁর পরিবারে নেই। পরিবারের লোক বলতে তলবদার সাহেব নিজে, তাঁর

বর্তমান স্ত্রী আসমা বেগম আর একমাত্র কন্যা বেগম ইয়াসমীন আরা। অন্য যারা বাড়িটা সরগরম করে রাখে-তারা চাকর-বাকর, কিছু আত্মীয় স্বজন আর এক ঝাঁক পরখেকো পরগাছা বায়বীয় শুভাকাংক্ষী। বায়বীয় অর্থ, এই আছে এই নেই এমন শুভাকাংক্ষী। এই শুভাকাংক্ষীরা কেউ আন্তরিক আর স্থায়ী শুভাকাংক্ষী নয়। এই বায়বীয় শুভাকাংক্ষীদের প্রধান আর প্রবলতম ব্যক্তি হলেন তলবদার সাহেবের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ভাই আবদুল গণি গৌতম। অন্যেরা সবাই এই গৌতমেরই ইয়ার-বন্ধু-সাঙ্গোপাঙ্গো। ইন্তেকালের সময় তলবদার সাহেবের এই প্রথমা স্ত্রী স্বামীকে দেখাশোনা করার জন্যে কোন পুত্র-কন্যা রেখে যেতে না পারায়, ভাই আবদুল গণি গৌতমকে রেখে গেছেন তলবদার সাহেবের পাহারায়। এই গৌতমই এখন তলবদার সাহেবের পিঠের ঢাল, শিরের শিরস্ত্রাণ, ঘরের মন্ত্রী, বাইরে সেনাপতি আর তলবদার সাহেবের রথের সারথী। ইয়ারবন্ধু ডেকে এনে এই গৌতমই তলবদার সাহেবের বিশাল বাড়িটা সরগরম করে রাখে সব সময়।

তলবদার সাহেবের এই বিশাল বাড়িতে বাড়তি ঘর অনেক। সব সময় কাজে লাগেনা এমন অনেক কামরা আছে। নিচের তলাতেই একদম্ আঙ্গিনা ঘেঁষে ছোট বড় এমন কামরা আছে তিন তিনটে। এগুলোকে একভাবে না একভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। এই পূবদুয়ারী কামরা তিনটির মাঝেরটা মাঝারী সাইজের। এটা বৈঠকখানা। বৈঠক খানার ডানপাশের কামরাটা ছোট। এটা ইয়াসমীনের পড়ার ঘর। বৈঠকখানার বামপাশের কামরাটা শুধু বড়ই নয়, একেবারে বিশাল। এটা ক্লাব বা জলসা ঘর। অর্থাৎ ক্লাব আর জলসাঘরের মতো করেই ব্যবহার করা হয় এই কামরাটাকে। এই ঘরে মাঝে মাঝেই আবির্ভাব ঘটে এক ঝাঁক তরুণ তরুণীর। অনেক সময় অনেক বিগত যৌবনা তরুণীরাও হানা দেয় এখানে। আবদুল গণি গৌতমের পরামর্শে এবং নিজেরও খানিকটা গরজে এই কামরাটা এই কাজে ছেড়ে দিয়েছেন ইয়াসমীনের আব্বা আবদুর রাজ্জাক তলবদার।

ফারুক মাহমুদকে এনে ইরফান মিয়া এই বৈঠকখানায় বসালো এবং ইয়াসমীনকে খবর দিতে ভেতরে চলে গেল।

বৈঠকখানায় তখন কেউ ছিল না। একদম শূন্যঘর। কথা বলার কেউ না থাকায় মাথা নীচু করে বসে রইলো ফারুক মাহমুদ। কিছুক্ষণ পরে মানুষের পদ শব্দ শুনে মাথা তুললো সে। দেখলো, ইয়াসমীন আরা নয়, বাহির থেকে এসে ঘরে ঢুকছেন ইয়াসমীনের আব্বা আবদুর রাজ্জাক তলবদার আর তলবদারের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ভাই আবদুল গণি গৌতম। গৌতমকে ফারুক মাহমুদ চিনতো কিন্তু দু'একবার দেখে থাকলেও, গৌতম ফারুক মাহমুদকে তেমন একটা চিনতো না। তাই, লুঙ্গি আর সাদামাটা জামা পরা একজন লোককে বৈঠককানায় বসে থাকতে দেখে গৌতম মিয়া থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বিরক্তিরভাব ফুটে উঠলো তার চোখে মুখে। তলবদার সাহেবও দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার, তুমি এখানে যে? কাকে চাও?

ফারুক মাহমুদ উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বললো, না, আমি কাউকে চাইনে। আপনাদের ইরফান মিয়া আমাকে ডেকে এনেছে, তাই।

তলবদার সাহেব আর কিছু বলার আগেই গৌতম মিয়া তলবদার সাহেবকে প্রশ্ন করলো—কে এই লোক? লুঙ্গি পরে এসে সোফা সেটে বসে আছে আরামে!

তলবদার সাহেব বললেন— এ লোককে চিনলে না? ঐ তো আমার ঐ দোকান বাড়ির ভাড়াটে। ভাড়া নেয়ার সময় তুমিও দু'একবার দেখেছো একে।

খেয়াল করার চেষ্টা করে গৌতম মিয়া বললো, এ্যাঁ? ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। তাই তো একটু চেনা চেনা লাগছে। ভাড়া নেয়ার সময়ও দেখেছি, পরেও মনে হচ্ছে আরো কয়েকবার দেখেছি। তা ও এখানে কেন? তলবদার সাহেব বললেন—ঐ তো শুনলে, ইরফান আলী ডেকে এনেছে? হয়তো কোন সওদা পাতির ব্যাপারেই ডেকে আনা হয়েছে। হয় তো সওদাপাতির অর্ডার দিতে। তা হোক, এ সব দেখার সময় আমার নেই। চলো, জলদি ভেতরে চলো, জরুরী কাজ আছে—

গৌতমকে ঠেলে নিয়ে তলবদার সাহেব ভেতরে চলে গেলেন। ফারুক মাহমুদ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, তার সালামের জবাব কোন মুখ থেকেই এলো না। না তলবদারের মুখ থেকে, না গৌতমের মুখ থেকে। তাঁরা চলে গেলে ফের বসে পড়লো ফারুক মাহমুদ।

একটু পরেই চলে এলো ইয়াসমীন আরা বেগম। বৈঠক খানা আর ইয়াসমীনের পড়ার ঘরের মাঝখানে দুই কামরা সংযোগকারী দুয়ার ছিল একটা। দুয়ারটা ভেতরে থেকে বন্ধ ছিল এতক্ষণ। সেই দুয়ার খুলে পড়ার ঘর থেকে ছুটে এলো ইয়াসমীন। প্রফুল্লচিত্তে এসে সে হাসি মুখে বললো, আমি দুঃখিত। একটু দেরী হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য! আপনিই সেই কুরআন শরীফ তেলাওয়াতকারী লোক!

সোফা সেটের অপর প্রান্তে বসে পড়লো ইয়াসমীন আরা। তার বক্ষস্থল ও মুখমণ্ডল তখন ওড়নার দ্বারা যথা সম্ভব আব্রু করা। ইয়াসমীন আরার কথায় ফারুক মাহমুদ মুখ তুলে বললো-জি?

ইয়াসমীন আরা বললো, ইরফান চাচার মুখে শুনে আমি একদম অবাক হয়ে গেছি। আমি ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই কোন মাওলানা, অর্থাৎ আপনার আমন্ত্রিত কোন মেহমান পাঠ করলেন কুরআন শরীফ। কিন্তু সে লোক আপনি?

ঃ জি আমিই। কেন বলুনতো? কোন দোষ হয়েছে কি?

ঃ দোষ! দোষ কি বলছেন? এত সুন্দর কণ্ঠ আপনার? এত নিখুঁত আর শুদ্ধ তেলাওয়াত। শুনে আমি তো মোহিত হয়ে গেছি। অনেক আচ্ছা আচ্ছা মওলানাকেও এমন সুচারুভাবে কুরআন পড়তে দেখিনি। তার উপর আবার আপনার সুমিষ্ট কণ্ঠ! এমন সুমধুর কুরআন তেলাওয়াত দীর্ঘদিন শুনিনি আমি। আপনি এতবড় একজন গুণী লোক? এমন একজন লোক আপনি সামান্য দোকানদার হয়ে ঘাপটি মেরে আছেন?

সচকিত হয়ে ফারুক মাহমুদ প্রশ্ন করলো—এ্যাঁ!

ঘাপটি মেরে আছি মানে?

ঃ মানে, আপনি তো দেখছি একটা ছাইচাপা আগুন। আপনার কাজ কারবার, মানে পেশা-জীবিকা দেখলে তো বোঝার উপায় নেই, আপনি এতবড় একজন আলেম আর এলেমদার মানুষ। সামান্য একজন দোকানদার যে এতবড় একজন গুণী মানুষ মানে এমন একজন আলেম এটা কি কল্পনা করা যায়?

ঃ ও আচ্ছা। তা একটু কুরআন পড়তে পারাটা আর এমন কি গুণের পরিচয়? মুসলমানদের সকলেরই তো এটুকু এলেম থাকা উচিত।

ঃ উচিত ঠিকই। কিন্তু তা ক'জনের আছে, বলুন? তদুপরি এমন সুললিতকণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করার লোক লাখে তো একটা পাওয়াও ভার! আপনি কি মাদ্‌রাসার ছাত্র? মানে, মাদ্‌রাসায় পড়াশুনা করেছেন?

ঃ জি না-জি না। পড়াশুনা আমার অল্প। যেটুকু পড়েছি। জেনারেল লাইনেই পড়েছি আর আরবীটা মনোযোগ দিয়ে পড়েছি—এই আর কি!

ঃ বলেন কি! একটু মনোযোগ দিয়ে পড়েই এত শুদ্ধ করে পড়তে পারেন?

ঃ কতটা শুদ্ধ করে পড়তে পারি, জানিনে। তবে যতটা পারি তা সব আমার মৌলভী স্যারের মেহেরবাণীর ফল।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ অর্থাৎ আমি যাঁর কাছে আরবী পড়েছি, আমার স্কুলের সেই মৌলভী সাহেব খুবই দরদ দিয়ে আমাকে এই সাব্‌জেক্টটা পড়িয়েছেন আর আমিও পড়েছি।

ঃ আর এই সুলোলিত কণ্ঠ?

ঃ কণ্ঠ সবার আল্লাহতায়ালার দান। কারো কণ্ঠ সুমিষ্ট হলে বুঝতে হবে, সেটা আল্লাহ তায়ালা করেছেন। আমার সেই মৌলভী স্যারের কুরআন তেলাওয়াত শুনলে আপনি আওয়ারা বনে যেতেন। আমার চেয়ে কণ্ঠ তাঁর দশগুণে সুমিষ্ট। আমি তার তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনেছি আর তা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

ঃ বলেন কি!

ঃ আর তা ছাড়া, পাক কুরআন এমনই একটা মহাকাব্য যে, সুষ্ঠু আর শুদ্ধভাবে পাঠ করলে তা শ্রুতিমধুর লাগতে বাধ্য। অর্থাৎ, শ্রুতিমধুর তো লাগবেই। এমন একটি মহাকাব্য এ দুনিয়ার কোন কবি সাহিত্যিক আজও রচনা করতে পারেনি, পারবেও না কোন দিন। আর এমনটি বলি কেন, এর কাছাকাছি কোন কাব্যও কেউ তৈয়ার করতে পারবে না, বুঝেছেন?

ঃ জি?

ঃ মানুষের তৈরী কোন কবিতা-পাঁচালী ভাল করে পড়লে শুনতে ভাল লাগে যেখানে, সেখানে আল্লাহর তৈরী কবিতা ভাল করে পড়লে যে শ্রুতি মধুর লাগবে—এটা তো অবধারিত।

আরো অধিক তাজ্জব হয়ে ইয়াসমীন আরা বললো, ওরে বাপ্‌রে! এ দিক দিয়েও তো জ্ঞান আপনার অগাধ! আমি ভারসিটির ছাত্রী। কিছুটা ইসলামিক লাইনেই পড়াশুনা করি। তবু এতটা উপলব্ধি তো আমারই নেই। একজন দোকানদার মানুষ হয়ে আপনি এতখানিও বোঝেন?

ঃ না বোঝার কি আছে? একটু চিন্তা করলেই সবাই তা বুঝতে পারে। তা যাক সে কথা। আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন? সেরেফ এসব আলোচনা করার জন্যেই কি?

ইয়াসমীন আরা হেসে বললো, না, আমার একটা অন্য উদ্দেশ্য আছে। তবে, সেরেফ এসব আলোচনা করার জন্যে ডাকলেও সেটা অন্যায় বা অসংগত হতো না মোটেই। কারণ আলোচনা করার মতো উত্তম বিষয়ই এটা।

ফারুক মাহমুদও হেসে বললো, আচ্ছা বেশ, তা না হয় হলো। এবার আপনার সেই উদ্দেশ্যের কথা বলুন।

ঃ উদ্দেশ্য মানে, আপনার কাছে আমার একটা আবদার। বলতে সাহস হয় না তবুও বলছি—আপনি যদি প্রতিদিন ঘন্টাখানেক করে সময় দেন আমাকে, তাহলে আমি বড়ই বাধিত হই। প্রতিদিন না পারলে, সপ্তাহে দিন তিনেক ঘন্টাখানেক করে সময় দিলেও আমার জিয়াদা উপকার হবে আর আমি খুবই আনন্দিত হবো।

ঃ আচ্ছা!

ঃ অবশ্য মফুৎ সে সময় আমি নেবো না। আপনি দোকানদার মানুষ। আপনার দোকানদারীর কিছুটা ক্ষতি হবে। সেটা আমি পুষিয়ে দেবো আপনাকে উপযুক্ত অর্থ সম্মানী দিয়ে।

ঃ অর্থ সম্মীনী দিয়ে?

ঃ জি-জি, ন্যায্য পারিশ্রমিক। আপনি দয়া করে বলুন আপনি কি ঐ সময়টুকু আমাকে দেবেন? মানে দিতে রাজী আছেন?

ঃ কেন বলুন তো? ঐ সময় কি করতে হবে আমাকে?

ঃ কুরআন পাঠ শেখাতে হবে। শুদ্ধ করে কুরআন পাঠ। সেই সাথে সুললিত কণ্ঠে পাঠ করার তালিমটাও দিতে হবে।

ঃ সে কি! কাকে সে তালিম দিতে হবে? আপনাকে?

ইয়াসমীন আরা হেসে বললো, মন তো চায়, আমি নিজেই সেই তালিমটা নেই। কিন্তু আমার জন্যে সেটা এখন তেমন জরুরী নয়। আমি অন্যজনের জন্য বলছি। আমার খালাতো এক বোন থাকে আমাদের বাড়িতে। ক্লাস ফাইভে পড়ে। মেয়েটাও আগ্রহী আর তার অভিভাবকেরাও চান সে ভাল করে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে শিখুক। জোর তাকিদ তাঁদের। আমি অনেক দিন ধরে এমন লোক খুঁজছি। কিন্তু সুবিধেমতো লোক অদ্যাবধি পাইনি। আজ আপনার তেলাওয়াত শুনেই বুঝতে পেরেছি, আপনিই আমার সেই কাঙ্ক্ষিত জন। আপনাকেই এ কাজে আমার দরকার।

ঃ অর্থাৎ আপনার সেই খালাতো বোনকে কুরআন পাঠ শেখাতে হবে?

ঃ জি-জি। এইটেই আমার সবিনয় অনুরোধ।

ঃ সে কি! আপনি থাকতে আমি কেন? আপনি ইসলামী লাইনে ভারসিটিতে পড়েন। আপনি থাকতে আমি—

প্রবল বাধা দিয়ে ইয়াসমীন আরা বললো, জিনা-জিনা। কিছুটা ইসলামী লাইন হলেও আমি যে বিষয় নিয়ে পড়ি তার সাথে আরবী জানার তেমন সম্পর্ক নেই। আমার বিষয় হলো--ইসলামিক হিস্ট্রি এ্যান্ড কালচার। এতে আরবী জানা লাগে না। তাই কোনমতে কুরআন পড়তে পারি বটে, কিন্তু আরবী ভাষার উপর আমার মোটেও দখল নেই।

ফারুক মাহমুদ স্মিতহাস্যে বললো, আমারই যে সে দখল আছে, তা কে বললো আপনাকে?

www.boighar.com

ঃ আপনার তেলাওয়াত শুনেই সেটা আমি বুঝেছি। আরবী ভাষার উপর বেশ খানিকটা দখল না থাকলে, এমন ঝরঝরে-ভাবে আর সুলেলিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ সম্ভব হবে কি করে? গোটা ভাষার উপর না হলেও কুরআন শরীফ পাঠের উপর তার বিশেষ দক্ষতা থাকতেই হবে।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আমাকে আর না ভাঁড়িয়ে, কাইন্ডলী বলুন, দেবেন আমাকে ঘন্টা খানেক করে সময়?

ফারুক মাহমুদ আমতা আমতা করে বললো, তা কথা হলো, আমার পক্ষে এটা একটু কষ্টকর ব্যাপারই হয়। প্রতিদিন এ কাজ করা—

ঃ প্রতিদিন না পারেন, দিন তিনেক। সপ্তহে তিন দিন আসবেন।

ঃ তবুও তো একটা ধরাবাঁধা সময় মেনে চলতে হবে আমাকে। কেমন একটা বাধ্যবাধকতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় আমার জন্যে। ফ্রি জীবন যাপনে খুবই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি ইদানিং!

ঃ ধরাবাঁধা সময়েরও দরকার নেই। যেদিন আপনি যখন সময় পান তখনই চলে আসবেন। এককাপ চা খাওয়ার জন্য বাইরে আসছেন—এইভাবে আসবেন। স্টল রেস্টুরেন্টেও তো মানুষ চা খেতে যায়?

ইয়াসমীন আরা নাছোড় বান্দা হওয়ায় ফারুক মাহমুদকে শেষ অবধি রাজী হতেই হলো। বললো, হ্যাঁ, এরকম ঢিলে-ঢালা নিয়ম হলে অবশ্য না পারার কোন কারণ নেই। তাহলে আমি পারবো।

অত্যন্ত খুশি হলো ইয়াসমীন আরা। বললো, আলহাম্‌দুলিল্লাহ-আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, একদম ঢিলে ঢালা। তাহলে আগামীকাল থেকেই আপনি আসছেন— এমনটি কি আশা করতে পারি?

ঃ তা না হয় এলাম! কিন্তু ঐ মেয়টাকে আমি পড়াবো কোথায়? এই বৈঠক খানায়?

ঃ কোন অসুবিধে আছে?

ঃ আছেই তো। কে কখন হুট্ করে এসে হাজির হয় তার ঠিক কি? পদে পদে ডিস্টার্ব ঘটলে তো পড়ানো যাবে না।

ঃ ডিস্টার্ব?

ঃ জি। আপনাদের বাড়িতে নাকি সব সময় বাজার লেগে থাকে। শুনি, হরেক রকম মানুষের এখানে সমাগম ঘটে হরদম।

ঃ কথাটা আপনার খানিকটা ঠিক আবার খানিকটা ঠিক নয়। যারা আসে তারা ঐ পাশের ক্লাবঘরে আসে। বৈঠকখানার উপর চাপ তেমন পড়ে না।

ঃ পড়ে না?

ঃ মাঝে মাঝে পড়ে, সব সময় পড়ে না।

ঃ তবে?

ঃ তাতে কি? বৈঠকখানা ফাঁকা থাকবে না যেদিন সেদিন আমার এই পড়ার ঘরটা ছেড়ে দেবো আপনাদের জন্যে। আনজুম্‌কে মানে, আমার ঐ খালাতো বোন রমিসা আনজুম্‌কে সেদিন আমার পড়ার ঘরে পড়াবেন।

ঃ হ্যাঁ, এ রকম হলে চলতে পারে। কোন অন্দর মহলে গিয়ে আমার পড়ানো সম্ভব নয়। বড় অস্বস্তি লাগবে।

ঃ না-না, তা যেতে হবে না।

ঃ বেশ। তা কথা কিন্তু আমার ঐ টাই, সপ্তাহে তিনদিন আর সময়টা আমার সুবিধে মতো।

ইয়াসমীন আরা ফের হেসে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই সই। এবার বলুন, মাসে কত করে দিতে হবে? মানে, আপনার সম্মানীটা।

ঃ হ্যাঁ সময়ের তো একটা দাম আছে সবারই।

ঃ তা সে কথা এখনই কেন? আগে কাজ দেখুন। দু'চারদিন তালিম দেই। তারপর কাজ দেখে মজুরী নির্ধারণ করবেন।

ইয়াসমীন আরা সরবে বললো, দেখতে হবে না—দেখতে হবে না। কাজ আমাকে দেখতে হবে না। ওটা আগেই আমি বুঝে নিয়েছি।

ঃ তবু ঐ সম্মানীর কথা এখন নয়, পরে। এখনই এটা আমি পছন্দ করিনে।

ফারুক মাহমুদের শক্ত মনোভাব দেখে ইয়াসমীন আরা হাল ছেড়ে দিলো। বললো, ঠিক আছে, আপনি যেভাবে বলবেন সেইভাবেই হবে। আসল কথা, আসাটা আপনার চাই-ই।

ঃ জি-জি, ইনশাআল্লাহ আসবো। এখন উঠি—

ফারুক মাহমুদ নড়েচড়ে উঠলো। ইয়াসমীন আরা বাধা দিয়ে বললো, আরে-আরে উঠবেন কি! পয়লাদিনে একটু চা না খাইয়ে আপনাকে উঠতে দিচ্ছে কে? আসুন-আসুন, আমার পড়ার ঘরে এসে বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা দেখি।

ঃ কেন-কেন, আপনার পড়ার ঘরে কেন? এখানে কি কোন অসুবিধে আছে?

ঃ জি, এখন একটু আছে। এখানে এই বৈঠক খানায় কিছু লোক আসবেন এখনই। আব্বা বললেন, ক'জন উকিল-মোক্তার আসবেন।

ঃ উকিল-মোক্তার?

ঃ হ্যাঁ। আব্বার ঐ কেস্ নিয়ে মানে এই সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে নাকি কিছু কথাবার্তা আছে। আসতে তাঁদের হয়তো একটু দেরী হতেও পারে। কিন্তু হুট্ করে এখনই যদি এসে পড়েন, তাহলে এই ঝামেলার চেয়ে আপনি এসে আমার পড়ার ঘরে বসুন, নিরিবিলিতে চা-নাস্তা খাওয়ার সাথে গল্প গুজব করা যাবে,।

ফারুক মাহমুদ আনমনে বললো, গল্পগুজব?

ইয়াসমীন আরা স্মিতহাস্যে বললো, হ্যাঁ গল্পগুজব। এতক্ষণ তো কাজের কথা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইলাম। হালকা কিছু আলাপ সালাপ করে মনটাকে তাজা করে নেয়া আর কি।

ঈষৎ আড় চোখে চেয়ে ফারুক মাহমুদ বললো, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?

ঃ বাড়াবাড়ি! কেন?

ঃ মাত্র একদিনের আলাপেই এত খাতির করাটা কি কিছুটা বেমানান নয়?

ইয়াসমীন আরা বিস্মিত কণ্ঠে বললো, একদিনের আলাপ? বলেন কি? আপনি কি আমার আদৌ আপরিচিত জন?

ঃ খুব পরিচিত জনও তো নই?

ঃ কে বললে নন? আপনি আমার অনেক বেশি পরিচিত জন আর আজীবন স্মরণ রাখার মতো ব্যক্তি।

ঃ তাই?

ঃ অবশ্যই। আপনি আমার জান, মান-সম্মান-সবই বাঁচিয়েছেন। আপনি কি আমার অপরিচিত জন হতে পারেন, না আপনার কথা কখনো ভুলতে পারি আমি?

ঃ আচ্ছা!

ঃ সময় সুযোগের অভাবে আপনাকে আমি দাওয়াত করে আনতে পারিনি আগে। নইলে যে উপকার করেছেন আপনি আমার, তাতে অনেক আগেই আপনাকে এনে অনুষ্ঠান করে খাওয়ানো উচিত ছিল আমার। আসুন-আসুন উঠুন—

ফারুক মাহমুদ তবু একটু গড়িমসি করে বললো, এত তাড়া কেন? নাকি ঐ উকিল মোক্তার সাহেবেরা এসে যাচ্ছেন এখনই?

ঃ নিশ্চয়তা কি? এসে যেতেও তো পারেন?

ঃ আচ্ছা, আপনি সেদিন বলেছিলেন—এই বাড়ি ঘরের, মানে এই বিষয়বিত্তের মামলাটা মিটে গেছে। তাহলে কি এখনও মেটেনি।

ঃ আমি কি ওসব জানি, না আমাকে ওসব সঠিক কিছু জানান আমার আব্বা? সব নিজেই করেন, নিজেই জানেন। আপনি আসুন-ওসব কথায় আপনার কি কাজ?

অগত্যা নতমস্তকে ইয়াসমীনকে অনুসরণ করলো ফারুক মাহমুদ।

৪

সেই থেকে প্রতিদিন ইয়াসমীন আরার বোনকে কুরআন পাঠের তালিম দিতে আসতে লাগলো ফারুক মাহমুদ। সপ্তাহে তিন দিনের কথা বললেও, মেয়েটার আগ্রহ দেখে ফারুক মাহমুদ প্রতিদিনই আসতে লাগলো। সময়টাও প্রায় ধরাবাঁধা হয়ে গেল। বাদ আসর। এই সময় কদর আলীর কাজ থাকে না তেমন। তাই বেচাকেনাটা কদর আলীই চালায় আর আনজুম্‌কে পড়াতে আসে ফারুক মাহমুদ।

পড়ানোর স্থানটাও মূলত ঐ বৈঠককানা। আধুনিক অর্থে ড্রয়ীংরুম। এর সাথে মাঝে মধ্যে ইয়াসমীন আরার পড়ার ঘর। উটকো লোকের ভিড় না থাকলে ড্রয়ীংরুমটাও বেশ নিরিবিলি। বাড়িতে লোকজন খুব কম। এদের কেউ বৈঠককানায় আসে না। বাইরের লোকের ভিড় জমে বাদ মাগরিব। এরা অধিকাংশই উট্‌কো লোক। চেনা অচেনা হরেক রকম নরনারী। বলাবাহুল্য, বেশির ভাগই কপোত-কপোতী। ক্লাবে অর্থাৎ জলসাঘরে আসে এরা। জমিয়ে তোলে ক্লাব নামের ঐ জলসাঘর। জলসাটা জমে ওঠার আগে তথা বন্ধু-বান্ধব সঙ্গিনীরা সবাই এসে হাজির হওয়ার আগে অপেক্ষারত নর নারীর ধাক্কা এসে মাঝে মাঝে বৈঠকখানাতেও লাগে। তবে সাঁঝের আগে নয়।

আজ সাঁজের আগেই সে ধাক্কা এসে বৈঠকখানায় তথা ড্রয়ীংরুমে লাগলো। সামনা সামনি বসে ফারুক মাহমুদ আনজুম্‌কে তালিম দিচ্ছিল তেলাওয়াতের। হঠাৎ করেই চারদিক তোলপাড় করে তুলে ঘরে ঢুকলো একপাল নরনারী। অর্থাৎ পাঁচ পাঁচটি যুবক যুবতী। যুবতীদের দুইজনই ফারুক মাহমুদের চেনা। একজন বন্দনাহক, অপরজন মাধুরী মীর্যা। পুরুষদেরও একজনকে চিনতে পারলো ফারুক মাহমুদ। সে লোক আবুল কাশেম কানাই। কলরব করে ড্রয়ীংরুমে ঢুকেই এবং ভাল করে না দেখেই তাদের একজন ফারুক মাহমুদকে বললো, আরে এই-এই, গৌতম এসেছে কিনা উপরে গিয়ে দ্যাখো তো? এসে থাকলে এখনই তাকে ডেকে দাও, কুইক্‌—।

ফারুক মাহমুদ বিব্রতকণ্ঠে বললো, ডেকে দেবো? পুরুষ দুইজনের অপরজন কণ্ঠে জোর দিয়ে বললো, হ্যাঁ-দেবে। শুনতে পাওনা কানে?

বলেই সে এতক্ষণে খেয়াল করলো ফারুক মাহমুদকে। মাথায় তার টুপী দেখে সে বিস্মিতকণ্ঠে সঙ্গীদের বললো, সে কি রে! এযে দেখছি টুপী! সামনে আরবী উর্দুর বই। এতো জাজ্জল্যমান এক মোল্লা-মুন্‌শী!

সবাই এবার ভাল করে লক্ষ্য করলো ফারুক মাহমুদকে। লক্ষ্য করেই সবাই আওয়ারা বনে গেল। কানাই মিয়া বলে উঠলো—রাজাকার-রাজাকার।

বন্দনা আর মাধুরী এক সাথে বলে উঠলো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো! ঘোর এক মৌলবাদী। সুন্দর চেহারার এক অনগ্রসর অর্বাচীন।

কানাই ফের খেদ করে বললো, একি অনাসৃষ্টি কান্ড! এযে ঠাকুরঘরে মুসলমান!

অপর যুবকটি বললো, চেনো নাকি? চেনো তোমরা একে?

কানাই মিয়া আর্তকণ্ঠে বললো, চিনিরে নানক, চিনি-চিনি। একদিন মুখোমুখি বাহাস্। ঘোর ভারতবিদ্বেষী। আল্ কায়দা বাহিনীর সদস্য এ না হয়েই যায় না।

বন্দানা হক বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই হবে। সেদিন তার কথাবর্তা শুনে সেই রকমই আমাদের মনে হয়েছিল।

তা ছাড়া এ লোক তো দোকানদার। সামনের ঐ দোকানের দোকানদার! এ লোক এখানে কেন!

নানক নামের ঐ যুবকটি বললো, তাই নাকি? একজন দোকানদার? তার উপর আবার মৌলবাদী? ও মাইগড্! আস্তে আস্তে এবাড়িতেও ঢুকে পড়লো এরা?

মাধুরী মীর্যা বললো, সর্বনাশ! তাহলে তো ইয়াসমীনকে আর মানুষ বানানোই যাবে না! এমনিতেই সে গুহার যুগের মানুষ। এ যুগের মানুষ সব সময় গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায়। এর সাথে আবার এই সব অনগ্রসর কূপমণ্ডুকদের সংস্পর্শে এলে তো আর মানুষ করাই যাবে না তাকে।

নানক এবার ফারুক মাহমুদকে প্রশ্ন করলো—এই লোক, তুমি এখানে কেন?

এদের এই নির্লজ্জ আলোচনায় ফারুক মাহমুদ ইতিমধ্যেই খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। জবাবে সে শক্ত কণ্ঠে বললো, আমারও তো সেই কথা, তুমি এখানে কেন?

লাফিয়ে উঠলো নানক। বললো, খরবদার। আমাকে চেনো? আমার নাম নাজমুল আলম নানক। আমার নামে তল্লাটের লোক থর থর করে কাঁপে। সেই আমাকে "তুমি" বলার সাহস করো তুমি? চোখ গরম করো আমার উপর? আমি এ এলাকার বাঘ, তা জানো?

ফারুক মাহমুদ একই কণ্ঠে বললো-তা জানার আমার দরকার নেই। তুমি বাঘই হও আর বিড়ালই হও, ও নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। একজন অপরিচিত মানুষকে তুমি সরাসরি "তুমি" বলবে আর তোমাকে আমি "আপনি-আপনি" করবো? কভ্‌ভি নেহী।

ফারুক মাহমুদের দৃঢ়তার সামনে নানক কিঞ্চিৎ দমে গেল। বললো, বটে? নানককে পরোয়া করো না, তুমি আবার কোন্ মাত্‌বর? কে তুমি? কি কাজ তোমার এখানে?

হতভম্ব হয়ে এতক্ষণ চেয়েছিল রমিসা আনজুম্। নানকের এ প্রশ্নের জবাবে সে বললো, বারে! ইনি আমার হুজুর। ইনাকে চেনেন না? ইনি আমার উস্তাদ। আমাকে কুরআন পড়া শেখাচ্ছেন।

একথায় পুনরায় অস্থির হলো সকলে। নাজমুল আলম নানক বিপুল বিস্ময়ে বললো, এ্যাঁ! কি বললে? কুরআন পড়া?

আবুল কাশেম কানাই বললো, খাইচেরে! এ বাড়িটা তো শেষ পর্যন্ত মক্তব-মাদ্রাসা বনে যেতে লাগলো! মৌলবাদীদের আস্তানা হয়ে উঠতে লাগলো দিন-দিন।

মাধুরী মীর্যা সক্রোধে বললো, সব দোষ ঐ ইয়াসমীনের। ঐ ইয়াসমীনটাই নষ্ট করছে এ বাড়ি।

বন্দনা হক বললো, ঠিক-ঠিক। এ সবের মূলে একমাত্র ঐ ইয়াসমীন। তলবদার চাচাকে এত করে বলছি—ইয়াসমীনকে শাসন করুন। ওর ঐ বোরকা-নেকাব টেনে খুলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। ক্রমেই কিন্তু অমানুষ হয়ে যাচ্ছে ও। ওর জন্যে শেষ পর্যন্ত মানুষের সমাজে কিন্তু মুখ দেখাতে পারবেন না আপনারা। কিন্তু তলবদার চাচা আমার কথাতে কানই দিচ্ছেন না তেমন।

কানাই বললো, তলবদারকে দিয়ে হবে না। ইয়াসমীনকে পথে আনতে পারলে একমাত্র ঐ গৌতমই পারবে। গৌতমের উপর এ ব্যাপারে চাপ ফেলতে হবে।

অন্যেরা সমর্থন দিয়ে বললো, রাইট-রাইট। গৌতম কেন এ ব্যাপারে নীরব আছে আজও। চলো-চলো, গৌতমের কাছে চলো। আজ আর অন্য কথা নয়, এই বিষয়টারই একটা হ্যাস্তন্যাস্ত করতে হবে আজ। নইলে কিন্তু পস্তাতে হবে আমাদের সবাইকে। চলো-চলো—

হৈচৈ করতে করতে আগন্তুকেরা সকলেই দুমদাম পা ফেলে ভেতরে চলে গেল। এদের আদব আক্কেল আর মানসিকতা দেখে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো ফারুক মাহমুদ। সেদিন আর পড়াতে মন বসাতে পারলো না।

আরো কয়েকদিন পরের কথা। বৈঠকখানায় আগে থেকেই লোক সমাগম থাকায় সেদিন ইয়াসমীন আরা ফারুক মাহমুদ ও আন্‌জুম্‌কে নিয়ে গিয়ে তার পড়ার ঘরে বসিয়ে দিয়েছিল। সেখানে বসে ফারুক মাহমুদ ছবক দিচ্ছিল আনজুম্‌কে। কিছুক্ষণ ছবক নিতে নিতে আসি বলে উঠে গেল আনজুম। সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে বাথরুমে ঢুকলো। একা একা চুপচাপ বসে রইলো ফারুক মাহমুদ।

এই সময় সরবে কথা বলতে বলতে বৈঠকখানায় এসে বসলো আবদুল গণি গৌতম আর নাজমুল আলম নানক। নানক আগে থেকেই উত্তেজিত ছিল। সে সরোষে বললো, না-না গৌতম ভাই, তোমরা যে যা-ই বলো, তোমাদের কোন কথাই কিন্তু ডোলডালির মধ্যে ঢুকছে না। সেরেফ একটা মেয়ে তোমাদের যে ভাবে নাচাচ্ছে তোমরা সবাই সেই ভাবেই নাচছো। মেয়েটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছো না। এটা কি কোন কথা হলো?

আবদুল গণি গৌতম অসহায় কণ্ঠে বললো, চেষ্টা তো করছি। কিন্তু শুনেনা যে।

ঃ শুনে না কেমন? তোমার ভাগ্নীকে তুমি যদি শক্তভাবে শাসন করো, তাহলে কি সে তোমার কথার বাইরে যেতে পারে?

ঃ পারেরে নানক, পারে-পারে। ইয়াসমীন তো আমার নিজের ভাগ্নী নয়। আমার বোনের সতীনের মেয়ে। বোন তো বেঁচে নেই, ওদেরই পোয়াবারো। এ অবস্থায় সে যদি আমার কথা না মানে, তাহলে আমি আর কি করতে পারি, বলো?

বিস্মিতনেত্রে এক পলক চেয়ে রইলো নানক। তারপরে বললো, বটে! তাহলে তার বাপ? তোমার কথা না মানলেও, তার বাপের কথা মানতে তো সে বাধ্য। নাকি বাপটাও নিজের বাপ নয়?

ক্লীষ্ট হাসি হেসে গৌতম মিয়া বললো, না-না, তা হবে কেন?

ঃ তাহলে তার সেই বাপটাই বা নীরব আছেন কেন? তাঁর মেয়েটা যে দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে, অনগ্রসর আনকালচার্ডদের দলে ঢুকে মেয়েটা যে একটা বন মানুষে পরিণত হচ্ছে, বাপটা কি তা দেখেও দেখছেন না? এই প্রগতির যুগে ঐ সব সেকেলে আর ছাগল মার্কা চাল-চলন কি আদৌ চলে? বাপ কেন কিছুই বলছেন না মেয়েকে?

ঃ বলছেন না, সেটা ঠিক নয়। কিন্তু মেয়ে তাঁর ঐ আব্রু করে চলাটা কিছুতেই ছাড়বে না বলে পণ করে বসায়, বাপটা আর বেশি কিছু বলতে চাইছেন না। একটা মাত্র মেয়ে তো?

নানক নাখোশ কণ্ঠে বললো, বাহ! একটা মাত্র মেয়ে বলেই যা খুশি তাই করবে? এই যে মেয়েটা তাঁর এক মৌলবাদী রাজাকারকে ডেকে এনে বাড়িতে ঢুকিয়েছে আর বাড়িটাকে একটা মৌলবাদীর আখড়া বানিয়ে ফেলছে, এটাকেও কি তিনি একটা মাত্র মেয়ে বলে দেখেও দেখছেন না? এক্ষেত্রে কি তাঁর করার কিছু নেই?

ঃ আছে। কিন্তু থাকলেও তিনি পারছেন না।

ঃ পারছেন না কি রকম? বাপ হয়ে মেয়েকে বাধ্য করতে পারছেন না? দুই গালে চার চড় মারলে তামাম ভূত ছুটে যায়—আর পারছেন না মানে কি?

ঃ আরে ভাই, ওটাই তো করতে তিনি পারছেন না।

ঃ কোন্‌টা? ঐ চড় মারতে?

ঃ হ্যাঁ, চড় মারতে। মস্তবড় অসুবিধে আছে। এখন মেয়ের গায়ে হাত তুললে তাঁকে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই বাড়ি ঘরে ঢুকতে আর কখনোই পারবেন না। আমাদেরও এর ত্রিসীমানা ছাড়তে হবে।

দুচোখ কপালে তুলে নানক মিয়া বললো, কেন-কেন, তা হবে কেন?

ঃ সে সব গোপন কথা। সবাইকে বলা যাবে না।

ঃ যাবে না? আমাকেও না?

ঃ না-মানে, এ কথা এখন জানাজানি হয়ে গেলে ভীষণ অসুবিধে হয়ে যাবে। এ কথা এখন বাইরে যাওয়া চলবে না।

ঃ বাইরে যাবে কি করে? কথা তো তোমার আমার মধ্যে। আমি তোমার পরীক্ষিত লোক। গোপন কথা আমি কি কখনো ফাঁস করার মানুষ?

ঃ না, তা ঠিক নয়। তবে—

ঃ আবার তবে কেন? অসুবিধাটা কি আমি তো শুধু সেইটুকুই জানতে চাচ্ছি। এ নিয়ে বাইরে কথা বলতে যাচ্ছিনে।

একটু থেমে গৌতম মিয়া বললো, এই সব বাড়ি-ঘর আর মিল কারখানা সব ঐ মেয়ে ইয়াস্‌মীনের নামে।

এর কোন কিছুই তলবদার সাহেবের নয়।

ঃ সে কি! কেন নয়?

ঃ সব কিছুরই দলীল যে তাঁর মেয়ে ঐ ইয়াসমীনের নামে। আইনগত ভাবে তলবদার সাহেবের এ সম্পত্তিতে কোন অধিকারই নেই।

ঃ বলো কি! তাহলে দলীলটা মেয়ের নামে হলো কেন?

ঃ কেনার সময় দলিলটা মেয়ের নামে করা হয়েছে, তাই।

নানক মিয়া ফের বিস্মিত কণ্ঠে বললো, তাজ্জব! এতবড় বেয়াকুবী তলবদার সাহেবের মতো ঝানুলোক করলেন কি করে? নিজের নামে না করে—

ঃ নিজের নামে করার কোন উপায় ছিল না যে!

ঃ ছিল না?

ঃ না। এই সম্পত্তিটা তো আগে একজন হিন্দুর, মানে একজন মাড়োয়ারীর ছিল, তা তো জানো। এই সম্পত্তির মালিক ঐ মাড়োয়ারী যখন এই সম্পত্তি, অর্থাৎ এই বাড়িঘর-মিল কারখানা সব বেচে এদেশ থেকে চলে যায়, তখন তলবদার সাহেব জেলে ছিলেন। ঐ মাড়োয়ারীই তাকে জেলে পাঠিয়েছিল। তিন বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয় তলবদারের।

ঃ সে কি!

ঃ তলবদার সাহেব ম্যানেজার ছিলেন ঐ মাড়োয়ারীর মিল কারখানার। মিলকারখানা নিজের নামে করে নেয়ার ষড়যন্ত্রের দরুণ জেল হয় তলবদারের।

ঃ তারপর?

ঃ জেল খেটে বেরিয়ে আসার দুই বছর আগেই সব কিছু বেচে দিয়ে এদেশ থেকে চলে যায় ঐ মাড়োয়ারী। দূরবর্তী এক মফস্বল শহরের লোক সব কিছু কিনে নেয়। জেলে আটক তলবদার সাহেব এসব কিছুই জানতেন না। কিন্তু জানো তো, বড় ধুরন্ধর লোক আমার দুলাভাই এই তলবদার সাহেব। তার গ্রাস অন্যে খাবে এটা কি কোন কথা? তিনিও ছেড়ে দেয়ার পাত্র নন। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই জাল দলীল তৈয়ার করেন তিনি। তাঁর জেলে থাকার কালে, অর্থাৎ তাঁর জেল থেকে বেরিয়ে আসার দুই বছর আগে সম্পত্তি বিক্রি হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী মাড়োয়ারীর সব কিছু মেয়ে ইয়াসমীনের নামে কিনে নিয়েছেন এই মর্মে জাল দলীল তৈয়ার করেন। অতঃপর

গুন্ডাপান্ডা লাগিয়ে আসল ক্রেতার কেয়ার টেকারকে বাড়িঘর আর মিলকারখানা থেকে উচ্ছেদ করে দখল নেন সব কিছুর। সেই থেকেই তলবদার সাহেব সপরিবার এই বাড়িতে আছেন আর আমরাও তাঁর পেছনে পেছনে এসে এখানে আড্ডা গেড়ে ফেলেছি।

www.boighar.com

ক্ষীণ একটা হাসির রেখা গৌতমের মুখে ঝিলিক দিয়ে গেল। নানক মিয়া সবিস্ময়ে বললো, সে কি, তাহলে ঐ দলিল কি আজীবন ঐ মেয়ের নামেই থাকবে?

গৌতম সরবে বললো, আরে না-না। এই সম্পত্তি নিয়ে মামালা চলছে আজও। যে আসল ক্রেতা সে মারা গিয়ে থাকলেও তার পক্ষের লোকেরা আর তার পক্ষের উকিল-মোক্তারেরা এ নিয়ে মামলা চালাচ্ছে এখনও। তবে তাদের কোন আশা নেই। মামলায় হার তাদের নিশ্চিত হয়ে গেছে। মামলাটা মিটে গেলেই সব কিছুর দলীল আবার তলবদার সাহেবের নিজের নামে হয়ে যাবে।

ঃ কি করে? মেয়ে যদি বাপের নামে দলীল করে না দেয়? সই না দেয় দলীলে?

ঃ কুচ্ পরোয়া নেহি। তলবদার সাহেব কি কোন পরোয়া করেন মেয়ের সই এর! জাল দলীল জাল হবে আর একবার। তখন ঐ দলীলে আর মেয়ের নাম থাকবে না। থাকবে তলবদার সাহেবের নিজের নাম।

ঃ সাব্বাস্!

ঃ যতদিন তা না হয়, অর্থাৎ দলীলটা তলবদার সাহেবের নিজের নামে না হয়, ততদিন আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। মেয়েটাকে চটানো যাবে না।

ঃ যাবে না?

ঃ না। একদম না। বরং সে যা করে আর যেভাবে চলতে চায়-তা সবই আমাদের বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে। কোন রকম প্রতিবাদ করতে গেলেই বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। আমাদের সকলেরই বিপদ।

ঃ বিপদ? ঐ একক এক মেয়েছেলে ইয়াসমীন বিপদ ঘটাবে আমাদের? কি যে বলো? কত হাতী ঘোড়া গেল তল আর চুঁহা বলে কত জল!

উপেক্ষার হাসি হাসতে লাগলো নানক। গৌতম মিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বললো, না না, হাসির কথা নয়। আপাতত একা আর সহায়হীন মনে হলেও, ইয়াসমীন কিন্তু আদৌ একা আর অসহায় নয়।

ঃ কেন নয়? বাড়িতে ওর মা রয়েছে বলে?

ঃ আরে না না, মা নয়। ইয়াসমীনের মামারা আর খালুরা আছে হাতের কাছেই। ইসলামী লাইনের খুব প্রভাবশালী লোক তারা। ইয়াসমীন যদি তাদের শরণাপন্ন হয়, তাহলে আর কোন জারিজুরি খাটবে না। পাত্তাড়ী গুটাতে হবে সবাইকে। ওর বাপকেও–আমাদেরকেও।

ঃ সে কি! এমন অবস্থা?

ঃ হ্যাঁ অবস্থাটা এমনই। এইসব বাড়িঘর আর মিল কারখানার মালিকানা সম্বন্ধে ইয়াসমীনকে তেমন কিছু বুঝতে দেয়া হয়নি বলেই সে চুপচাপ আছে। তার নামে কেনা হয়েছে–উড়ো উড়ো এইটুকুই সে বুঝেছে। দলীল ফলিল তার নামে হলেও সব কিছুর মালিক যে আসলেই তার বাপ, এখনও সে এইটেই বুঝে আছে। কাজেই তার বাপ সত্যি সত্যিই মালিক হওয়ার আগে ইয়াসমীনকে ঘাঁটানো চলবে না। তাতে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে।

ঃ গৌতম ভাই!

ঃ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসবে। আর তাতে তার বাপের যা হয় হোক, আমরা এই যে এতদিন তার বাপের পেছনে ঘুরছি এ সবই আমাদের পন্ডশ্রম হবে। শুধু শুধুই তো তার পেছনে ঘুরছিনে আমরা! আমাদেরও একটা স্থির লক্ষ্য আছে এর পেছনে, বুঝেছো?

ঃ গৌতম ভাই!

www.boighar.com

ঃ আমাদের চোখের সামনে এমন মিথ্যাচার আর জালিয়াতি করে তলবদার এই বিশাল সম্পদের মালিক হবে আর আমরা বসে বসে আঙ্গুল চুষবো? ওটি হবে না। বেশ খানিকটা হাড়-মাংস আমাদের ভাগে না এলে হাটে হাঁড়ি ভেংগে দেবো না?

ইয়াসমীনের পড়ার ঘরের দুয়ারটা ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল আর সেখানে নীরবে বসে থেকে ফারুক মাহমুদ এদের প্রতিটি কথা কান পেতে শুনছিল। এদের আলোচনা এই পর্যন্ত এগুতেই বাথ্‌রুম থেকে বেরিয়ে অজু করে এসে কলরবে ঘরে ঢুকলো আনজুম্। আনজুমের কলরবে তৎক্ষণাৎ সতর্ক হলো বৈঠকখানায় উপবিষ্ট গৌতমেরা। সচকিত হয়ে তারা বন্ধ করলো এসব নিয়ে আলোচনা। অত:পর ফারুক মাহমুদকেও বাধ্য হয়ে আনজুমের পড়ার দিকে নজর দিতে হলো।

আন্‌জুম্‌কে পড়ানোর পর মাগরিবের নামাজ বাইরে আদায় করে সেদিন বেশ খানিকটা দেরীতে দোকানে ফিরলো ফারুক মাহমুদ। দোকানে এসে দেখলো, তার অপেক্ষায় বসে আছে তার বন্ধু মনোয়ার হোসেন। মনোয়ারকে দেখেই উল্লসিত কণ্ঠে সালাম দিয়ে ফারুক মাহমুদ বললো, আরে ইয়ার তুই। তুই কখন এলি?

সালামের জবাব দিয়ে মনোয়ার হোসেন নির্লিপ্তকণ্ঠে বললো, অনেকক্ষণ আগে। আসরের নামাজ আদায় করার কিছুক্ষণ পরেই।

ঃ সে কি! সেই থেকে বসে আছিস্ এতক্ষণ?

ঃ কি করবো? আমি কি জানি যে এতক্ষণ বসে থাকতে হবে? বাদ আসর গিয়ে খানিক পরেই ফিরে আসবি তুই—এই ছিল আমার ধারণা। বড়জোর একঘন্টা সোয়া ঘন্টা পরেই। এক সাথে দুইজন মাগরিবের নামাজ আদায় করবো—এই আশায় বসে রইলাম। কিন্তু কি তাজ্জব! এতটাই যে তলিয়ে গেছিস্ তুই, তা অনুমান করতে পারিনি!

বুঝতে না পেরে ফারুক মাহমুদ বললো, তলিয়ে গেছি মানে?

ঃ মানে, তুই ডুবেছিস্। যেদিন শুনলাম, এক নওজোয়ানীর অনুরোধে ও বাড়িতে ছাত্রী পড়ানোর কাজ নিয়েছিস তুই, সেদিনই বুঝেছি—এমনটিই হবে।

ঃ এমনটিই হবে কেমন? এমনটি কেমনটি?

ঃ একদম খাড়াতলানো তলিয়ে যাবি তুই, এমনটি বুঝতে না পারলেও, তলিয়ে যে যাবি তুই-এটা বুঝতে পেরেছি। আগে ভাবতাম, পেয়ার-মুহব্বত ওসব কিছু তোর মধ্যে নেই। কিন্তু ওরে-বাব্বা! এখন দেখছি, সব আমার ভুল। তুই মজনুর চেয়েও শতগুণে অধিক পেয়ার-পাগলা আদমী।

ফারুক মাহমুদের বিস্ময়ের ঘোর কাটলো না। ফের প্রশ্ন করলো—পেয়ার-পাগ্‌লা আদমী মানে?

মনোয়ার বললো, মানে, প্রেম-পাগল মানুষ। রমনীর প্রেমে বুঁদ হয়ে থাকা লোক। কম্মকাবার! প্রেমের একটু গন্ধ পেতে না পেতেই এতটা?

থপ্ করে পাশের চেয়ারে বসে পড়লো ফারুক মাহমুদ। অসহায় কণ্ঠে বললো, নাঃ! মাথায় আমার কিছুই ঢুকছে না। হঠাৎ করে তোর কি হয়েছে বল্‌তো? এমন আবোল তাবোল বকছিস্ কেন?

ঃ আবোল তাবোল?

ঃ নয় কি? আমি প্রেম-পাগল লোক, রমনীর প্রেমে বুঁদ হয়ে আমি—এসব কি বলছিস্ পাগলের মতো? আমি প্রেমে পড়লাম কোথায় আর কার সাথে?

ঃ এরপরেও আরো খোলাসা করে বলতে হবে? তুই প্রেমে পড়েছিস ঐ বাড়িতে আর যে তোকে ছাত্রী পড়াতে ডেকে নিয়ে গেছে সেই নওজোয়ানীর সাথে।

ঃ ব্যস্। খোয়াব দেখতে শুরু করেছিস্?

ঃ খোয়াব দেখবো কেন? যা বাস্তব তাই-বলছি।

ঃ বাস্তব?

ঃ অফ্‌কোর্স। কদর আলীর মুখে শুনেছি, মেয়েটাও নাকি খুবই সুন্দরী। এখন নাকি মাঝে মাঝেই এই দোকানে আসে।

ফারুক মাহমুদ চাপ দিয়ে বললো, এলো আর অমনি আমি প্রেমে পড়ে গেলাম—তাই না?

মনোয়ার হোসেন বললো, তাই যদি না পড়বি, ঐ নওজোয়ানী বললো আর অমনি তুই ছাত্রী পড়াতে রাজী হলি কেন? ঐ সুন্দর মুখ দেখে নয় কি?

ঃ মনোয়ার!

ঃ আমার বাড়িতে যাওয়ার জন্য একদিনও তুই সময় করতে পারলিনে আর এখন তুই ঐ বাড়িতে প্রতিদিনই ছাত্রী পড়াতে যাস্ কিসের টানে?

ঃ টানে নয়, অনুরোধে। অনুরোধটা ফেলতে পারিনি বলেই যাই।

ঃ ফেলতে না পারার কারণেই এইভাবে প্রতিদিন যাস্? শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা, না? কোন টান না থাকলে একদিনের ঐ অনুরোধ কি এতটাই টানতে পারে কাউকে?

এর জবাবে ফারুক মাহমুদ দরাজ কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ আছে, টানতো একটা আছেই। ঐ ছাত্রীটা কুরআন শিক্ষায় এতটাই আগ্রহী যে প্রতিদিন না গিয়ে পারিনে। ঐ ছাত্রীর টানেই যাই। কচি বাচ্চা মেয়ে, মায়া তো একটা পড়ে গেছে জব্বোরই।

মনোয়ারও চড়াকণ্ঠে বললো, ঝুট। তুই যাস ঐ ছাত্রীর অভিভাবিকার টানে। সে কচি বাচ্চা মেয়ে নয়, রীতিমতো নওজোয়ানী আর ভারসিটির ছাত্রী। তার উপর আবার আগেই তুই কব্জা করে ফেলেছিস্ তাকে রাস্তায় কোন এক মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে।

মনোয়ারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকার পর ফারুক মাহমুদ বললো, বটে! এ তথ্যও আবিষ্কার করে ফেলেছিস্ তাহলে?

ঃ জি, ফেলেছি। বাধ্য হয়েই ফেলেছি। দৈনিক এসে একা একা বসে থাকি কিন্তু পাত্তা থাকে না তোর। আমি সারাক্ষণ একা একা করবো কি? ভেরেণ্ডা ভাজবো বসে বসে? তাই কদর আলীকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে নিয়েছি সব।

ঃ অসম্ভব। কদর আলী এসব কিছুই জানে না। খুঁচিয়ে ঘা করে ফেললেও এসব কিছুই তার বলার সাধ্য নেই।

মনোয়ার ফের তেজের সাথে বললো, আলবত আছে। তুই না বললেও আসল জায়গা থেকেই সে সব কিছু জেনেছে। যাকে নিয়ে ঘটনা, সেই ইয়াসমীন বিবিই মাঝে মাঝে এসে মনের আবেগে তাকে শুনিয়ে গেছে সব কথা।

ঃ কি রকম? ইয়াসমীন বিবি শুনিয়ে গেছে তাকে?

ঃ ইয়েস্। কিছুই তুই জানিস নে তাহলে? ওরে দিনকানা, কদর আলীই তো এখন ইয়াসমীন বিবির আবেগজনিত গল্প শোনার এক মাত্র লোক। সওদাপাতি নেয়ার নামে এসে তোর অনুপস্থিতিতে ইয়াসমীন বিবি তার মনের আবেগ কদর আলীর কাছেই উজাড় করে দিয়ে যায়। তোর সাথে কিভাবে তার প্রথম দেখা—সেই গল্পের সাথে তোর বিদ্যাবুদ্ধি, এলেম-আলেম আর চেহারা-চরিত্রের প্রশংসায় বন্যা বইয়ে দিয়ে যায়।

ঃ বটে। কদর আলী এসব তোকে বলেছে?

ঃ জরুর। এ সবের গন্ধ পাওয়ার পর থেকেই তো ছাত্রী পড়িয়ে তুই ফিরে আসার আগেই আমি প্রায়ই তোর দোকানে আসি আর রসিয়ে রসিয়ে এসব গল্প কদর আলীর মুখ থেকে শুনি।

ঃ শুনিস্? তা সেই রসিয়ে রসিয়ে বলার মতো এত কথা কদর আলী পায় কোথায়?

ঃ ঐ যে বললাম, ঐ ইয়াসমীন বিবিই এসে রসিয়ে রসিয়ে এসব কথা শুনায় বলেই পায়। শরমের জন্যে ইয়াসমীন সাহেবা এসব কথা সরাসরি তোকে বলতে পারে না বলেই হয় তো কদর আলীকে শুনিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে যায়।

ফারুক মাহমুদ নিঃশ্বাস ফেলে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, হুঁউ-বুঝেছি। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় মেহনত দেয়ার বদলে কে কোথায় কার মুহব্বতে পড়লো—এই খবরই শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছিস্ এখন তাহলে?

মনোয়ার হোসেন অভিযোগ করে বললো, শুঁকে শুঁকে বেড়াবো কেন? তুই অস্বীকার করতে পারিস্ এমন কোন দুর্বলতাই পয়দা হয়নি তোর মধ্যে?

ঃ এক বিন্দুও না।

ঃ তুই ভাল বাসিস্নে ইয়াসমীন আরা নামের ঐ তরুণীকে?

ঃ না।

ঃ তবে কি ঘৃণা করিস?

ঃ তা করবো কেন? তাঁর মতো একজন গুণবতী ঈমানদার আর পর্দানশীন শরীফ মহিলাকে ঘৃণা করবো কেন বরং সে সব কারণে আমি তাঁকে সম্মানের চোখে দেখি।

ঃ সে কি! সেরেফ সম্মানের চোখে? আর কোন চোখে নয়?

ঃ না। অন্তত না দেখেই তুই তাকে যে চোখে দেখতে শুরু করেছিস, সে চোখে নয়।

ঃ বলিস্ কিরে! তুই তাহলে এতবড়ই একটা খাটাশ্?

ঃ খাটাশ্?

ঃ আলবত্। আস্ত একটা রামছাগল। তার এতটা গুণের কোন দামই নেই তোর কাছে? তাছাড়া খাটাশ-ছাগল না হলে, তোকে যে মানুষ প্রতিদিন এত আদর করে চা-নাস্তা খাওয়ায়, তার প্রতি কোন অনুভূতিই পয়দা হবে না দীলে তোর?

ঃ তুই গিয়ে বুঝি দেখে এসেছিস্? আমাকে আদর করে চা-নাস্তা খাওয়ায়, তা বুঝি প্রতিদিন গিয়ে তুই দেখিস্?

ঃ গিয়ে দেখতে হবে কেন? সব কিছুই কি গিয়ে দেখতে হয়?

ঃ তবে কি খোয়াবে দেখেছিস্? এখবর তুই পেলি কোথায়?

ঃ তোর কদর আলীর কাছেই পেয়েছি। বিকেলে চা নাস্তা দিতে একটু দেরী হলে যে তুই দুনিয়া তোলপাড় করে তুল্তিস্, সেই তুই ও বাড়িতে যাওয়া শুরু করার পর থেকে চা-নাস্তার নামটাও আর মুখে আনিস্নে বাসায়। এরপরও কি বুঝতে কারো বাকী থাকে? কিছুটা হুঁশে কম হলেও কদর আলী তো তোর মতো উদ্বিড়াল নয় যে, চা-নাস্তার যোগানটা তোকে কোন পরীতে দেয়, সে তা বুঝবে না?

ঃ সাব্বাস্! চেষ্টা করলে কদর আলী আর তুই—এই দুইয়ে মিলে মহাকাব্য ও রচনা করতে পারবি দেখছি। এত চোখা কল্পনা শক্তি তোদের?

ঃ কল্পনা! বলিস্ কিরে? এর পরেও কল্পনা বলছিস্?

ঃ অবশ্যই। ছুতো নাতা একটু গন্ধ থেকেই কল্পনার যে স্রোত বইয়ে দিচ্ছিস্ তাতে নির্ঘাত তোরা আরব্য রজনীর চেয়েও একটা বিরাট কিছু রচনা করতে পারবি।

নীরব হলো মনোয়ার। মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে রইলো কিছুক্ষণ। এরপর মাথা তুলে বললো, তাজ্জব। সত্যি করে বল্নারে, আসলেই কি ঐ মহিলার তুই একটুও মুহব্বতে পড়িস্নি?

ঃ জি না, জাররা মাত্র না।

ঃ আর ঐ মহিলাটা? সেও কি তোর প্রেমে একটুও পড়েনি?

ফারুক মাহমুদ বিরক্তির সাথে বললো, আচ্ছা, তুই বুঝতে পারছিস্নে কেন যে একজনের সাথে একজনের সহজ সুন্দর ব্যবহার মানেই প্রেমে পড়া নয়?

ঃ এ্যাঁ?

ঃ তাছাড়া, আমার প্রেমে সে পড়তে যাবেই বা কোন দুঃখে, বল? সে ইউনিভারসিটির ছাত্রী আর আমি একটা ছোট্ট দোকানের খুদে দোকানদার। সামঞ্জস্যের ব্যাপারটাও কি থাকবে না। স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি কি বেচে খেয়েছে মেয়েটা?

ঃ সে কিরে। দোকানদার কোথায়? তুই তো একজন ফাস্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট।

ঃ তোর মুন্ডু। শালা গাঁড়োল কাঁহাকার। আরে বুদ্ধু, আমি যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট-সেটা এখানকার একটা কাকপক্ষীও জানে না, ও জানবে কোত্থেকে?

মনোয়ার হোসেন চিন্তিত কণ্ঠে বললো, এ্যাঁ? হ্যাঁ, তা ঠিক—তা ঠিক।

এই সময় কদর আলী চা নিয়ে হাজির হলো। তা দেখে মনোয়ার ফের বললো, সে কি, আবার চা কেন?

কদর আলী বললো, অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছেন স্যার। গলাটা একটু ভিজিয়ে না নিলে আর কথা বলবেন কি করে? এটা বুঝতে পেরেই তো বানিয়ে আনলাম দুই কাপ। নিন-নিন, ভিজিয়ে নিন।

হাসতে হাসতে চলে গেল কদর আলী। সেই দিকে চেয়ে রইলো মনোয়ার হোসেন। ফারুক মাহমুদ স্মিতহাস্যে বললো, পাগল হলেও রসবোধ আছে ওর। নে-নে, মুখ লাগা চায়ে।

এরপর দুই বন্ধু নীরবে বসে বসে চা পান শেষ করলো। শূন্য কাপ টেবিলে রেখে মনোয়ার হোসেন বললো, ওসব প্রেমালাপ থাক। এবার বলতো, ও বাড়িতে গিয়ে তুই কি নিরাপত্তার অভাব বোধ করিস্?

পাল্টা প্রশ্ন করে ফারুক মাহমুদ বললো, কেন, এ প্রশ্ন করছিস্ কেন?

ঃ করছি মানে, কিছু বাইরের লোক এসে নাকি মাঝে মাঝেই কেচাল করে? তোকে শাসায়ও নাকি কেউ কেউ?

ঃ এটাও কি কদর আলীর কাছেই পেয়েছিস্?

ঃ হ্যাঁ। তবে একথা ঐ মহিলা এসে বলেননি। ওদের চাকর ইরফান মিয়া এসে নাকি বলে গেছে কদর আলীকে। কদরকে বলেছে, তোমার মুনিবকে একটু সাবধান হতে ব'লো। বাইরের যে সব লোক আসে ও বাড়িতে, তারা সবাই গুন্ডাপান্ডা মানুষ। কখন কি করে বসে বলা যায় না।

ফারুক মাহমুদ প্রশ্ন করলো—ইরফান মিয়া এসে বলেছে?

ঃ হ্যাঁ, ইরফান মিয়া। কি? ঘটনা কি? এসব কি ঠিক?

ঃ হ্যাঁ কিছুটা ঠিক। তবে ওরা যতটা না গুন্ডাপান্ডা তার অধিক বেহায়া আর বেয়াদব। ঈমান-আকিদা বর্জিত তথাকথিত প্রগতির পোলা সবাই। চরম ইসলাম বিদ্বেষী আর নাস্তিক গোছের মানুষ। বিশেষভাবে খেয়াল করে দেখলাম, যারা ওখানে আসে সবাই তারা নির্জলা "ভাদা" অর্থাৎ ভারতীয় দালাল। ঐ যে ঐ কানাইয়ের কথা মনে আছে? আবুল কাশেম কানাই? ঐ যে আমার দোকানে ভারতীয় মাল কিনতে এসেছিল সেবার, ঐ কানাই আর ঐ গোত্রের লোক সব।

ঃ হুঁউ।

ঃ গায়ে পড়েই ঝগড়া বাধায় ওরা। মাথায় টুপি দেখলেই মেজাজ ওদের বিগড়ে যায়।

ঃ ভয় পাস্ তুই?

ঃ নাঃ। ভয় পাবো কেন?

ঃ পাবিনে। মনে করিস্নে এই শহরে তুই একা আর অসহায়। আমাদের ইসলাম পন্থী নওজোয়ানরাও কিন্তু সংখ্যায় অনেক। ইসলামের সৈনিক সবাই। তোর কথা তাদের আমি বলেছি আর তাদের অনেকেরই নজর আছে তোর উপর। কেউ বাড়বাড়ি করলে একটু আভাস দিস্, দু'একটাকে শক্ত দাবাড় দিলেই সবগুলো ঠান্ডা মেরে যাবে। আসলে মুখে ওরা যতই বাহদুরী করুক, ভেতরে কিন্তু বেজায় ভীতু ওরা।

ঃ হতেই হবে। ঈমান যাদের থাকে না, তাদের ভেতরে সাহস যোগানোর উৎস আর অবলম্বনও কিছু থাকে না। স্বাভাবিক ভাবেই ভীতু হয় তারা। ঐ বেঈমানী চরিত্রের জন্যে তারা ভয় পায় সব কিছুতেই।

ঃ শুধু তাই নয়, মানে ভীতুই নয়। ঐ যে বললি, বেআদব আর বে আক্কেল? অন্যেরা তাদের কি চোখে দেখে, সে বোধটাও উদয় হয় না তাদের মধ্যে। আসলেই ওরা মানুষ নয়, অবতার। মানুষ না বলে ওদের অবতার বলাই ভাল।

ফারুক মাহমুদ হেসে বললো, সে কিরে! অবতার?

মনোয়ার হোসেন বললো, অল্ মোস্ট। ইসলাম বিদ্বেষী ঐ সব প্রগতির ফেরিওয়ালাদের যতই দেখছি, ততই তাদের মানুষ বলে আর মনে হচ্ছে না আমার। মনে হচ্ছে, আসলেই ওরা অবতার। এই দুনিয়া আর দুনিয়ার মানুষদের বাঁচানোর জন্যেই বুঝি ওদের এ দুনিয়ায় আবির্ভাব। যেমন বুশ্ আর টনী এই ধরনী বাঁচাতে বর্তমানে আবির্ভূত হয়েছে, মনে হচ্ছে—ঐ একই ইরাদা নিয়ে এই

অবতারেরাও এই দুনিয়ায় এসেছে। কার্যত বুশ্ টনীর মতো বাঁচানোর বিপরীতটাই করতে এসেছে ওরা।

ঃ আচ্ছা!

ঃ এমনই এক অবতারের কাহিনী শুনলাম সেদিন। শুনে হাসবো না কাঁদবো, কিছু স্থির করতে পারলাম না। মনে হলো কোন ইতর-ইল্লুতের রুচি আর চরিত্রও বুঝি এতটা নিম্ন মানের নয়। এদের চরিত্রের মান নির্ণয় করে, সাধ্য কার। বুঝলাম, মানুষ তো নয়ই এরা ইতর-ইল্লতও নয়, এরা অবতার।

ফারুক মাহমুদ ফের হেসে বললো, অবতার?

মনোয়ার হোসেন বললো, খাস অবতার। তাহলে কাহিনীটা বলি, শোন্—

অত:পর মনোয়ার হোসেন ভূমিকা করে শুরু করলো কাহিনী। বললো,

একগুলো পয়গম্বর আর একগুলো অবতার। আদব-আখলাক, চাল-চলন আলাদা হলেও, কাজটা দুইয়ের প্রায় একই। অর্থাৎ মানুষের মনের ময়লা পরিষ্কার করে তার পরম কল্যান সাধন করা। সূক্ষ্ম পার্থক্যটা হলোঃ পয়গম্বরেরা পরকাল ও পরমজন প্রত্যাশী আর অবতারেরা ইহলোকে আত্মপ্রচারে বিশ্বাসী। পয়গম্বর পাঠান আল্লাহ। অপরদিকে, পরমপ্রভু নিজেই নাকি অবতার হয়ে ইহলোকে আসেন। শাস্ত্রকারদের কথা।

তা আসুন। অবতারেরা আসুন। তবে পয়গম্বর আর আসবেন না। শেষ পয়গম্বরের মাধ্যমেই পয়গম্বর পাঠানো শেষ করেছেন আল্লাহ। রইলো এখন অবতার। পরম প্রভু বিশ্ববাজার গরম করে কতবার যে অবতার হয়ে এ বিশ্বে অবতরণ করলেন, তার ইয়ত্তা নেই। তবে ভাব দেখে ধরে নেয়া হয়েছিল, শরম পেয়েই পরম প্রভুও শেষমেষ চরম অবস্থান নিয়েছেন। মেকার হয়ে এসে বেকার মানুষকে দেখার মতো করে মেরামত করার খাহেশ তাঁর মিটেছে। কয়লার ময়লা যে ধুলেও যায় না—এটুকু শেখার মতো আক্কেল তার হয়েছে। অমানুষকে মানুষ বানানোর ঠেকা আর তাঁর নেই।

কিন্তু ওরে-ব্বাবা। একি উল্টাদৃশ্য! পরম প্রভু তো পরম প্রভু, তেত্রিশ কোটি দেবতারাই যে গোষ্ঠী সমেত অবতার হয়ে এ দুনিয়ায় অবতীর্ণ হবেন—এটা কি ভাবার কথা? কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছে। স্বর্গীয় মালগাড়ী ভর্তি হয়ে এসে তাঁরা এ দুনিয়ায় অবতরণ করেছেন। তা করবেন করুন আর পড়বেন অন্যের ঘাড়ে পড়ুন। কিন্তু না, এই অবতরণ করার পথে এ্যাক্সিডেন্টের কারণে মালগাড়ীর কয়েকটা বগি হঠাৎ করে উল্টে একদম আপ সাইড-ডাউন। ফলে মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ার মতো প্রায় কোটি খানেক অবতার আগেই ঝর ঝর করে ঝরে পড়েছেন আমাদের এই সোনার বাংলার বুকে। ব্যস! কম্মকাবার! অবতারগণ কোমর বেঁধে এখানেই স্বকর্মে মনোনিবেশ করেছেন। সোনার বাংলার মানুষকে সোনার মানুষ বানানোর দুর্মদ মানসিকতা নিয়ে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। স্বর্গের সুখ মর্তেই তারা দিতে চান সোনার বাংলার মানুষদের। বাংলাদেশটাকে বানাতে চান হাস্যে লাস্যে ভরা স্বর্গের নন্দন কানন।

ঃ হ্যাঁ। তবে একথা ঐ মহিলা এসে বলেননি। ওদের চাকর ইরফান মিয়া এসে নাকি বলে গেছে কদর আলীকে। কদরকে বলেছে, তোমার মুনিবকে একটু সাবধান হতে ব'লো। বাইরের যে সব লোক আসে ও বাড়িতে, তারা সবাই গুন্ডাপান্ডা মানুষ। কখন কি করে বসে বলা যায় না।

ফারুক মাহমুদ প্রশ্ন করলো—ইরফান মিয়া এসে বলেছে?

ঃ হ্যাঁ, ইরফান মিয়া। কি? ঘটনা কি? এসব কি ঠিক?

ঃ হ্যাঁ কিছুটা ঠিক। তবে ওরা যতটা না গুন্ডাপান্ডা তার অধিক বেহায়া আর বেয়াদব। ঈমান-আকিদা বর্জিত তথাকথিত প্রগতির পোলা সবাই। চরম ইসলাম বিদ্বেষী আর নাস্তিক গোছের মানুষ। বিশেষভাবে খেয়াল করে দেখলাম, যারা ওখানে আসে সবাই তারা নির্জলা "ভাদা" অর্থাৎ ভারতীয় দালাল। ঐ যে ঐ কানাইয়ের কথা মনে আছে? আবুল কাশেম কানাই? ঐ যে আমার দোকানে ভারতীয় মাল কিনতে এসেছিল সেবার, ঐ কানাই আর ঐ গোত্রের লোক সব।

ঃ হুঁউ।

ঃ গায়ে পড়েই ঝগড়া বাধায় ওরা। মাথায় টুপি দেখলেই মেজাজ ওদের বিগড়ে যায়।

www.boighar.com

ঃ ভয় পাস্ তুই?

ঃ নাঃ। ভয় পাবো কেন?

ঃ পাবিনে। মনে করিস্‌নে এই শহরে তুই একা আর অসহায়। আমাদের ইসলাম পন্থী নওজোয়ানরাও কিন্তু সংখ্যায় অনেক। ইসলামের সৈনিক সবাই। তোর কথা তাদের আমি বলেছি আর তাদের অনেকেরই নজর আছে তোর উপর। কেউ বাড়বাড়ি করলে একটু আভাস দিস্, দু'একটাকে শক্ত দাবাড় দিলেই সবগুলো ঠান্ডা মেরে যাবে। আসলে মুখে ওরা যতই বাহদুরী করুক, ভেতরে কিন্তু বেজায় ভীতু ওরা।

ঃ হতেই হবে। ঈমান যাদের থাকে না, তাদের ভেতরে সাহস যোগানোর উৎস আর অবলম্বনও কিছু থাকে না। স্বাভাবিক ভাবেই ভীতু হয় তারা। ঐ বেঈমানী চরিত্রের জন্যে তারা ভয় পায় সব কিছুতেই।

ঃ শুধু তাই নয়, মানে ভীতুই নয়। ঐ যে বললি, বেআদব আর বে আক্কেল? অন্যেরা তাদের কি চোখে দেখে, সে বোধটাও উদয় হয় না তাদের মধ্যে। আসলেই ওরা মানুষ নয়, অবতার। মানুষ না বলে ওদের অবতার বলাই ভাল।

ফারুক মাহমুদ হেসে বললো, সে কিরে! অবতার?

মনোয়ার হোসেন বললো, অল্ মোস্ট। ইসলাম বিদ্বেষী ঐ সব প্রগতির ফেরিওয়ালাদের যতই দেখছি, ততই তাদের মানুষ বলে আর মনে হচ্ছে না আমার। মনে হচ্ছে, আসলেই ওরা অবতার। এই দুনিয়া আর দুনিয়ার মানুষদের বাঁচানোর জন্যেই বুঝি ওদের এ দুনিয়ায় আবির্ভাব। যেমন বুশ্ আর টনী এই ধরনী বাঁচাতে বর্তমানে আবির্ভূত হয়েছে, মনে হচ্ছে—ঐ একই ইরাদা নিয়ে এই

অবতারেরাও এই দুনিয়ায় এসেছে। কার্যত বুশ্ টনীর মতো বাঁচানোর বিপরীতটাই করতে এসেছে ওরা।

ঃ আচ্ছা!

ঃ এমনই এক অবতারের কাহিনী শুনলাম সেদিন। শুনে হাসবো না কাঁদবো, কিছু স্থির করতে পারলাম না। মনে হলো কোন ইতর-ইল্লুতের রুচি আর চরিত্রও বুঝি এতটা নিম্ন মানের নয়। এদের চরিত্রের মান নির্ণয় করে, সাধ্য কার। বুঝলাম, মানুষ তো নয়ই এরা ইতর-ইল্লতও নয়, এরা অবতার।

ফারুক মাহমুদ ফের হেসে বললো, অবতার?

মনোয়ার হোসেন বললো, খাস অবতার। তাহলে কাহিনীটা বলি, শোন্—

অত:পর মনোয়ার হোসেন ভূমিকা করে শুরু করলো কাহিনী। বললো,

একগুলো পয়গম্বর আর একগুলো অবতার। আদব-আখলাক, চাল-চলন আলাদা হলেও, কাজটা দুইয়ের প্রায় একই। অর্থাৎ মানুষের মনের ময়লা পরিষ্কার করে তার পরম কল্যান সাধন করা। সূক্ষ্ম পার্থক্যটা হলোঃ পয়গম্বরেরা পরকাল ও পরমজন প্রত্যাশী আর অবতারেরা ইহলোকে আত্মপ্রচারে বিশ্বাসী। পয়গম্বর পাঠান আল্লাহ। অপরদিকে, পরমপ্রভু নিজেই নাকি অবতার হয়ে ইহলোকে আসেন। শাস্ত্রকারদের কথা।

তা আসুন। অবতারেরা আসুন। তবে পয়গম্বর আর আসবেন না। শেষ পয়গম্বরের মাধ্যমেই পয়গম্বর পাঠানো শেষ করেছেন আল্লাহ। রইলো এখন অবতার। পরম প্রভু বিশ্ববাজার গরম করে কতবার যে অবতার হয়ে এ বিশ্বে অবতরণ করলেন, তার ইয়ত্তা নেই। তবে ভাব দেখে ধরে নেয়া হয়েছিল, শরম পেয়েই পরম প্রভুও শেষমেষ চরম অবস্থান নিয়েছেন। মেকার হয়ে এসে বেকার মানুষকে দেখার মতো করে মেরামত করার খাহেশ তাঁর মিটেছে। কয়লার ময়লা যে ধুলেও যায় না—এটুকু শেখার মতো আক্কেল তার হয়েছে। অমানুষকে মানুষ বানানোর ঠেকা আর তাঁর নেই।

কিন্তু ওরে-ব্বাবা। একি উল্টাদৃশ্য! পরম প্রভু তো পরম প্রভু, তেত্রিশ কোটি দেবতারাই যে গোষ্ঠী সমেত অবতার হয়ে এ দুনিয়ায় অবতীর্ণ হবেন—এটা কি ভাবার কথা? কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছে। স্বর্গীয় মালগাড়ী ভর্তি হয়ে এসে তাঁরা এ দুনিয়ায় অবতরণ করেছেন। তা করবেন করুন আর পড়বেন অন্যের ঘাড়ে পড়ুন। কিন্তু না, এই অবতরণ করার পথে এ্যাক্সিডেন্টের কারণে মালগাড়ীর কয়েকটা বগি হঠাৎ করে উল্টে একদম আপ সাইড-ডাউন। ফলে মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ার মতো প্রায় কোটি খানেক অবতার আগেই ঝর ঝর করে ঝরে পড়েছেন আমাদের এই সোনার বাংলার বুকে। ব্যস! কম্মকাবার! অবতারগণ কোমর বেঁধে এখানেই স্বকর্মে মনোনিবেশ করেছেন। সোনার বাংলার মানুষকে সোনার মানুষ বানানোর দুর্মদ মানসিকতা নিয়ে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। স্বর্গের সুখ মর্তেই তারা দিতে চান সোনার বাংলার মানুষদের। বাংলাদেশটাকে বানাতে চান হাস্যে লাস্যে ভরা স্বর্গের নন্দন কানন

ছুটাতে চান এখানে ডু-ফূর্তির ফোয়ারা। বিভিন্ন নামে আর বিভিন্ন পরিচয়ে এই বাংলাদেশে তাঁরা কর্মরত আছেন মানুষের রূপ ধরে। ছোট্ট বাংলাদেশ আর প্রায় কোটি খানেক অবতার। তাই ঘুরতে ফিরতে প্রায়শই সাক্ষাত ঘটে এঁদের।

হাসি সম্বরণ করতে না পেরে ফারুক মাহমুদ হেসে ফেললো সশব্দে। বললো, সোবহান আল্লাহ! তার পর?

মনোয়ার হোসেন বললো, এমনই একজন অবতার এই শহরের কৌশিক আহম্মদ কেদার। বড়ই বিজ্ঞজন। পেশায় স্কুলের পণ্ডিত। লোকে বলে উনি পণ্ডিত নন, স্কুলের প্রভাষক। মিন্‌মিন্ করে ছাত্র পড়ান না কৌশিক আহম্মদ কেদার। মহাপ্রভুর ভাষণ দেন ক্লাসে। তাক্ লাগান নাবালক ছাত্র ছাত্রীদের। ভাষণ দেন সহকর্মীদের মাঝেও। অনগ্রসর, ধর্মান্ধ আর কূপমন্ডুক মানুষেরাই অগ্রগতির বাধা—এই তথ্যই এই অবতার অহরহ প্রচার করে বেড়ান। বলাবাহুল্য, এটা ঐকতানে প্রচার করে বেড়ান এই প্রায় কোটি খানেক অবতারেরা সকলেই। এঁরা জরাজীর্ণ সমাজটাকে একটা ফূর্তিভর্তি বাগান বাড়ি বানানোর বাণী শোনান জনগণকে। কৌশিক আহম্মদ কেদারও সেই বাণী মানুষকে শোনান আর সেই স্বর্গীয় বাণী দ্বারে দ্বারে ফেরি করে বেড়ান।

কৌশিক আহম্মদ ভাষণ দেন গুরুগম্ভীর। মোহন্তজীর মতো ভাবগম্ভীর তাঁর চাল চলন। স্বদেশী আন্দোলনের নেতার মতো এই কেদার মিয়া কাঁধে রাখেন সাইডব্যাগ, মাথায় রাখেন কাঁধ-ছোঁয়া বাবরী চুল, গায়ে দেন খদ্দরের লম্বা পাঞ্জাবী, পরিধান করেন ইয়াংকীদের পরিত্যক্ত তালি দেয়া জিংকের প্যান্ট্। ভাবটা কবি কবি, মুখে চটুল কবিতা। লেখা পড়েন কালকুটেড, বুলি কপচান কার্ল মার্কসের। অস্তিত্বে তার ডারউইন, মস্তিষ্কে ফ্রয়েড্।

এহেন জনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বাঙ্গালী কি কম আছে সোনার বাংলায়? অল্পদিনেই বেশ কিছু সাহাবা, তওবা নন্দী-ভিরিঙ্গী জুটে গেছে কেদার নাথের, থুড়ি কেদার মিয়ার চারপাশে। নূর মুহম্মদ পার্থ কেদার মিয়ার এমনই একজন সদ্য দীক্ষিত সাগরেদ। পার্থ নামটা কৌশিক মিয়াই জুড়ে দিয়েছেন তার মূল নামের সাথে। এতে নাকি জৌলুশ বাড়ে নামের। অসাম্প্রদায়িকতার খোশবু ছড়ায় ভুর ভুর করে। তবে নূর মুহম্মদ পার্থ কৌশিক আহম্মদ কেদারের সদ্য দীক্ষিত শিষ্য হেতু, গুরু আদর্শ সে পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেনি। মাঝে মাঝেই প্রশ্ন তোলে নানা রকম এবং শেষ অবধি বিদ্রোহ করেও বসে।

মনোয়ার হোসেন এই পর্যন্ত বলতেই ফারুক মাহমুদ জোশের বশে প্রশ্ন করলো—এ্যাঁ বিদ্রোহ? কি রকম—কি রকম?

মনোয়ার হোসেন বললো, সে প্রসঙ্গ পরে। আগে মূল কাহিনীটা শোন্।

নড়েচড়ে বসে মনোয়ার হোসেন ফের শুরু করলো কাহিনী। বললো,

একদিন খবরের কাগজ হাতে মুড্ নিয়ে বসেছিল কেদার মিয়া। এই সময় নূর মুহম্মদ পার্থ এসে বললো, কি গুরু, খুব খুশি-খুশি ভাব যে?

বিজয়গর্বে কেদার মিয়া বললো, ঠুকে দিয়েছিরে পার্থ, ঠুকে দিয়েছি একখানা। কাঠমূর্খ এক নাদান, সাহিত্যের সত্তাটাই জানে না, সেই ব্যাটা কয়দিন আগে কাগজে এক আর্টিকেল্ লিখেছিল। দিয়ে দিয়েছি তার সেই আর্টিকেলের এই দাঁতভাংগা জবাব।

হাতেধরা খবরের কাগজটা নাচাতে লাগলেন কেদার মিয়া। পার্থ প্রশ্ন করলো—কি ব্যাপার-কি ব্যাপার?

কেদারমিয়া বললো, আরে সে কথা আর কি বলবো? বই পুস্তক পড়ে না, সাহিত্যের খবর রাখে না, বিদ্যাবুদ্ধি দ্যাড় চোঙ্গা—সেই মূর্খ লিখেছে—অবসর বিনোদনের জন্যে খেলাধূলার প্রতি আজকাল মানুষের অধিক আকৃষ্ট হওয়ার কারণটা কি, সেই কথা। লিখেছে, "ভাল গল্প উপন্যাস আর ভাল সিনেমা ছবি বাজারে এখন দুর্লভ বস্তু। বই পুস্তক সব যৌনতত্বে ভরা আর সিনেমা—ছবি-যাত্রা-নাটক সব অশ্লীলতায় ভরপুর। ছেলেমেয়ে নিয়ে কোন পিতামাতার সিনেমা ছবি আজকাল আর দেখার উপায় নেই। গল্প উপন্যাসে কেবলই যৌন সুড়সুড়ির ছড়াছড়ি। কতগুলো আবার এমন যে, ঘরে দুয়ার দিয়ে একা একা পড়া ছাড়া প্রকাশ্যে পড়া যায় না। এসব কারণেই রুচিশীল মানুষেরা অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন খেলাধূলা। তাঁরা এখন বাধ্য হয়েই টি.ভি.তে ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা—এসব দেখেন। অশ্লীলতার কারণে গল্প উপন্যাস পড়া আর ছবি সিনেমা দেখা ছেড়েই দিয়েছেন, প্রায়"। শুনো এবার মূর্খের কথাগুলো।

উৎকর্ণ হয়ে উঠে পার্থ বললো, আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, এলেখা তো আমিও পড়েছি কাগজে। কিন্তু লেখকটাতো কোন অজ্ঞ বা মূর্খ ব্যক্তি নন! বিলেত ফেরত লোক আর বিজ্ঞজন তিনি। লেখালেখিতেও ইতিমধ্যেই নাম করেছেন যথেষ্ট।

নাসিকা কুঞ্চিত করে কেদার মিয়া বললো, আরে ছোঃ। ও আবার একটা লেখক নাকি? জ্ঞানের কোন গভীরতাই নেই যার, তার লেখা গরুছাগল ছাড়া কোন মানুষে পড়ে?"

পার্থ বললো, কেন পড়বে না? অশ্লীলতার ব্যাপারে উনি যা লিখেছেন, তাতো মিথ্যা নয়?

ঃ সে কি!

ঃ মিথ্যা কি করে? সিনেমা-ছবির কথাটাতো বলাই অবান্তর। আজকাল সাহিত্যেও যে অশ্লীলতা ঢুকেছে, যৌনতত্বের যে উৎকট প্রচার শুরু হয়েছে, তাতে সাহিত্য যে আজ অশ্লীলতা মুক্ত—এ কথা বলবে কে?

ঃ বলতেই হবে। অশ্লীলতা বলে সাহিত্যে কোন কথা নেই। শ্লীল-অশ্লীল, যে কথাই লেখা হোক, তা সবই সাহিত্য। সব কথাই মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আর সাহিত্য মানুষের জীবনের কথাই বলে, বুঝেছো?

পার্থ বললো, কিন্তু মানুষের জীবনে এমন অনেক গোপন কথা আর গোপন ব্যাপার স্যাপার আছে যা খোলামেলাভাবে বলা যায় না। তা বললে শিষ্টাচার থাকে না। ঐ লেখকের সাথে এনিয়ে কথা বলেছি আমি। উনি বলেন, চোখ আছে বলেই সব কিছু দেখা যায় না, আর নাক আছে বলেই সব কিছুর ঘ্রাণ নেয়া যায় না। রুচীশীল মানুষেরা তা পারে না। চোখ নাক আছে বলেই ঢাক্না খুলে ডাস্টবিন দেখা আর তার ঘ্রাণ নেয়া রুচি ও স্বাস্থ্য—এই দুইয়েরই বিরোধী। অশ্লীল সাহিত্য তাই সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

কৌশিক আহম্মদ কেদার উত্তেজিত হয়ে বললো, এসব সংকীর্ণ মনের কথা আর কূপমন্ডুক মানুষের উক্তি। এইসব দুষ্টলোকেরাই মানুষের মনের প্রসার ঘটতে দিচ্ছে না।

পার্থ প্রতিবাদ করে বললো, না-না, উনি মোটেই দুষ্টলোক নন। খুবই সৎসরল আর পরহেজগার মানুষ। পরকালের ভয় তাঁর ভীষণ।

প্রচন্ড বিরক্তির সাথে কৌশিক আহম্মদ বললো, ওহ্হো, তোমাকে তো এখনও মানুষ করা গেল না। এতদিন ধরে তাহলে বলছি কি আর শিখলে কি? ওসব পরকাল ফরকাল বলে কোন কিছুই নেই। www.boighar.com

ঃ নেই?

ঃ না। ঐ আল্লাহ-ঈশ্বর গড্-ফড্-সবই বোগাস। চরম ধাপ্পা। ওসব কোন কিছুই নেই। সবই মানুষের মনগড়া কথা।

ঃ সে কি! ধর্মাধর্ম পাপ-পূণ্য—এসবও কিছু নেই?

কৌশিক ওরফে কেদার জোর দিয়ে বললো, নেই-নেই, কিছুই নেই। ধর্মটা হলো মানুষকে ধোকা দেয়ার কেবলই একটা কৌশল। সবই গুল, বুঝলে? প্রচণ্ড প্রতারণা।

ঃ তাহলে আমরা এই দুনিয়ায় এলাম কি করে?

ঃ অটোম্যাটিক্যালী। ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পেসিস্' থিওরী পড়োনি? বানর থেকেই দিনে দিনে আমরা মানুষ হয়ে গেছি।

ঃ তাহলে ঐ আদম হাওয়ার ব্যাপারটা?

ঃ কেবলই একটা গালগপ্পো। আস্ত একটা ব্লাফ্। মানুষকে ভুলিয়ে রেখে ধর্ম ব্যবসায়ীদের লুটে পুটে খাওয়ার সেরেফই একটা ফন্দি।

ঃ তাই?

ঃ তবুও সন্দেহ? নাঃ! এখনও তুমি অনগ্রসরই রয়ে গেলে। অগ্রসর মানুষ এখনও হতে পারলে না। প্রগতির সুবাতাস এখনও তোমাকে বিধৌত করতে পারলো না।

ঃ প্রগতির সুবাতাস!

ঃ হ্যাঁ। এই পৃথিবীকে সুন্দর আর আনন্দঘন করতে পারে একমাত্র প্রগতির প্রবাহ। কিন্তু অনগ্রসরতা, কূপমন্ডুকতা আর ধর্মান্ধতা হলো প্রগতির পথের একমাত্র বাধা। এই বাধাগুলোকে উৎখাত করতে পারলে তবেই এই পৃথিবীটা মানুষের নিরাপদ আবাসে আর নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আলয়ে পরিণত হবে।

ঃ তা হবে কি করে? পরকাল আর পাপ-পূণ্যের ভয় মানুষের মনে না থাকলে, মানুষ ন্যায় পথে আর সৎপথে চলবে কেন? মানুষ তো বাইনেচার একটা পশু। এ বাইপেড্ এনিম্যাল। বন্য পশুর তামাম বর্বরতা তার মধ্যে বিদ্যমান। একমাত্র পরকালের কথা, অর্থাৎ পাপের শাস্তির ভয়ই মানুষকে সৎ থাকতে বাধ্য করে। সেই ভয়ই যদি না থাকে, তাহলে তো মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে হানাহানিতে। পশুর আচরণ করবে।

কেদার মিয়া বললো, করবে না—করবে না। প্রগতিই হলো সব দাওয়াইয়ের বড় দাওয়াই, বুঝলে? প্রগতিশীল মানুষ মানেই অগ্রসর মানুষ আর অগ্রসর মানুষ মানেই সভ্য ও মুক্তচিন্তার মানুষ। সভ্য মানুষের মুক্তচিন্তা আর রুচিই তাকে তামাম অন্যায় থেকে বিরত রাখবে।

ঃ এ কথা আমি মেনে নিতে পারলাম না গুরু। মানুষ নামের ঐ পশুর ঠুন্‌কো রুচি আর মুক্তচিন্তা নামের ঐ বল্গাহীন খেয়াল খুশি কখনো মানুষকে সৎ রাখতে পারে না। বড় রকমের স্বার্থ আর লালসা সামনে এসে পড়লে ঐ সব কাল্পনিক বন্ধন এক পলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

ঃ পার্থ!

ঃ জবাবদিহিতা না থাকলে কোন রেস্ট্রিকশানই রেস্ট্রিকশান নয়। পশুকে বশে রাখতে প্রয়োজন শক্ত মুগুর আর পরকালের ভয়ই সেই মুগুর। পূণ্যের পুরস্কার আর পাপের কঠোর শাস্তির প্রশ্নই, অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি ভয় আর ভক্তিই পারে পশু মানুষকে পশুত্ব থেকে মুক্ত রাখতে। অন্য কথায়, আল্লাহ প্রীতি আর আল্লাহভীতি ছাড়া অন্য কিছুই তা পারে না।

ঃ পারে-পারে অবশ্যই পারে। এ লাইনে তুমি একেবারেই নতুন। জ্ঞানবুদ্ধি পোক্ত হয়নি এখনোও। পোক্ত হলেই বুঝতে পারবে সব কিছু।

এই বলেই কেদার মিয়া ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললো, ওহো, অসময় হয়ে যাচ্ছে, আমি উঠি। এখনই আমাকে মহিলা ক্লাবে যেতে হবে।

শুনে নূর মুহম্মদ পার্থ আবার প্রশ্ন করলো, মহিলা ক্লাবে? সেখানে কি হয়?

জবাবে কেদার মিয়া কলকণ্ঠে বললো, নাচ হয়, গান হয়, নাটকের রিহেয়ারসেল হয়, কাব্য-কবিতার প্রতিযোগিতা হয়। এক কথায়, যাবতীয় বাধাবন্ধন আর কুসংস্কার থেকে মেয়েদের মুক্ত করা হয়। পর্দা-আব্রু সরিয়ে মেয়েদের পুরুষের কাতারে এনে দাঁড় করানো হয় আর পুরুষের সম অধিকার দান করা হয়।

পার্থ তাজ্জব হয়ে বললো, সেকি! পর্দা-আব্রু সরিয়ে একদম ফ্রি-মিক্সিং?

ঃ অফ্‌কোর্স। মৌলবাদী আর ধর্ম ব্যবসায়ীদের ভণ্ডামী উৎখাত করতে না পারলে, নারীমুক্তি আর নারী স্বাধীনতা আসবে কি করে?

www.boighar.com

ঃ নারীমুক্তি কাকে বলছেন গুরু? এতো নারীদের রসাতলে পাঠিয়ে দেয়া।

ঃ রসাতলে বলছো কেন? এটাতো নারীদের প্রগতির পথে আনা। এমনটি না হলে প্রগতির পরশ রমণীকুল পাবে কি করে? প্রগতির মনমাতানো হাওয়া?

ঃ তাহলে লীভ্-টুগেদারও বুঝি এই প্রগতির একটা অংশ?

ঃ অবশ্যই। নারীপুরুষ সকলেই স্বাধীন হয়ে জন্মেছে। নিজের ইচ্ছে-আকাংক্ষা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলবে তারা—এই তো অগ্রসর আর সভ্য মানুষের কথা। প্রগতির পরিচয়। পশ্চিমাদেশ গুলোর দিকে তাকাও, তাহলেই বুঝতে পারবে।

নূর মুহম্মদ পার্থের বুঝ তবু এলো না। সে ইতস্তত করে বললো, দেখুন গুরু, প্রগতির পরিচয় আর শিক্ষা যা-ই হোক, আপনি একজন শিক্ষক। ছাত্র ছাত্রীদের আদর্শ। অনৈতিক আর অসামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে আপনি জড়িত থাকলে, সে আদর্শ কিন্তু মিস্‌মার হয়ে যাবে।

কৌশিক আহম্মদ কেদার সদম্ভে বললো, পাগল! তাই কি আমি মিস্‌মার হতে দিই। আমি কি প্রগতিশীল মানুষ নই? মৌলবাদীদের মতো আমি কি নোংরা আর নির্বোধ? রুচি নেই কি আমার? আমি একজন অগ্রসর মানুষ, বুঝলে?

মনোয়ার হোসেন তার কাহিনীর এই পর্যন্ত বলে একটু থামতেই ফারুক মাহমুদ পুনরায় ব্যস্তকণ্ঠে বললো, তারপর? তারপর কি হলো?

মনোয়ার হোসেন বললো, এ কাহিনীর এইখানি ঐ পার্থের মুখেই শুনলাম। সে এখন পুরোপুরি ত্যাগ করেছে ঐ কৌশিক মিয়ার সংশ্রব। সে-ই আমাকে এ পর্যন্ত সবিস্তারে শুনিয়েছিল। তারপর তোর মতো এক হাকিমের মুখেই এ কাহিনীর বাকী অংশ শুনলাম। হাকিম সাহেব বললেন—প্রগতির প্রবল প্রবক্তা কৌশিক আহম্মদ কেদারের রুচি চরিত্র আর আদর্শের বড়াই লোক মারফত একদিন আমার কানে এসে পড়লো। শুনে বরং খুশিই হয়েছি। মানুষ আদর্শবাদী হোক, আদর্শ চরিত্রের হোক—এই তো চাই। কিন্তু হায়রে আমার চাওয়া। বাড়িতে ছিলাম এক সপ্তাহের ছুটিতে। তারপর আরো চার পাঁচদিন কোর্টে বসতে পারলাম না নানা রকম সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ। শেষে কোর্টে এসে চেম্বারে ঢুকতেই বেশ কয়েকটি নতুন কেসের কাগজ পত্র এনে টেবিলে দিলেন পেশকার সাহেব। জানতে চাইলেন আজ আমার এজলাসে বসার সময় হবে কিনা। সময় হবে, একথা জানিয়ে দিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম—এতগুলো নতুন কেস্, সবগুলো কি আজই এসেছে?

পেশকার সাহেব বললেন—না স্যার। এই দুইটি একশো সাতধারার কেস্ এসেছে আজ। এই তিনটি মেয়েছেলের কেস্ দাখিল হয়েছে বিগত পৃথক পৃথক তিন দিনে। কেস্‌গুলো জটিল বলে যিনি আপনার চার্জে ছিলেন, তিনি আপনার জন্যেই কেস্ তিনটি রেখে দিয়েছেন। কোন অর্ডার তিনি অর্ডারশীটে লেখেননি।

জটিল কেস্ শুনে মেয়েদের আর্জিগুলো পরপর একটানা পড়ে ফেললাম। অবাক হয়ে দেখলাম, দুটি মেয়ের অভিযোগ একেবারেই এক ও অভিন্ন। বিয়ের লোভ দেখিয়ে তাদের সম্ভোগ করা হয়েছে এবং মেয়ে দুটি এখন গর্ভবতী। কিন্তু তাদের বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আসামী। বেঁকে বসেছে পুরোপরি। তৃতীয় মেয়ের অভিযোগও প্রায় কাছাকাছি। দীর্ঘদিন লীভ্-টুগেদার করার পর কেটে পড়েছে

আসামী। আর ধরা দিচ্ছে না। আরো তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করলাম—তিনটি কেসেরই আসামী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। সে ব্যক্তিটি হলো প্রগতির প্রচন্ড প্রবক্তা ঐ কৌশিক আহম্মদ কেদার। বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—একি পেশকার সাহেব! প্রগতির ঢোল বাজানো কেদারের এই চরিত্র শেষ পর্যন্ত? এত সভ্যতার কথা বলতেন আর নীতি আদর্শ কপ্‌চাতেন—সেই কৌশিক আহম্মদ এই জঘণ্য তিনটি কেসেরই আসামী?

পেশকার সাহেব মুচ্‌কি হেসে বললেন—আর একটা কেসেরও আসামী স্যার। পুলিশেরা সে কেস্ নিয়ে আসছেন আজই।

ঃ কি রকম?

ঃ শিক্ষকতা পেশার মুখে নূড়ো জ্বালিয়ে দিয়ে ঐ কৌশিক আহমদ কেদার মিয়া মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছিলেন শুঁড়িখানার সামনে। প্রায় উলঙ্গ অবস্থা। টের পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রোপ্তার করে এনেছে। সি.এস.আই.সাহেব আজ এজলাসে দাখিল করবেন সে কেস্। হাজির করবেন আসামীকেও। হুঁশবুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম আমি। চেম্বারে বসে থাকা অবস্থাতেই আমার মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল "জয়বাবা প্রগতির ফেরিওয়ালা, জয় বাবা কলির কেষ্ট ঠাকুর, তুম্ যুগ যুগ জিও"।

মনোয়ার হোসেন বললো, এই বলেই এ কাহিনী শেষ করলেন হাকিম সাহেব। ক্ষোভে-দুঃখে আর কিছুই বলতে পারলেন না।

ইতিমধ্যেই আবেগের আধিক্যে লাফিয়ে উঠলো ফারুক মাহমুদ। চীৎকার করে বললো-আমারও সেই কথা দোস্ত ঃ যুগ যুগ জিও, কেদার মিয়া তুম যুগ যুগ জিও।

চীৎকার শুনে "কি হলো-কি হলো," বলে ছুটে এলো কদর আলী। তার আগমনে হুঁশে এলো মনোয়ার হোসেন। অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় সে নীরবে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে এবং ফারুক মাহমুদকে "আল্লাহ হাফেজ" জানিয়ে গৃহের পথ ধরলো।

৫

হঠাৎ করেই উল্লাসে কেঁপে উঠলো তলবদার সাহেবের বৈঠকখানা, তথা ড্রয়ীংরুম। মনোয়ারের সাথে ফারুকের কৌশিক আহম্মদ প্রসঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত ঐ আলাপের পরের দিনের ঘটনা। শরীর খারাপ হওয়ায় সেদিন আনজুমকে পড়াতে এলো না ফারুক মাহমুদ। তার আশায় কুরআন শরীফ খুলে নিয়ে ড্রয়ীংরুমে বসে রইলো আনজুম। হুজুরের আসতে দেরী দেখে সে আগের পড়াটায় আর একবার চোখ বুলাতে লাগলো আর মোলায়েম কণ্ঠে আওড়াতে লাগলো ঐ পারার শেষের

আয়াতগুলো। ফারুক মাহমুদ এসেছে বিনা সেই খোঁজ নিতে ইয়াসমীন আরা ড্রয়ীংরুমে এসে আনজুমের কুরআন তেলাওয়াতে আকৃষ্ট হলো এবং চুপ করে তার পাশে বসে শুনতে লাগলো তেলাওয়াত।

এই সময় বিজয়গর্বে এসে ড্রয়ীংরুমে ঢুকলো ইয়াসমীনের আব্বা আবদুর রাজ্জাক তলবদার। ড্রয়ীংরুমে ঢুকতে ঢুকতে তিনি হাত পা ছুড়ে বলতে লাগলেন—মারদিয়া কেল্লা মারদিয়া কেল্লা! আর আমার ভয় নেই। আর আমাকে পায় কে? আমি এখন বাদশাহ!

তাঁর উল্লাসের শব্দে পাশের ক্লাবঘর থেকে ছুটে এলো গৌতম, কানাই, নানক ও বিজন কুমার বিজয় নামের অন্য এক তরুণ। ক্লাবঘরে বসে কি এক বিষয় নিয়ে আলাপরত ছিল তারা। তলবদারের চীৎকারে তারা "কি ব্যাপার-কি ব্যাপার" বলে ছুটে এলো ড্রয়ীংরুমে। www.boighar.com

পরিস্থিতির আকস্মিকতায় কুরআন শরীফ বন্ধ করে নিয়ে বাড়ির ভেতরে দৌড় দিলো আনজুম। ইয়াসমীনও তার পেছনে ছুটে যেতে লাগলো। তলবদার সাহেব ইয়াসমীনকে ডাক দিয়ে বললেন—আরে যাস্ কেন, যাস্ কেন? শোন্-শোন্ খুব ভাল একটা খবর আছে।

ভেতরের দিকে যেতে যেতে ইয়াসমীন আরা বললো, কি খবর, বলুন। আমি এখান থেকেই শুনছি।

তলবদার সাহেব খরবটা বলার আগেই গৌতম প্রশ্ন করলো—কি ব্যাপার দুলা ভাই? আপনি কি কোর্ট থেকে এলেন?

তলবদার সাহেব আগ্রহভরে বললো, আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেখান থেকেই আসছি আর সেই খবরই বলতে চাচ্ছি।

ঃ এ্যাঁ, সেই খরবই? কি খবর? ফাইন্যাল রায়টাই আজ পেয়ে গেলেন নাকি? মানে আপনার পক্ষে?

ঃ না, ঠিক এখনোও পাইনি। তবে পেতেও আর দেরী নেই, মনে করতে পারো।

ঃ কেমন-কেমন? www.boighar.com

ঃ এ যাবত তো মামলার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বাদীপক্ষ অর্থাৎ সে পক্ষের উকিল যে সব যুক্তি খাড়া করেছিল, তাতে মনে হয়েছিল—আর বুঝি আশা নেই। কিন্তু আজ হাকিম সে সব যুক্তি খারিজ করে দিয়েছেন। তামামই উড়িয়ে দিয়ে তাদের নতুন যুক্তি হাজির করতে বলেছেন। শুনে বাদীপক্ষের মুখ একদম চুন।

ঃ আচ্ছা! তারপর?

ঃ হকিম বললেন, বাড়িঘর মিলকারখানা সব আসামীর দখলে। শক্ত প্রমাণ আর বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারলে, এ সব যুক্তি দিয়ে কাজ হবে না। দলীলে দেখা যাচ্ছে—বিক্রেতা বাদীর চেয়ে আসামীকেই দলীল করে দিয়েছে কয়েকদিন আগে। বাদীকে দিয়েছে তার পরে। বিক্রেতা চীট্ করুক আর যা-ই করুক, আসামীর এটা

একটা প্লাস্ পয়েন্ট। এছাড়া সব কিছু আসামীর দখলে। শুধু প্লাস্ পয়েন্টই নয় এটা, একটা মস্ত বড় প্লাস্ পয়েন্ট। কারণ দখলী স্বত্ব একটা মস্ত বড় স্বত্ব।

গৌতম মহানন্দে বললো, সাবাস-সাবাস! তা পরে আমাদের উকিল কি বললেন?

ঃ কাকে? হাকিমকে, না আমাকে?

ঃ আপনাকে-আপনাকে।

ঃ আমাদের উকিল সাহেব তো ড্যাম্ খুশি। তিনি আমাকে বললেন—কোনই চিন্তা করবেন না তলবদার সাহেব। ধরে নিন, সব কিছু পেয়েই গেছেন আপনি। আর কোনভাবে না হলেও, দখলী স্বত্বের বলেই আপনি পেয়ে যাবেন সব কিছু। দখল থেকে আপনাদের আর উচ্ছেদ করে কে?

আনন্দে দুলতে লাগলেন তলবদার সাহেব। আবদুল গণি গৌতম এবার উল্লাসভরে বলে উঠলো—মারহাবা-মারহাবা! তাহলে আর চিন্তা কি দুলা ভাই, সব তো পেয়েই যাচ্ছেন। এবার খাওয়া লাগান। পোলাও মাংস না হলেও, মিঠাই মিষ্টান্ন যাহোক কিছু খাওয়ান এবার আমাদের। এমন একটা সুখবর কি শুকনো মুখে হজম হয়?

নাজমুল আলম নানক এ কথায় সশব্দে বলে উঠলো—আরে তলবদার চাচাকে বলছো কেন? জয়টাতো মিস্ ইয়াসমীনের। মিষ্টান্নটা তো তারই খাওয়ানো উচিত।

চোখের শাসনে নানককে শাসিয়ে গৌতম ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আহ্ নানক! খামাকা ইয়াসমীনকে এর মধ্যে টানছো কেন? বিষয় সম্পত্তি দুলা ভাইয়ের। মামলায় জয় হলে হবে দুলা ভাইয়েরই। ইয়াসমীন মিঠাই খাওয়াবেন কেন? খাওয়ালে খাওয়াবেন দুলা ভাই।

চোখের ইঙ্গিত বুঝতে পেরেই নানক সাবধান হয়ে গেল। সেও কথা ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললো, ও-হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো। তলবদার চাচার বিষয় সম্পত্তি, তলবদার চাচার মামলা! ঠিকই তো, তলবদার চাচাই তো খাওয়াবেন! আমারই ভুল হয়েছে।

সাথে সাথেই ফুলে উঠে তলবদার সাহেব বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আলবত্ খাওয়াবো-জরুর খাওয়াবো। তোমরা সবাই শান্ত হয়ে বসো। খাওয়াবোনা মানে? এমন একটা আনন্দঘন মুহূর্তে খাওয়াবোনা তো খাওয়াবো কখন?

বলেই জোশের আধিক্যে তলবদার সাহের স্বগতোক্তি করলেন—ব্যাটা, তুমি ঘুঘু দেখে গেছো, ফাঁদ দেখে যাওনি! এবার কবর থেকেই দেখোসে ফাঁদ-হুঁ-হুঁ-হুঁ।

হাসতে লাগলেন তলবদার। তাঁর স্বগতোক্তির জের ধরে গৌতম প্রশ্ন করলো—কার কথা বলছেন দুলাভাই?

সম্বিতে এসে তলবদার সাহেব বললেন—এ্যাঁ? আমি? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি বলছি ঐ মূল ক্রেতা ফিরোজ আহমদের কথা। মূল বাদী, মানে আসল ক্রেতা ফিরোজ আহমদ মারা গেছে তো? মারা যাওয়ার আগে ঐ ফিরোজ আহমদ নাকি বড়াই করে বলে গেছে—আমি না থাকলেও আমার রাজধানীর ঐ বাড়িঘর মিলকারখানা আসামী গ্রাস করতে

পারবে না। আমার ছেলে আছে বিচক্ষণ ও আইনজ্ঞ। ছেলে আমার আসামীকে ঐ সম্পদ থেকে উৎখাত করবেই।

ঃ তাই নাকি? এই কথা বলে গেছে?

ঃ হ্যাঁ সেই কথাই তো বলছি। আসুক দেখি তার সেই আইনজ্ঞ ছেলে। কেমন করে সে এখান থেকে আমাদের উচ্ছেদ করে দেখি। হুঁ-হুঁ বাবা, দখলীস্বত্ব একটা মস্তবড় স্বত্ব। দখল থেকে উচ্ছেদ করা চাট্টিখানেক কথা!

অতঃপর ইরফান মিয়াকে ডেকে মিষ্টি কিনতে পাঠালেন তলবদার সাহেব।

দিন দুয়েক পরে ইয়ামীনের আনা নাস্তার আয়োজনটা ছিল খুবই উন্নত মানের আর পরিমাণেও অনেক। পড়াশুনা শেষ করে আনজুম্ উঠে যেতেই নাস্তা নিয়ে হাজির হলো ইয়াসমীন আরা বেগম। তাকে সাহায্য করতে সাথে এলো বাড়ির কাজের মেয়ে। নাস্তা পানি পৌঁছে দিয়ে কাজের মেয়ে চলে গেল। নাস্তার ঐ বিশাল আনজাম দেখে ফারুক মাহমুদ বিচলিত হয়ে উঠলো। ব্যস্তকণ্ঠে বললো, একি-একি! এসব কি-এসব কি!

ফারুক মাহমুদের চঞ্চলতা দেখে ইয়াসমীন আরা হেসে বললো, কি আবার, আপনার একটু নাস্তাপানি।

একই রকম ব্যস্তকণ্ঠে ফারুক মাহমুদ বললো, নাস্তাপানি? একটু খানি নাস্তাপানি? এ যে রীতিমতো ফলার।

ঃ হলোই বা। দৈনিক তো শুক্‌নো একটু নাস্তা করে চলে যান। আজ না হয় একটু ভাল করে নাস্তাপানি করলেন।

একটু থেমে ফারুক মাহমুদ বললো, ভাল করে? তা হঠাৎ আজ একটু ভাল করে নাস্তা করানোর খেয়াল জাগলো কেন আপনার?

ঃ খেয়াল জাগবে কেন? কয়েকজন মেহমান এসেছিলেন বলে আনজামটা আগেই করা হয়েছিল। তারই একটু আপনাকে এনে দিলাম।

ফারুক মাহমুদ আশ্বস্ত হয়ে বললো, ও, তাই বলুন। তবু ভাল যে সেরেফ আমার জন্যে করতে যাননি!

ঃ তাহলে কি হতো?

ঃ খুবই দৃষ্টি কটু হতো।

ঃ দৃষ্টি কটু হবে কেন? সেরেফ আপনার জন্যে তো মাঝে মাঝে এমন একটু আয়োজন করা খুবই উচিত ছিল আমার। এতদিন তা না করে বরং যথেষ্ট বেয়াদবীই করে ফেলেছি।

বিস্মিত নয়নে চেয়ে ফারুক মাহমুদ বললো, বেয়াদবী! সে কি! প্রতিদিন একধারছে নাস্তা পানি খাওয়ানোর পরও আরো বেশি খাওয়াতে পারেননি বলে বেয়াদবী করে ফেলেছেন?

www.boighar.com

ঃ অবশ্যই। আপনার মতো লোককে যে নাস্তাপানি দেয়া হয়েছে এ যাবত তা আসলেই আপনার উপযুক্ত নয়। সাধারণ একজন মেহমানকে যা দেয়া হয়, সেই রকম নাস্তাপানি। তাতে যে আপনার যথার্থ সম্মান রক্ষে করা হচ্ছে না, এ যাবত এটা খেয়ালেই আসেনি কারো। এমনটি আর হতে দেয়া যাবে না। অন্তত নাস্তাপানির মানটা অতঃপর বাড়াতেই হবে কিছুটা। নিন, মুখে দিন—

নাস্তার ট্রেটা সামনে এগিয়ে দিলো ইয়াসমীন। ট্রেতে রিকাবী ভর্তি খাদ্য সামগ্রী থরে থরে সাজানো। সেই সাথে নানা রকম ফলমুল। সেদিকে না চেয়ে ফারুক মাহমুদ বললো, কারণটা কি বলুন তো? হঠাৎ কি কারণে আপনার খেয়াল হলো যে, আমার নাস্তার মানটা আরো উন্নত হওয়া উচিত?

ঃ আপনি উন্নত মানের মানুষ, সেই কারণে। প্রথম প্রথম আমরা আপনাকে যা ভেবেছিলাম, আপনি তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত পর্যায়ের মানুষ।

ঃ আপনারা ভেবেছিলেন? আপনারা কারা?

ঃ আমি, আমার আম্মা, আনজুম, চাকর-চাকরাণী, আত্মীয়-স্বজন সবাই।

ঃ বটে! তা আমি একজন উন্নতমানের মানুষ, এটা নির্ণয় করলেন কি করে?

ঃ আপনাকে স্টাডি করে। অর্থাৎ, দিনের পর দিন আপনাকে লক্ষ্য করে এ ধারণা আমাদের সবার হয়েছে।

ঃ আমাকে লক্ষ্য করে?

ঃ হ্যাঁ। আপনার চাল-চলন, কথা-বার্তা, চেহারা-চরিত্র—সব কিছু লক্ষ্য করে। এ বাড়িতে তো দৈনিক হাজার যোগীর আনাগোনা! তাদের একজনেরও কি কথা-বার্তা, চাল-চলন আর চেহারা-চরিত্র আপনার ধারে কাছে যায়? যেমন উদ্ভট তাদের চেহারা, তেমনি উল্লুক মার্কা তাদের কথা-বার্তা আর চাল-চলন। এই হাজার জনের বাজারে আপনি এক আশ্চর্য জনক ব্যতিক্রম। যেমনই হৃদয়গ্রাহী কথা-বার্তা, তেমনই আপনার মনোগ্রাহী আচরণ।

ঃ তাজ্জব! এতদিন পরে হঠাৎ আজ সে সব আবিষ্কার করলেন আপনি?

ঃ আমি অনেক আগেই তা আবিষ্কার করেছি। কিন্তু দৃষ্টিকটু হয়ে যাওয়ার ভয়ে আর শরমে আমি সেটা এতদিন প্রকাশ করতে পারিনি। আমার বাড়ির লোকেরা ভাব্‌বে কি, এই ভয়ই ছিল আমার সব চেয়ে বড়। কিন্তু এখন এসব নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছেন আমার আম্মাসহ এ বাড়ির অন্যান্য সকলেই। কাজেই, আজ আমার প্রকাশ করতে বাধা নেই।

ঃ তাই নাকি?

ঃ আপনার তারিফে আমার আম্মা এখন একেবারেই আওয়ারা। ওদিকে আবার আনজুম্‌টাও হুজুর বলতে অজ্ঞান।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আম্মা বলেন, এমন সুন্দর ছেলে তুই কোথা থেকে যোগাড় করলিরে ইয়াসমীন? এ যুগে এমন ছেলেও পাওয়া যায়? যেমনই পরহেজগার, চাল-চলন চেহারায় তেমনই একজন ফেরেস্তাতূল্য লোক। এমন লোকের প্রতি কিন্তু তুই মোটেই ন্যায়বিচার করছিসনে। তার প্রাপ্য আদর-আপ্যায়ন এ বাড়িতে মোটেই সে পাচ্ছে না। এটা খুবই অন্যায় করছিস্ তুই।

ঃ অর্থাৎ? কি করতে বলেন তিনি?

ইয়াসমীন আরা হেসে বললো, সেটা তো সব বুঝিনে। তবে আরো বেশি বেশি করে আপনাকে চা-নাস্তা খাওয়ানোর কথা যে বলেন—এটা বুঝতে পারি।

ঃ আরো বেশি-বেশি?

ঃ আজকের মতো না হলেও অতীতে যা খাওয়ানো হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বেশি?

ফারুক মাহমুদ মৃদু হেসে বললো, একেই বলে, 'ঘোড়াই ঢোকেনা, তার উপর আবার হাতী'!

ঃ তার অর্থ?

ঃ নাস্তাই আর এখানে করবো না বলে চিন্তাভাবনা করছি যখন, তখন আপনারা চিন্তা করছেন—আরো বেশি বেশি করে নাস্তা করানোর।

ঃ সেকি! নাস্তাই আর করবেন না—এ চিন্তা করছেন কেন?

ঃ আমার প্রেস্টিজটা পাংচার হতে বসেছে, তাই। এনিয়ে কথা উঠেছে আমার বাসায়।

ঃ কথা উঠেছে? কে কথা তুলেছে? কদর আলী?

ঃ ঐ ব্যাটাই তো ভরা হাটে হাঁড়ি ভেংগে দিয়েছে। যা নয়, তাই সবাইকে বলে ফাঁপিয়ে তুলেছে পরিবেশ। আপনি আমাকে দৈনিক আদর করে নাস্তাপানি খাওয়ান—এটা রসিয়ে রসিয়ে বলে সে বিগ্‌ড়ে দিয়েছে অনেকের মাথা। এটা এখন কেউ কেউ আর সহ্য করতে পারছে না। আপনার হাতে নাস্তাপানি খাওয়াটা নাকি বাড়াবাড়ি হচ্ছে আমার।

ঃ কে বলেছে সে কথা?

ঃ প্রথমে শুরু করেন আমার এক বন্ধু। তার দেখাদেখি অনেকেই এখন বলতে শুরু করেছে। এখন এক থেকে একাধিক জনের ঠ্যালায় আমি আস্থির।

ঃ তাঁরা বলছেন, এটা আপনার বাড়াবাড়ি হচ্ছে?

ঃ হ্যাঁ। এটা নাকি বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো আমার।

ইয়াসমীন আরা আগ্রহী কণ্ঠে বললো, কে বামন, আপনি? আর কে চাঁদ, আমি? মানে, আমরা?

ঃ হ্যাঁ। কারো কারো হিসাবে এক্ষেত্রে আমি নাকি বামনটাও নই, আমি একটা ব্যাং বা ব্যাঙ্গাচী।

ঃ কেন-কেন? কারো কারো হিসেবটা এ রকম হওয়ার কারণ?

ঃ কারণটা তো স্পষ্টই। আমি একজন সামান্য দোকানদার আর আপনারা সব রাজরাজা মানুষ। আপনাদের বাড়ি প্রায় রাজবাড়ি আর আপনিও প্রায় একজন রাজকন্যা। সামান্য একজন দোকানদারের পজিশান এখানে নাকি বামনের চেয়েও খাটো। আপনাদের সাথে আমার এত মাখামাখি করাটা নাকি নিতান্তই বেমানান।

ঃ তাই তারা বলছেন।

ঃ মুখে এতটা ব্যাখ্যা করে না বললেও, তাই তারা ভাবছেন।

ফের হেসে ফেললো ইয়াসমীন। বললো, যা ভাবেন, ভাবুন তাঁরা। আপনি এখন খান। তাড়াতাড়ি খাওয়া শুরু করুন। সব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ফারুক মাহমুদ আনমনে বললো, এ্যাঁ? খাবো?

ইয়াসমীন আরা জোর দিয়ে বললো, হ্যাঁ, খান। ওদের গিয়ে এবার আপনি বলবেন, আপনি বামন বা ব্যাং নন, আপনি বিশাল একটা হাতী। এত বড় হাতী যে, সেটা অনুমান করার সাধ্যটুকুও আপনার ঐ সমালোচকদের নেই। এরই মধ্যে আবার এসে হাজির হলো আনজুম। সে এসে ইয়াসমীনকে বললো, আপা, আমি একটা মস্তবড় মুস্কিলে পড়ে গেছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

ইয়াসমীন বললো-মুস্কিল! কি মুস্কিল?

আনজুম বললো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আগামীকাল দুটো অংক কষে নিয়ে যেতে না পারলে, নির্ঘাত অংকের স্যারের হাতে পিটনি খেতে হবে আমাকে। এতক্ষণ চেষ্টা করেও করতে পারছিনে অংক দুটো।

ইয়াসমীন বললো, কি অংক?

হাতের খাতাটা মেলে ধরে আনজুম বললো, এই যে এই দুটো অংক। একটা হলোঃ দুইটি সংখ্যার যোগফল ৫০০ আর বিয়োগফল ১০০, সংখ্যা দুইটি কত?

আর একটা হলো ঃ ক ও খ এর একত্রে ৫০ টাকা আছে, খ ও গ এর একত্রে ৭০ টাকা আছে এবং গ ও ক এর একত্রে ৬০ টাকা আছে। কার কত টাকা আছে?

এই অংক দুটো কষে দেন না আপা?

খাতায় নজর দিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ইয়াসমীন বিষণ্ন কণ্ঠে বললো, না তো, এ অংক তো আমি পারবো না। এ যে কিভাবে কি করতে হবে—কিছুই বুঝতে পারছিনে।

আনজুম্ অসহায় কণ্ঠে বললো, তাহলে কি হবে আপা? কাল যে আমাকে ভীষণ পিটনি খেতে হবে!

ইয়াসমীন আরা বললো, তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে করে নে। আমি তো পারছিনে।

ঃ আপনি না পারলে এ বাড়িতে আর কার কাছে যাবো আপা? কে পারবে এ অংক?

ইয়াসমীনের দিকে কাঁদো কাঁদো নয়নে চেয়ে রইলো আনজুম। তা দেখে ফারুক মাহমুদ বললো, কারো কাছে যেতে হবে না। এতো অতি সহজ অংক। ক্লাশ টু-থ্রিতে করানো হয়। প্রথম অংকটার ঐ ৫০০ আর ১০০ কে যোগ করে ২ দিয়ে ভাগ আর বিয়োগ করে ২ দিয়ে ভাগ করলেই, উত্তর বেরিয়ে আসবে। সে হিসেবে এ দুইটি সংখ্যার একটি ৩০০ ও অপরটি ২০০-এটা পেয়ে যাবে।

রমিসা আনজুম্ বিপুল উল্লাসে বললো, এ্যাঁ! তাই?

ফারুক মাহমুদ বললো, হ্যাঁ, তাই। দ্বিতীয় অংকটার কাজ হচ্ছে ঃ ঐ ৫০, ৭০, আর ৬০-এই তিনটে সংখ্যা যোগ করে ২ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফল যা পাওয়া যাবে তা থেকে ক ও খ এর ৬০ টাকা বাদ দিলে গ এর টাকা পাওয়া যাবে। খ ও গ এর ৭০ টাকা বাদ দিলে ক এর টাকা পাওয়া যাবে এবং ক আর গ এর ৬০ টাকা বাদ দিলে খ এর টাকা পাওয়া যাবে।

বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে ইয়াসমীন আরা সরবে বললো, সেকি-সেকি! এই ভাবে করতে হবে এ অংক?

ফারুক মাহমুদ স্মিতহাস্যে বললো, জি। ঐ ৫০, ৬০, ৭০ তিনটি সংখ্যা যোগ করলে হবে ১৮০। একে ২দিয়ে ভাগ করলে হবে ৯০। এই ৯০ থেকে ক ও খ এর ৫০ টাকা বাদ দিলে যে ৪০ টাকা পাওয়া যাবে, সেটা গ এর টাকা। খ ও গ এর ৭০ টাকা বাদ দিলে যে ২০ টাকা থাকবে, সেটা ক এর টাকা। এই ভাবে ক ও গ এর ৬০ টাকা বাদ দিলে যে ৩০ টাকা পাওয়া যাবে, তা খ এর টাকা। অতএব উত্তর যথাক্রমে ২০, ৩০ ও ৪০।

ইয়াসমীন আরা একদম আওয়ারা বনে গেল। বললো, ওম্মা! কি সাংঘাতিক-কি সাংঘাতিক! একেবারে মুখে মুখে কষে ফেললেন অংক দুটো?

ফারুক মাহমুদ মৃদু হেসে বললো, খুব কঠিন অংক তো নয়। ঐ যে বললাম, ক্লাশ টু-থ্রির অংক? খুব সহজ অংক।

ঃ তাই বলে একদম মুখে মুখে হিসেব।

ঃ এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? আমি দোকানদার মানুষ। সওদাপাতি দিয়ে অনেক সময় মুখে মুখেই তো দামের হিসেব কষতে হয় আমাকে।

ঃ কি তাজ্জব-কি তাজ্জব। কি সাংঘাতিক রকমের আশ্চর্য বিষয়। বুঝতে পারছি। আপনি নির্ঘাত একজন সাংঘাতিক মানুষ। দিনে দিনে একি পরিচয় বেরিয়ে আসছে আপনার! প্রথম দেখার দিন সেরেফ একজন কুলিকামিন বা কারো বাড়ির গৃহভৃত্য বলে মনে হয়েছিল আপনাকে। তারপর দেখি, আপনি একটি ফিট্‌ফাট এক দোকানের একজন ভদ্র দোকানদার। দোকানদার থেকে হলেন কুরআন হাদিসের একজন বিরল

আলেম। হলেন নম্র-ভদ্র অত্যন্ত এক সৎ সজ্জন ব্যক্তি। আজ আবার দেখছি, অংকের এক মস্তবড় পণ্ডিত। দিনে দিনে আরো যে কত সাংঘাতিক পরিচয় বেরিয়ে আসবে আপনার—তা ভেবে আমি আর কূল করতে পারছিনে।

ইয়াসমীন আরা আবেগে উঠবোস্ করতে লাগলো। হাতে হাত ঘষতে লাগলো। অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইলো ফারুক মাহমুদ। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটতেই রমিসা আনজুম্ বললো, এই আপা, হুজুর যে কিছুই খাচ্ছেন না। সব কিছু তো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে

খেয়াল করেই আর একদফা লাফিয়ে উঠলো ইয়াসমীন আরা। সীমাহীন আবেগ বিস্ময় চাপতে চাপতে ফারুক মাহমুদকে জোর করেই সেদিন অধিক পরিমাণ নাস্তাপানি খাইয়ে তবে ছাড়লো।

ইয়াসমীন আরার বিস্ময় সেদিনই শেষ হলো না। উত্তরোত্তর সেটা বাড়তেই লাগলো অতঃপর। কয়েকদিন পরেই আবার ঐ রকম আর এক ঘটনা ঘটলো। পাশের বাড়ির ক্লাশ নাইনের এক মেয়ে খাতা হাতে চলে এলো ইয়াস্মীনের কাছে। ড্রয়ীংরুমে বসে ফারুক মাহমুদ ও ইয়াসমীন আরা কথা বলছিল আন্জুমের পরবর্তী পাঠ্যক্রম নিয়ে। এই সময় ঐ মেয়েটি এসে ড্রয়ীংরুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তা দেখে ইয়াসমীন আরা বললো, কিছু বলবি নাকিরে হাফিজা?

হাফিজা নামের ঐ মেয়েটি ইতস্তত করে বললো, জি আপা, আপনার কাছেই এসেছিলাম। কিন্তু আপনি এখন ব্যস্ত আছেন মনে হচ্ছে।

ঃ না-না, কি আর ব্যস্ত। বল্ কি বলবি বল্?

ঃ হুজুরের সামনেই বলবো?

ঃ গোপনীয় কিছু না হলে বলবি। হুজুরের সামনে হলো তো কি হলো?

ঃ জিনা, গোপনীয় কিছু নয়। আমি আমার পড়ার ব্যাপার নিয়ে এসেছিলাম।

ঃ পড়ার ব্যাপার? কি ব্যাপার?

এই কারেক্শান কয়টা করতে পারছিনে আপা। ইংরেজী সেনটেনসের কারেকশান। অর্থাৎ, কারেক্ট্ দি ফলোয়িং—

ইয়াসমীন আরা বললো, কয়টা কারেকশান, পড়তো শুনি?

ঃ মাত্র পাঁচটা কারেকশান আপা। প্রশ্ন পত্রে যে কয়টা ছিল তার অন্য সবগুলো পেরেছি। কিন্তু এই পাঁচটা পারছিনে।

ঃ আচ্ছা পড়—

হাফিজা পড়তে লাগলো ঃ প্রথমটা হলো—"দি ম্যাটার ওয়াজ ইন্ফরম্ড্ টু দি পলিশ"। দ্বিতীয়টা হলো—"ইট ইজ এ ট্রু ফ্যাক্ট"। তৃতীয়টা হলো—"হি

ইন্‌সিস্টেড্ মী টু ডু দিস"। চতুর্থটা হলো—"মাই ফাদার হ্যাজ কাম ইয়েস্‌টারডে"। সর্বশেষটা হলো-"হি ওয়েন্ট টু হোম"।—এই পাঁচটা আপা।

হাফিজার হাত থেকে খাতাটা নিয়ে কিছুক্ষণ দেখার পর ইয়াসমীন আরা বললো, নারে সবগুলো তো পারবোনা। সেই কবে এসব করেছি। এর দুটো কারেকশান আমার জানা আছে, মানে আমি পারবো। একটা "মাই ফাদার হ্যাজ কাম ইয়েষ্টারডে" হবে না। হবে—"মাই ফাদার কেম ইয়েষ্টারডে"।

আর একটা—"হি ওয়েন্ট্ টু হোম" এর ঐ "টু" টা বাদ যাবে। হোমের আগে "টু" বসে না। এই দুটো ছাড়া আরগুলো তো পারবো না। মানে, ওগুলোর ভুলটা কোথায় তা ঠিক ধরতে পারছিনে। তোর ইংরেজীর স্যারকে দিয়ে করে নিস্।

হাফিজা খাতুন বিস্মিতকণ্ঠে বললো, সে কি আপা! আমাদের ইংরেজীর স্যার তো সেরেফ বি.এ.পাস লোক। আপনি বি.এ.অনার্স্ পাশ করে এম.এ.পড়েন। উনি পারবেন আর আপনি পারবেন না?

ইয়াসমীন আরা বললো, নারে হাফিজা উনি পুরানো লোক। আগেকার দিনের লেখাপড়া। তার দামই আলাদা। আমরা এ যুগে এম.এ.পড়লেও, সে শিক্ষা আর আমরা পেলাম কই? সত্যিকথা বলতে কি আমাদের এখনকার লেখাপড়া অনেকটাই ফাঁকিবাজী আর ডিগ্রীটাও অনেকটা ঐ নামকা ওয়াস্তে ডিগ্রী। স্যারেরা ক্লাশে আর পড়ানই না তেমন একটা। প্রাইভেট পড়ে যা হয়।

ঃ আপা!

ঃ আগেকার একজন ম্যাট্রিক পাশ লোক সব সাব্‌জেক্টে যেমন স্কয়্যার, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, এ যুগের এম.এ. ডিগ্রীধারীরা কি তেমনটি স্কয়ার? অনেকে দাঁড়াতেই পারেন না এ ম্যাট্রিক পাশের সামনে। না ইংরেজীতে, না বাংলায়, না ইতিহাস-ভূগোলে, না গ্রামারে-ব্যাকরণে।

হাফিজা খাতুন ফের বিস্মিতকণ্ঠে বললো, সেকি আপা! এই ব্যাপার?

ঃ অনেকটা এই-ই। তেমন শিক্ষকই কি আজকাল আছে আর যে, ছাত্রছাত্রীরা শিখবে। অল্প কিছু বিজ্ঞ আর দায়িত্ববান শিক্ষক ছাড়া, শিক্ষকদের অধিকাংশেই রংবাজ লোক। এখন সিংহভাগ শিক্ষকরাই রাজনৈতিক দলের প্রচণ্ডভাবে লেজুড়বৃত্তি করেন আর ধান্দার পেছনে ছুটে বেড়ান দিনরাত। পড়ানোর সময়ও নেই, অনেকের সে যোগ্যতা আর মানসিকতাও নেই। শিক্ষকদের এই সিংহভাগ যতটা না লেখাপড়ায় দড়ো, তার চেয়ে অধিক দড়ো কলহে আর ক্লীক্‌বাজীতে

ঃ আপা!

ঃ সে যুগে শিক্ষকদের মূল্যায়ন হতো বিদ্যা আর মেধার দ্বারা। এযুগে অধিক ক্ষেত্রে সেটা মূল্যায়ন হয় তাফালিং আর বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের ঢোল বাজানোর দ্বারা। বিদ্যার দ্বারা নয়। তাফালিং আর রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির

জোরে অযোগ্যেরা তরতর করে উপরে উঠে যায় আর যোগ্য ও বিজ্ঞজনেরা অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেন।

ঃ আর ছাত্রেরা?

ঃ তাদের কথা তো বলাই চলে না। শতকরা দশজন আসে লেখাপড়া শিখতে আর নব্বুইজন আসে নেতা হতে আর রোজগার করতে। দুর্মরভাবে রাজনৈতিক দলের পাণ্ডাগিরি করে ছাত্রাবস্থাতেই তারা বাড়ি-গাড়িসহ কোটিপতি হতে চায়। পূঁজি তাদের শুধুমাত্র পেশীশক্তি। কিছু ধরাবাঁধা রাজনৈতিক বুলি ছাড়া মাথাটা একদম ফাঁকা। একমাত্র ভরসা যে, এহেন পরিস্থিতিতেও অল্প কিছু ছাত্র সত্যিকারের শিক্ষালাভ করে আর করার চেষ্টা করে। নইলে জাতিটা এতদিনে একেবারেই দেউলিয়া হয়ে যেতো।

ঃ আপা।

www.boighar.com

ঃ এই হলো শিক্ষাক্ষেত্রে চলমান অবস্থা। আগেকার মতো অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষা আমরা পাবো কোত্থেকে? অতিশীঘ্র ছাত্র-শিক্ষকদের এই রাজনীতির ব্যবসা বন্ধ করা না হলে, যেটুকু ভরসার আলো দেখা যাচ্ছে, অচিরেই তা দপ্ করে নিভে যাবে।

নীরব শ্রোতা হয়ে ফারুক মাহমুদ এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে ইয়াসমীনের কথাগুলো শুনলো। এই পর্য্যায়ে এসে সে আর চুপ্ থাকতে পারলো না। অকস্মাৎ সশব্দে বলে উঠলো—কারেকট্, হান্ড্রেড্ পারসেন্ট কারেকট্! সাবাস ম্যাডাম, সাবাস্। থ্যাংক ইউ-থ্যাংক ইউ!

ইয়াসমীন আরা চমকে উঠে বললো, এ্যাঁ!

ফারুক মাহমুদ বললো, আপনার এই উপলব্ধি আর জ্ঞানের গভীরতা দেখে আমি যারপরনাই মুগ্ধ হয়ে গেছি। একেবারেই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন আপনি। আপনাকে মোবারকবাদ জানাই।

ইয়াসমীন আরা হাসিমুখে বললো, তাই?

ফারুক মাহমুদ বললো, জি ম্যাডাম। আপনার জ্ঞান গরিমা আর বিদ্যাবুদ্ধি দেখছি মোটেই সাধারণ পর্যায়ের নয়, অনেক উচ্চ পর্যায়ের। আপনিও ক্রমেই অবাক করছেন আমাকে।

ঃ সেকি! হঠাৎ ফুলাচ্ছেন যে বড়?

ঃ মোটেই না-মোটেই না। তেমন কোন দুরভিসন্ধিই নেই আমার। আমি সত্যি বলতেই ভালবাসি।

হাফিজার দেরী হয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, আমি তাহলে যাই আপা। খাতাটা দিন। দেখি ঐ তিনটে কারেক্শান আবার কাকে দিয়ে করিয়ে নেয়া যায়। দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই—

এ প্রসঙ্গ খেয়ালে আসতেই ফারুক মাহমুদ বললো, অনুমতি দিলে আমি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

সবিস্ময়ে মুখ তুলে ইয়াসমীন আরা বললো, চেষ্টা করে মানে? কি চেষ্টা করে দেখতে পারেন?

ফারুক মাহমুদ বললো, ঐ তিনটে কারেকশান। অত্যন্ত কমন ব্যাপার কিনা। অতি সাধারণ কারেকশান। খুব উচ্চ পর্যায়ের পরীক্ষায় না হলেও, এ সব কারেকশান হর হামেশাই নানা পরীক্ষায় আসে।

দমবন্ধ করে ইয়াসমীন ফের প্রশ্ন করলো—হর হামেশাই আসে? আপনি তা জানেন?

ঃ জানিই তো।

ঃ করতে পারবেন কারেকশান গুলো?

ঃ ঐ যে বললাম, অনুমতি দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ঃ তাজ্জব! তাহলে করুন তো দেখি চেষ্টা। "দি ম্যাটারওয়াজ ইন্‌ফর্‌ম্‌ড্ টু দি পুলিশ"—এর কারেকশান কি হবে?

ফারুক মাহমুদ বললো, ম্যাটারকে কোন কিছু ইন্‌ফর্ম্ করা হয় না। ইনফর্ম্ করা হয় পুলিশকে। কাজেই, কারেকশানটা হবে-"দি পুলিশ ওয়াজ ইন্‌ফর্ম্‌ড্ অফ দি ম্যাটার"।

বিস্ময়ে এবার ফেটে পড়লো ইয়াসমীন আরা। কলকণ্ঠে বলে উঠলো—এ্যাঁ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো-তাইতো! কি তাজ্জব-কি তাজ্জব! সত্যিই তো এইটেই এর কারেকশান। তাহলে দ্বিতীয়টা? মানে—"ইট ইজ এ ট্রু ফ্যাক্‌ট্"—এটার কারেকশান কি হবে, বলুন তো?

ফারুক মাহমুদ বললো, এটা হবে, "ইট ইজ এ ফ্যাক্‌ট্" কিংবা "ইট্ ইজ্ ট্রু"। ফ্যাক্‌ট্ এবং ট্রু এক সাথে হবে না।

উল্লসিত হয়ে উঠে ইয়াসমীন আরা বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক-ঠিক। এবার মনে হয়েছে। এইটেই এর কারেকশান। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। অনেকদিন আর চর্চা নেইতো। আচ্ছা, তারপর এইটে-"হি ইন্‌সিস্টেড্ মী টু ডু দিস্"-এর কারেকশান কি হবে?

ঃ আমার উপর নয়, ইন্‌সিস্টটা হচ্ছে আমার করাটার উপর। কাজেই, এটার কারেকশান হলো—"হি ইন্‌সিস্টেড্ অন মাই ডুয়িং দিস্"।

হাফিজার খাতা হাফিজার হাতে দিয়ে আকুলি বিকুলী করে ইয়াসমীন আরা বলতে লাগলো—সোবহান আল্লাহ্! একি বিস্ময়। একি কাণ্ড! আপনি এতবড় একজন পণ্ডিত! এতবড় শিক্ষিত লোক! ইংরেজী, অংক, আরবী—সব কিছুতেই এতটা জ্ঞান আপনার? না-না, আর ছেড়ে কথা নেই। আজ আপনাকে বলতেই হবে, আপনি আসলে কি? কি আপনার পরিচয়।

ঃ পরিচয় আবার কি? আমি একজন দোকানদার।

ঃ না, কখখনো নয়। ওটা আপনার পরিচয় নয়। আজ আপনাকে বলতেই হবে আপনি কি পাশ! মানে, আপনার লেখাপড়া কতখানি!

ঃ কতখানি কি রকম? বেশি খানি তো নয়

ঃ মিথ্যা কথা। বেশি খানি না হলে আর মস্তবড় বিদ্বান ব্যক্তি না হলে, অল্ সাব্‌জেক্টে এমন স্কয়্যার হলেন আপনি কি করে?

ঃ এর জন্যে মস্তবড় বিদ্বান হওয়া লাগবে কেন? ঐ যে আপনি বললেন, এ যুগের কিছু ছাত্র সত্যিকারের লেখাপড়া শেখে? মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া শিখলে একজন ম্যাট্রিক পাশ লোকও অল্ স্কয়্যার হতে পারে?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা পারে। আপনি কি তাহলে একজন ম্যাট্রিক পাশ লোক?

ঃ ঐ আর কি! ঐ রকমই একটা কিছু ধরে নিতে পারেন। তবে মস্তবড় বিদ্বান লোক মনে করলে আত্ম প্রবঞ্চনাই করা হবে আপনার। নিজেই ঠকে যাবেন নিজের কাছে। বড় পণ্ডিত হওয়া সহজ কথা নয়।

ঃ কিন্তু—

ঃ কিন্তুর কোন কারণ নেই। আমার বিদ্যার পরিমাণ আসলেই বিরাট কিছু নয়। বিদ্যা আমার অল্পই।

বিশেষ কিছু না বুঝেই এই সময় হাফিজা খাতুন বলে উঠলো তা হোক-তা হোক। আপনি আমার মস্তবড় উপকার করলেন। এই কারেকশানগুলো করে নেয়ার জন্যে অন্য কোথাও দৌড়াদৌড়ি করতে হলো না আমার আর।

ফারুক মাহমুদ স্মিতহাস্যে বললো, বুঝতে পেরেছো তুমি?

ঃ জি-জি। এখন নিজেই আমি করতে পারবো। আর কোন অসুবিধে হবে না।

ঃ গুড্।

ঃ আপনি আমার স্যারের মতো। স্যারের মতোই কাজ করলেন। আপনাকে একটু সালাম করি স্যার—

বলেই হাফিজা ফারুক মাহমুদের পায়ে হাত দিতে গেল। ফারুক মাহমুদ চমকে উঠে সরে দাঁড়িয়ে বললো, এই করো কি-করো কি? পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে হয় না। মুখে আস্‌সালামু আলাইকুম বললেই সালামের কাজ হয়ে যায়।

এই সময় ভেতর থেকে ইয়াসমীনের আম্মা খুব ব্যস্তকণ্ঠে ইয়াসমীনকে ডাকাডাকি শুরু করায় ইয়াসমীন আরা বিব্রত কণ্ঠে বললো, উঃ! কি জ্বালা, আম্মার আবার হলো কি?

অতঃপর সে ফারুক মাহমুদ আর হাফিজাকে লক্ষ্য করে বললো, আচ্ছা, আপনারা আজ আসুন। আয়রে হাফিজা। পরে আবার আসিস। আমি দেখি—আম্মার এত তাকিদ কিসের?

বলেই ব্যস্তভাবে ইয়াসমীন আরা অন্দরে চলে গেল।

৬

মনোয়ার হোসেন এখন বেশ ঘন ঘনই ফারুক মাহমুদের দোকানে এসে বসে। গল্প করে, আলাপ করে আর হাসি-মস্করার মধ্যে দিয়ে অনেক সময় কাটিয়ে যায়। রাজনৈতিক অর্থাৎ দলীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে ফাঁক পেলেই সে আর কোথাও যায় না। মনটা তাজা করে নেয়ার জন্যে সরাসরি চলে আসে দোস্ত ফারুক মাহমুদের দোকানে আর চুটিয়ে আড্ডা মারে।

www.boighar.com

আজও তাই এলো। আলাপের শুরুতেই আজ বললো, তোর হলোটা কি, বল্ তো? এতদিন হলো এই শহরে এসে তুই রইলি, আর একটা দিনও আমার বাড়িতে গেলিনে?

ফারুক মাহমুদ লজ্জিত কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, কথাটা তোর ঠিক। এর যোগ্য জবাব আমার নেই।

ঃ নেই কেন?

ঃ সেটা আর কি বলবো? প্রায়ই যাবো যাবো করি কিন্তু শেষমেশ আর হয়ে ওঠে না। একটু অফ্ সাইডে তোর বাড়ি কিনা। ওদিকে কাজ কাম তেমন না থাকায় বড় একটা যাওয়াই হয় না ওদিকে।

ঃ যাওয়াই হয় না কি রকম? এই সেদিনও তো বিকেলে তোকে দেখা গেছে ওদিকে।

ঃ ওদিকে? ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেদিন গিয়েছিলাম মানে, ঐ কোর্টের দিকে গিয়েছিলাম একটু।

ঃ কোর্ট থেকে কি আমার বাড়ি অধিক দূরে?

ঃ না, তা নয়। তবে খুব ব্যস্ত ছিলাম বলে সময় করতে পরিনি।

ঃ ব্যস্ত ছিলি? কোর্টে তোর কি এত ব্যস্ততা?

ঃ না, ঠিক কোর্টে নয়। কোর্ট-আদালতের প্রাঙ্গনে আমি তেমন যাইনে। আমি ব্যস্ত ছিলাম উকিল পাড়ায় আর কি।

ঃ উকিল পাড়ায়? তা উকিলপাড়াতেই বা কি কারণে? মামলার বিষয় নিয়ে?

ঃ হ্যাঁ, ঐ ব্যাপারই আর কি!

ঃ তাজ্জব! এই শহরে তোর আবার মামলা এলো কোত্থেকে? নতুন মানুষ তুই এখানে! তোর আবার মামলা কি রকম?

একটু চিন্তা করে মনোয়ার হোসেন ফের বললো, ও, বুঝেছি-বুঝেছি। তোর শ্বশুরের ঐ মামলা, তাই না?

ফারুক মাহমুদ সবিস্ময়ে বললো, এ্যাঁ! শ্বশুরের মামলা কেমন? আমার আবার শ্বশুর এলো কোত্থেকে?

হো-হো করে হেসে উঠে মনোয়ার হোসেন বললো, স্যরি-স্যরি! আজকাল আমার সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। একটার সাথে আর একটা গুলিয়ে ফেলি। তোর হবু শ্বশুর বলতে শ্বশুর বলে ফেলেছি।

ঃ হবু শ্বশুর! সেটাই বা পেলি কোথায়?

ঃ কেন, ঐ তো ঐ বাড়িতে

ঃ ঐ বাড়িতে কে?

ঃ কে আবার ইয়াসমীন সাহেবার আব্বা।

ঃ তবেরে! উনি আমার হবু শ্বশুর?

ঃ নয়তো কি! ঐ ইয়াসমীন বিবিকে ছাড়া তুই আর অন্য কোথাও শাদি করতেও পারবিনে আর ওঁরাও তোর মতো পাত্র কখনই হাতছাড়া করবেন না। কাজেই হবু শ্বশুর বলবো নাতো কি বলবো?

ঃ ব্যস্ হয়ে গেল! তোর এই আজগুবী খেয়ালের হেতু?

ঃ খেয়াল? খেয়াল হবে কেন? এটা তো বাস্তব। আমিও তা বাস্তব চোখেই দেখতে পাচ্ছি। তুই যেভাবে গেঁথে গেছিস্ ইয়াসমীন বিবির আঁচলের সাথে, তাতে আর তোর বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। ওদিকে আবার ওঁরা যদি একবার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে, তুই একজন ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট। আইমীন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলি এর আগে, তাহলে পলুই দিয়ে বোয়াল মাছ চেপে ধরার মতো তোকে এমন ভাবে চেপে ধরবেন ওঁরা যে, শাদি কবুল না করা পর্যন্ত তোকে আর বের করবেন না পলুই এর তলে থেকে।

ঃ সাব্বাস্! তাহলে শাদিটা আমার হয়েই যাচ্ছে, না কি বলিস্।

ঃ বলবো আবার কি? আমি তো দেখতেই পাচ্ছি। ঐ পরিবারের প্রতিটি কাজে তোর এই মনোযোগ দেখেই বুঝতে পারছি—শাদিতে আর দেরী নেই।

ঃ ঐ পরিবারের কাজে! সেটা আবার কি?

ঃ তুই উকিল পাড়ায় গিয়েছিলি, বল্লি, নে?

ঃ হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

ঃ নিশ্চয়ই মামলার ব্যাপার নিয়ে?

ঃ হ্যাঁ, তাই বলতে পারিস।

ঃ ঐ স্বত্বের মামলা নিয়ে, মানে তোর হবু শ্বশুরের ঐ যে একটা স্বত্বের মামলা চলছে কোর্টে—ঐ মামলা নিয়েই তো? এই বাড়িঘর আর মিলকারখানা নিয়ে তোর হবু শ্বশুরের যে মামলা সেই মামলা, ঠিক নয়?

ঃ না, হবু শ্বশুর কথাটা ঠিক নয়। তবে মামলাটা যে সেইটেই—এটা ঠিক।

ঃ তবে? তবে যে বড় পাঁয়তারা করছিস? ও বাড়ির কাজকর্মে রীতিমতো সহায়তা করতে শুরু করেছিস্ আর লুকোচ্ছিস্ আমার কাছে? বেঈমান কাঁহাকার!

ঃ মনোয়ার।

কণ্ঠে জোর দিয়ে মনোয়ার হোসেন বললো, মেয়ের বাপের মন জয় করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিস্—এটা সত্যি কি না, বল্?

ঃ না-মানে-কথা হলো—

ঃ কথা কিরে? এর মধ্যে অন্য আর কি কথা আছে?

একটু থেমে থেকে ফারুক মাহমুদ সুর বদল করে বললো, এ্যাঁ! হ্যাঁ-হ্যাঁ। মানে কথা হচ্ছে, ঠিকই আর অন্য কোন কথা নেই। তুই ঠিকই ধরেছিস্।

ঃ ঠিক ধরিনি?

ঃ বিলকুল ঠিক। তুই যা ধরেছিস্ তা কি মিথ্যা হতে পারে? একদম মোক্ষম ধরা ধরেছিস্।

ঃ কি বলতে চাস্?

ঃ তোর ধারণা অভ্রান্ত। ঐ ইয়াসমীন আরার বাপের মনটা জয় করার চেষ্টা করাটা আমার একান্ত প্রয়োজন। তাঁর বাড়িতে আছি। তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে তুলতে পারলে আমার অনেক লাভ। বিশেষ করে ইয়াসমীনের প্রশ্নটাও যেখানে আছে। তোর কাছে আর লুকাবো না।

ফারুক মাহমুদ মাথা নীচু করে হাসতে লাগলো। মনোয়ার হোসেন বললো, হ্যাঁ, পথে আয়। তা চাঁদ, উকিলের কাছে গিয়ে কি সহায়তা করে এলি?

ঃ মামলার আগামী তারিখটা জেনে এলাম।

ঃ তোর ঐ হবু শ্বশুর কি তা জানতে তোকে বলেছিলেন? মানে, ঐ তলবদার সাহেব?

ঃ না, উনি আমাকে সরাসরি বলেননি। তারিখটা জেনে আসার জন্যে উনাকে তাঁর চাকর ইরফান মিয়াকে বলতে আমি শুনেছিলাম। ঐ কথা শুনে আমি নিজ গরজেই গিয়ে জেনে এলাম। ইরফান মিয়া চাকর মানুষ। তার মনে না থাকে যদি?

ফের হাসতে লাগলো ফারুক মাহমুদ। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মনোয়ার হোসেন বললো, মারহাবা-মারহাবা! এ না হলে জামাই?

ঃ তা জামাই হই আর না হই, তাঁর বাড়িতেই থাকি, তাঁর একটু মন যুগিয়ে না চললে কি চলে?

ঃ ঠিক-ঠিক, বিলকুল ঠিক। ও নিয়ে আমার আর আগ্রহ নেই। তবে এরপর আবার যখন ঐ উকিল পাড়ায় যাবি—তখন যদি আমার বাড়িতে না যাস্। তাহলে কিন্তু খবর আছে।

ঃ খবর আছে?

ঃ নির্ঘাৎ। হয় তোরই একদিন, কি আমারই একদিন।

ঃ ওরে বাপ্‌রে! তাহলে তো ওনিয়ে এখনই ভাবতে হয়। না-না, তাহলে আর অতদিন অপেক্ষা করতে চাইনে। এই সপ্তাখানেকের মধ্যেই তোর বাড়িতে যাবো। জান বাঁচানো ফরজ কাজ।

ঃ এ্যাঁ! যাবি?

ঃ একদম পাকা সিদ্ধান্ত।

ঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ। তাহলে এক কাজ করনারে? আগামীকালই চলে আয়। আগামীকাল পার্টির কোন প্রোগ্রাম নেই। একদম ফ্রি আছি আগামীকাল।

ঃ এ্যাঁ! আগামীকাল? ওহো তোকে বলাই হয়নি—আগামীকাল জরুরী ভিত্তিতে আমাকে একটু বাড়ি যেতে হচ্ছে। আগামীকাল নয়। বাড়ি থেকে এসে তার পরের দিনই তোর বাড়িতে যাবো আমি ইনশাআল্লাহ।

মনোয়ার হোসেন হতাশ কণ্ঠে বললো, এ্যাঁ! বাড়ি যাবি আগামীকাল?

ঃ হ্যাঁ, জরুরী এক কাজে।

ঃ কি কাজে?

ঃ কাজ মানে বৈষয়িক এক ব্যাপার। মস্তবড় এক বৈষয়িক জটিলতা নিয়ে আছি আমি অনেকদিন যাবত।

ঃ কৈ, সে কথা তো আগে কখনো বলিস্‌নি?

ঃ বলিনি মানে, বলবো—বলবো করে বলা হয়নি। যে নাড়ীপাত্‌লা লোক তুই, পাঁচ কান হয়ে যেতে পারে—এই ভেবেই বলিনি।

মুখ তুলে চেয়ে রইলো মনোয়ার হোসেন। সবিস্ময়ে বললো, কেন, গোপনীয় ব্যাপার নাকি?

ঃ হ্যাঁ যথেষ্ট গোপনীয়।

ঃ এখনও কি তাহলে সেই গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাস্? বলতে চাস্‌নে আমাকে?

ঃ না, বলবো। বাড়ি থেকে ফিরে এসেই বলবো তোকে। বাড়িতে গিয়ে সমস্যার কোন সহজ সমাধান না পেলে তো বলতেই হবে তোকে। তোর সাহায্য দরকার হবে জরুর।

ঃ বেশ, তাহলে ফিরে এসেই বলিস্। আমি অপেক্ষায় থাকবো।

ঃ না-খোশ্ হলি?

ঃ না-না, তোর পারিবারিক বা বৈষয়িক ব্যাপার তুই ইচ্ছে করে না বললে তা নিয়ে আমি ব্যস্ত হবো কেন? আমি বরং তোকে একটা কথা বলার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছি এখন।

ঃ একটা কথা? কি কথা?

ঃ কথাটা আমার ঠিক এই মুহূর্তের নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই এই কথাটা আমি ভাবছি। ভাবছি, এইভাবে তুই আর ভেসে বেড়াবি কতদিন? আজীবন তো এইভাবে

চলবে না। তাই আজ আমার কথা, মানে সাজেশান হলো, বাড়িতে গিয়ে তামাম জটিলতার সমাধান করে হয় তুই ঐ বাড়িতেই সেটেল্ হ', নয় ওখানকার সব কিছুর বিলি বন্দোবস্ত শেষ করে এসে তুই এই ঢাকাতেই স্থায়ী হয়ে বস্। এই ভাড়াটে বাড়িতে না থেকে নিজের বাড়ি তৈয়ার কর। অথবা তৈরী কোন বাড়ি কিনে ফ্যাল্। অর্থকড়ির তো খুব একটা অভাব নেই তোর।

ঃ মনোয়ার!

ঃ এইটে একটা জীবন নাকি? খেয়াল হলো আর অম্নি হুট্ করে হাকিমী চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে দোকান খুলে বস্লি। বস্লি বস্। দায়-দায়িত্ব হীন খেয়ালী মানুষ তুই খেয়াল চরিতার্থ করলি কর! কিন্তু এইভাবে আর কতদিন? খেয়াল চরিতার্থ করে সারাজীবন চলে না। প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার গরজ অল্পদিনেই প্রকট হয়ে ওঠে। আমি মনে করি, প্র্যাক্টিক্যাল হওয়ার প্রচণ্ড গরজটা তোর আর অধিক দূরে নয়।

ঃ তাই? তাহলে তুই কি বলছিস্?

ঃ আমি বলছি, ঐ মফস্বল শহরে যদি মন তোর না টিকে, নিজের বাড়িঘর করে তুই স্থায়ী হয়ে বসে যা এখানে। এরপর দেখেশুনে কোন চাকরী বাকরীতে ঢুকে পড়ু, নয় বড় রকমের দোকানপাট তথা ব্যবসাপাতি খুলে বস্। একি এক মিস্কীন্মার্কা দোকান খুলে বসে আছিস্ ফেলু ফকিরের মতো?

ঃ মনোয়ার।

www.boighar.com

ঃ ভবিষ্যৎ চিন্তা বলে কি তোর কিছুই নেই? এই যে এখন নীবিড়ভাবে প্রেম প্রেম খেলা শুরু করেছিস্, আজ বাদে কালই যদি ঐ ইয়াসমীন বিবি ঝুলে পড়ে তোর গলা ধরে, তাকে নিয়ে এসে কোথায় উঠবি, বল্? চলবি কি করে? বউ নিয়ে কি এই ভাড়াটে কবুতরের খোপে এসে উঠবি আর এই খুদে দোকানের আয় দিয়ে বউকে খুদ কিনে খাওয়াবি? ভবিষ্যৎটা একটুও ভেবে দেখবিনে এখনও?

ফারুক মাহমুদ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, দেখছিরে মনোয়ার, ভবিষ্যৎটা গভীরভাবেই ভেবে দেখছি আমি। ইয়াস্মীন বিবির ব্যাপার নিয়ে তোর ঐ খোয়াবে কোন গুরুত্ব আমার না থাকলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববোনা, এতবড় নাদান তো নই আমি। বাড়ি থেকে ফিরে আসি। এরপর এই ভবিষ্যৎ নিয়েই আমি তোর সাথে বিস্তারিত আলোচনায় বসবো।

ঃ হ্যাঁ তাই বস্। বসা তোর উচিত।

ঃ ঠিকই বসবো-ঠিকই বসবো।

ঃ বেশ। বাড়ি তো যাবি, তোর এই দোকান চালাবে কে? কদর আলী?

ঃ না। কদর আলীকে সাথে নিয়েই যেতে হবে। হঠাৎ একা গেলে, ওখানে আমাকে সর্বক্ষণ সার্ভিস্ দেবে কে? তেমন কোন লোক তো ঠিক করা নেই।

ঃ তাতো বুঝলাম, কিন্তু তোরা দুইজনই গেলে তোর এই দোকান আর ঘরদুয়ার দেখবে কে?

ঃ দোকান আর ঘর দুয়ারে তালা লাগিয়ে যাবো।

অল্প দিনের ব্যাপার। ঐ ইরফান মিয়ার সাহায্যে পাহারা দেয়ার লোক যোগাড় করে ফেলেছি। এর উপর, ঐ ইরফান মিয়াও নজর রাখবে নিজে। এনিয়ে কোন চিন্তা নেই।

মনোয়ার হোসেন বললো, না থাকলেই ভাল।

অল্পদিনের নাম করে গেলেও কদর আলীসহ ফারুক মাহমুদের ফিরে আসতে এক পক্ষকাল লাগলো। পাক্কা পনের দিন পরে আবার তারা ফিরে এলো ঢাকায়। নসীব ভাল বলেই ঘরবাড়ি আর দোকানপাট অক্ষতভাবেই পেলো তারা। ইরফান মিয়ার ঈমানদারীর বদৌলতে ক্ষতি হয়নি কোন রকম, খোয়া যায়নি কোন কিছুই।

ফিরে এসে নাওয়া খাওয়া আর বিরাম বিশ্রামের পর দোকানে বসে ফারুক মাহমুদ ভাবতে লাগলো, মনোয়ার যে এর মধ্যে আর কতবার এসে ফিরে গেছে, কে জানে। অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো'—এ কথা বলে যাওয়াটা তার ঠিক হয়নি। জটিল কাজ নিয়ে যাওয়া যেখানে, সেখানে বেশিদিনও যে লাগতে পারে—এ চিন্তাটা না করা তার উচিত হয়নি। ভাবতে লাগলো, এবার আর নিস্তার নেই। এবার যেতেই হবে মনোয়ারের বাড়িতে। আজই যদি এসে পড়ে সে, তাহলে আগামীকালই যেতে হবে তার ওখানে। এ্যাড্‌ভান্স্ ওয়াদা করা আছে। কোন অজুহাতই আর খাটবে না।

ভাবনাটা শেষ হলো না ফারুক মাহমুদের। এরই মধ্যে চলে এলো মনোয়ার হোসেন। কিন্তু আসাটা তার স্বাভাবিক ছিল না। বরাবর মনোয়ার হোসেন যেভাবে আসে, আজ তার আসাটা ছিল একেবারেই অন্যরকম। নীরবে এসে সে নীরবে বসে পড়লো ফারুক মাহমুদের পাশের চেয়ারে। চোখমুখ তার শুকনো। চিন্তার ভারে মাথাটা অবনত। বরাবরের সে উৎফুল্লতার লেশমাত্র তার মধ্যে নেই। সালামটা দিতেও আজ ভুলে গেল মনোয়ার। কেমন যেন একটা সংকোচভাব আর অপরাধবোধ তাকে ন্যুব্জ করে রেখেছে।

এটা লক্ষ্য করে যারপরনাই বিস্মিত হলো ফারুক মাহমুদ। শংকিতকণ্ঠে মনোয়ারকে প্রশ্ন করলো-ব্যাপার কি বল্‌তো? কি হয়েছে তোর? এমন দেখাচ্ছে কেন তোকে?

খপ্ করে ফারুকের দুইহাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মনোয়ার হোসেন অপরাধীর কণ্ঠে বললো, আমাকে মাফ করে দে ফারুক। আমি মস্তবড় অপরাধ করে ফেলেছি, তুই আমাকে মাফ করে দে।

আরো অধিক বিস্মিত হয়ে ফারুক মাহমুদ বললো, সে কি! অপরাধ করেছিস্ কি রকম?

ঃ মস্তবড় অপরাধ করে ফেলেছি। আগে তুই বল্, আমাকে মাফ করে দিচ্ছিস্ কিনা?

ঃ তাজ্জব! কি অপরাধ করেছিস্ তা জানলামই না, মাফ করার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে?

ঃ ভাইরে, কি বলবো? সে কথা বলতেই যে সাহস হচ্ছে না আমার।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আমি শাদি করে ফেলেছি।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে ফারুক মাহমুদ ফের প্রশ্ন করলো—কি বললি?

ঃ তোকে না জানিয়ে, তোকে দাওয়াত না করে আমি শাদি করে ফেলেছি।

ফারুক মাহমুদ খোশকণ্ঠে বললো, মনোয়ার!

মনোয়ার হোসেন বলেই চললো—তোকে বাদ দিয়ে একা একাই শাদি করবো আমি, আমার বিয়ের বরযাত্রী তুই হবিনে, একি কখনো ভাবা যায়? তার উপর, তুই যখন এই ঢাকাতেই সশরীরে উপস্থিত?

ঃ আরে তা হলোই বা-হলোইবা। তা ছাড়া, বাস্তবেই তো ঢাকাতে আমি ছিলাম না।

ঃ আমি তিন তিন দিন ধরে তোর দোকানে এলাম। অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে আসবি বলে গেলি তো একেবারে লাপাত্তা হয়ে গেলি। এতে করে তোকে দাওয়াত না করার আর তোকে সাথে না নেয়ার এই অপরাধে পড়তে হলো আমাকে। অর্থাৎ এই অপরাধ করতে বাধ্য হলাম আমি।

ফারুক মাহমুদ এসব কথায় কান না দিয়ে বললো, আরে কি আশ্চর্য! তুই শাদি করে ফেলেছিস্? কবে? কি ভাবে?

ঃ আগে বল্, তুই আমাকে মাফ করে দিতে পারছিস্?

ঃ দূর-দূর! মাফ করার কি আছে এখানে? শাদি যদি তুই করেই থাকিস্ আর সেইভাবেই শাদিটা যদি জুটে থাকে, তাহলে একশোভাগ তুই ঠিক করেছিস। হায়াত মউতের মতো শাদিটাও একটা নসীরেব ব্যাপার। কখন, কোথায়, কার সাথে কার শাদি হবে এ কথা তো আগে কেউই বলতে পারে না।

মনোয়ার ফের আবেগভরে বললো, তুই ঠিক ধরেছিস্ ফারুক, একদম আসল জায়গায় হাত দিয়েছিস। শাদির দুটো দিন আগেও আমি জানতাম না যে, আমি শাদি করছি বা শাদি হচ্ছে আমার। হঠাৎ এমন ভাবে শাদিটা জুটে গেল পছন্দমতো মেয়ে আর ঘর পাওয়ার সাথে যোগাযোগটা এমন ভাবে ঘটে গেল যে. আমার আত্মীয় স্বজন আর অভিভাবকদের কিছুতেই থামিয়ে রাখা গেল না।

ঃ তাই নাকি? বেশতো। সে তো খুব ভাল কথা। ভাল ঘরের ভাল মেয়ে পাওয়া তো এ যুগে আসলেই একটা কঠিন ব্যাপার।

কৈফিয়ত দিয়েই চললো মনোয়ার হোসেন। বললো, আমি এত করে সবাইকে বললাম, দু'টো দিন অপেক্ষা করো, আমার এমন একজন বন্ধু এই শহরে আছে যাকে ফেলে আর না জানিয়ে শাদি করলে চিরকাল আমি তার কাছে অপরাধী হয়ে থাকবো। এই মুহূর্তে সে এখানে নেই, দু'তিন দিনের মধ্যেই সে এসে পড়বে। কিন্তু আমার অভিভাবক আর আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ তা মানলেন না। সবাই বললেন, শাদির অনুষ্ঠান তো একদিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। জুটে যখন গেছে তখন কলেমাটা আজই হয়ে যাক। অলিমা, অর্থাৎ খানা পিনার অনুষ্ঠানটা না হয় দু'দিন পরেই করা যাবে। সে অনুষ্ঠানে তুমি তোমার দোস্তকে দাওয়াত করে এনো।

ঃ ঠিকই তো-ঠিকই তো। তারা তো অন্যায় কিছু বলেননি।

ঃ আমার চাপে দুইদিনের জায়গায় অলিমার দিনটা আরো দুই দিন, মানে চারদিন পরে ধার্য করা হলো। কিন্তু আমার বদনসীব, তখনও তুই ফিরে এলিনে ঢাকায়।

ফারুক মাহমুদ এবার লজ্জিত কণ্ঠে বললো, আমি খুব অসুবিধায় ছিলামরে। আগ্রহ থাকা সত্বেও তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারলাম না।

ঃ সবই আমার তকদীর। আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র অভাব না থাকা সত্বেও চিরদিনের মতো তোর কাছে আমি অপরাধী হয়ে রয়ে গেলাম।

মনোয়ারের কণ্ঠে আফসোস্ ঝরে পড়লো। ফারুক মাহমুদ ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আহহা, এ তুই কি বলছিস্? এমনটি বলছিস্ কেন? এতে তোর অপরাধ কোথায় আর কসুরটাই বা কি?

ঃ তোকে ছেড়ে শাদি করলাম, কসুর তো আমার এখানেই। এতে তো তোর জরুর নাখোশ হওয়ার কথা। আমি হলেও নাখোশ হতাম।

ঃ তুই হলে হতে পারিস। আমি কিন্তু মোটেও নাখোশ হইনি।

ঃ হোস্নি?

ঃ না। সব কিছুর উপর হাত থাকে না মানুষের।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। তুই বুঝতে পেরেছিস তাহলে?

ঃ অফ্কোর্স। আরে এতদিন পরে, অর্থাৎ শাদির বয়সটা ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই যে শাদিটা হয়ে গেল তোর, এইটেই তো একটা চরম আনন্দের আর পরম খুশির ব্যাপার। আমি নাখোশ হবো কেন? শুনে তো আমার বুকটা ভরে যাচ্ছে আনন্দে।

ঃ সত্যি? তুই তাহলে খুশি হয়েছিস।

ঃ জব্বোর-জব্বোর। সেরেফ খুশিই হইনি, এর সাথে একটা অন্যরকম অনুভূতিও পয়দা হচ্ছে দীলে আমার।

ঃ অন্যরকম অনুভূতি?

ঃ হ্যাঁ। বয়সটা তো কম হয়নি আমারও। তোর মতো হঠাৎ করে আমারও শাদিটা যদি হয়ে যেতো এইভাবে!

এতক্ষণে হেসে ফেললো মনোয়ার হোসেন। বললো, এ্যাঁ! তাই নাকিরে? বহুত্ খুব-বহুত্ খুব। চিন্তার কোন কারণ নেই। আগে দোষক্রটি মাফ করে দিয়ে আমারটা মেনেনে। এরপর দেখি, তোরটা আটকায় কে? এমনভাবে কোমর বেঁধে লেগে যাবো যে, আটটা দিনও পার হতে দেবো না।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আচ্ছা নয়-আচ্ছা নয়। আমারটা আগে মাফ করেদে, তারপর দেখ্, আমি কি করি।

ঃ মাফ-মাফ-মাফ। এবার লাগতো দেখি কোমর বেঁধে। আটদিনের মধ্যে আমার শাদি দিবি, দেখি তো তোর মুরোদ কেমন?

ঃ দেখবি কিরে? দেখবি কি? আটদিন আমি ভুল বলেছি। আমি যদি কোমর বেঁধে ফেলি, তাহলে আট ঘন্টাও লাগবে না। এবার বল্ কখন যাবি আমার বাড়িতে?

ঃ তোর বাড়িতে?

ঃ জরুর। এমনিতেই তো আমার বাড়িতে যাওয়াটা তোর দীর্ঘদিন যাবত ফরজ হয়েছিল, এখন তো সেটা আরো ফরজে কেফায়া। বউ দেখতে হবে না?

ঃ এ্যাঁ, বউ?

ঃ তা ছাড়া, শাদির খানাটা তো তামাদী হয়ে যাচ্ছে তোর। খেতে হবে না তোর সেই পাওনা খানাটা?

ঃ ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, আলবত্। আলবত খেতে হবে। তুই না বললেও ওটা আর ছাড়েগা নেহি।

ঃ সেই সাথে বউটা আমার কেমন হলো, কানী না খুঁড়ি, বাঁদ্রী না পেত্নী, সেটাও দেখে আসবি।

ফারুক এবার আপত্তি তুলে বললো দূর পাগলা তোর বউ আমি দেখবো কি করে। আমি তো বেগানা মানুষ। বেগানা মানুষ হয়ে—

মনোয়ার হোসেন ঠেশ্ দিয়ে বললো, ওরে গর্ধভ, বউকি আমার বে আব্রু-বেফাঁশ হয়ে থাকবে যে দেখা তোর চলবে না। পর্দা আব্রু করেই সে তোর সামনে আসবে। পর্দা আব্রু করে শরীফ মেয়েরা ভার্সিটিতে ক্লাস করে, অফিসে চাকুরী করে, বাজার সওদা করে বেড়ায় আর তোর সামনে আসা চলবে না? তা ছাড়া, কথা বলতে তো দোষ নেই। আড়াল-আব্রু বজায় রেখেই আলাপ-পরিচয় খোঁজ-খবর, সব করা যায়।

ঃ হ্যাঁ, তা অবশ্য যায়।

ঃ তবে? তুই আমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার বউয়ের কাছে তুই একদম অচেনা থাকলে চলবে কেন?

ঃ হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা। কোন্ বিপদ-আপদে কে কখন কার কাজে লাগে, তা তো বলা যায় না। চেনা জানা কিছুটা থাকাটাই বেহতের।

ঃ একশোবার। এখন বল্ কবে যাবি আমার ওখানে? আগামীকাল না পরশু?

ঃ আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই। তুই যেদিন বলবি, সেই দিনই যাবো।

একটু চিন্তা করে মনোয়ার হোসেন বললো, তাহলে আগামী পরশুই আয়। একটা দিন আমার হাতে থাক।

ফারুক মাহমুদ হেসে বললো, ওভি আচ্ছা!

একদিন পরে, অর্থাৎ নির্ধারিত দিনে মনোয়ার হোসেন এসে ফারুক মাহমুদকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। মনোয়ারের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু লোকটি কে তা দেখার জন্যে মনোয়ারের বাড়ির এবং আগত আত্মীয় স্বজনের অনেকে আগে থেকেই বিশেষ আগ্রহী ছিল। এতে করে মনোয়ার হোসেন ফারুক মাহমুদকে এনে ড্রয়ীংরুমে বসাতেই ড্রয়ীংরুমে ভরে গেল অনেক লোকের ভিড়ে। শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ। নাম কি, বাড়ি কোথায়, কি করেন—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করতে লাগলো নানাজন। রেখে ঢেকে আর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে ফারুক মাহমুদ নিজের যে পরিচয় তুলে ধরলো তাতে অনেকেই তেমন তৃপ্ত হতে পারলো না। বিশেষ করে, পেশায় সে ক্ষুদ্র এক দোকানের ক্ষুদে একজন দোকানদার—এই পরিচয়টিই প্রধান হয়ে ওঠায়, উপস্থিতিদের অনেকেই নাখোশ দীলে তখনই ড্রয়ীংরুম থেকে কেটে পড়তে লাগলো। বাইরে এসে তারা চাপাকণ্ঠে বলতে লাগলো—মনোয়ার হোসেনের একি এক আজব পাগলামী! নিজে সে কতবড় একজন শিক্ষিত আর পদস্থ লোক! তার কিনা সবচেয়ে অন্তরঙ্গ দোস্ত হলো নগণ্য আর অশিক্ষিত এক দোকানদার! এই লোককে ছেড়ে শাদি করতে এত আপত্তি মনোয়ারের? দূর-দূর! মানুষের মাথায় কখন যে কোন্ খেয়াল চাপে, তার ঠিক নেই।

মুখে মুখে কথাটা তখনই চলে গেল আন্দর মহলে। চলে গেল মনোয়ারের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী নাজমা বেগমের কানেও। মেয়েদের কে একজন মনোয়ারের স্ত্রী নাজমা বেগমকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, খসমটা আপনার কিন্তু বড়ই খেয়ালী ভাবী। বড়ই খেয়ালী স্বামী পেয়েছেন আপনি। সব সময় তাঁর লাগামটা টেনে ধরে রাখতে হবে আপনাকে। রাস্তাঘাটের বখাটে আর বারো মেশালী লোকের সাথে মিশতে দেবেন না বেশি। নিজের ওজন জ্ঞানটা মাঝে মাঝেই হারিয়ে ফেলেন উনি।

শুনে নতুন বউ নাজমা বেগম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—কেন, আপনি একথা বলছেন কেন?

জবাবে মেয়েটি মনের খেদ ঝেড়ে বললো, বলছি কি আর সাধে? এই যে বন্ধু বলে এত আদিখ্যেতা করে আজ যাকে দাওয়াত করে এনেছেন, তার পরিচয় কি জানেন?

দোকানদার-দোকানদার। রাস্তার এক খুপ্‌ড়ি ঘরের ক্ষুদে এক দোকানদার। বাড়িঘরও নাকি তার এই শহরে নেই, লেখাপড়াও একেবারেই সামান্য। প্রাইমারীর উপরে নাকি নয়ই কেলেংকারী কাণ্ড! ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন ?

শুনে নতুন বউ নাজমা বেগমের মনটা স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা খারাপ হয়ে গেল। নাজমা বেগম নিজে একজন ভারসিটির ছাত্রী। এম.এ. ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ে। ঐ একটা প্রাইমারীপাস দোকানদারের সামনে তাকে তাজিমের সাথে হাজির হতে হবে—এই ছিল তার স্বামীর নির্দেশ। লোকটার এই পরিচয় পাওয়ার পর এ নিয়ে স্বামীর সাথে কথা বলার ফাঁকটা তখন আর ছিল ন। তাই স্বামীর নির্দেশ পালন করার জন্যে যথা সময়ে তাকে আসতে হলো ফারুক মাহমুদের সামনে।

ফাঁকা ড্রয়ীংরুমে তখন ফারুক মাহমুদকে নিয়ে নাজমার আগমনের অপেক্ষায় সোফাসেটে বসেছিল মনোয়ার হোসেন। ড্রইংরুমের অন্দরমুখী দুয়ারের দিকে দৃষ্টি তার নিবদ্ধ। একটু পরেই ঐ অন্দরমুখী দুয়ার দিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করলো নাজমা বেগম। যথাযথভাবে আব্রু করে আর মুখে নেকাব এঁটে সে এলো। ঐ একইভাবে পর্দাআব্রু করা আর এক তরুণী তার সাথে এলো তাকে সঙ্গ দিতে। পেছনে তাদের নানা বয়সের আরো কিছু মহিলা দরজা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে এবং সেখান থেকে চেয়ে রইলো ড্রইংরুমের দিকে।

মনোয়ারের স্ত্রী আর ঐ অপর তরুণীটি ড্রইংরুমে এসে ফারুক মাহমুদকে তেমন একটা লক্ষ্য না করেই সালাম দিলো হাত তুলে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সালামের জবাব দিলো ফারুক মাহমুদ। ফারুককে উঠতে দেখে মনোয়ার হোসেন ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আরে আরে, উঠতে হবে কেন? বোস্।

সেই সাথে অদূরে পেতে রাখা আর একটা সোফাসেটের দিকে ইংগিত করে মনোয়ার হোসেন মহিলা দু'জনকে বললো, বসুন বসুন, আপনারাও ঐ সোফাসেটে বসে পড়ুন।

সকলেই বসে পড়লে মনোয়ার হোসেন এবার তার স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, এই যে নাজমা, ইনিই আমার সেই পরম বন্ধু ফারুক মাহমুদ। এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার আর দ্বিতীয়টি কেউ নেই।

মেয়ে দুইজনের একজনও এতক্ষণ ফারুক মাহমুদকে চোখ তুলে দেখেনি। 'ফারুক মাহমুদ' কথাটা কানে যেতেই নাজমা বেগমের সাথে আসা আর নাজমা বেগমের পাশে বসা সেই অপর তরুণীটি দ্রুত চোখ তুলে ফারুকের দিকে তাকালো আর তাকিয়েই সে যারপরনাই চমকে উঠলো। আসন থেকে লাফিয়ে উঠে সে আবেগ বিস্ময়ে বলতে লাগলো—আরে সেকি-সেকি! আপনি এখানে! আপনিই এই লোকের সেই অন্তরঙ্গ দোস্ত? আপনিই আজকের সেই মেহমান? কি তাজ্জব-কি তাজ্জব!

সারা বিশ্বের বিস্ময় মেয়েটির মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে ফেললো। ড্রইংরুমের ভেতরে আর নিকটে যারা ছিল, মেয়েটির একথায়, চঞ্চল হয়ে উঠলো সবাই। কণ্ঠস্বর চিনতে

পেরে সবার অধিক চঞ্চল হয়ে উঠলো ফারুক মাহমুদ। সে প্রায় চীৎকার করেই বলে উঠলো—সোবহান আল্লাহ! একি আপনি! আপনি এ বাড়িতে! একি বিচিত্র ব্যাপার!

এই মেয়েটি ইয়াসমীন আরা বেগম। তলবদার সাহেবের কন্যা ইয়াসমীন আরা। ইয়াসমীন আরা বললো, বিচিত্র বলে বিচিত্র? আপনি যে আমাকে যারপরনাই তাজ্জব করে দিলেন। এমন একজন লোকের আপনি দোস্ত? এই মনোয়ার হোসেন সাহেবের মতো এমন একজন হোমরা-চোমরা লোকের আপনি বন্ধু? তাও আবার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু?

মনোয়ার হোসেনের প্রতি ইংগিত করে ফারুক মাহমুদ পাল্টা প্রশ্ন করলো—কে হন ইনি আপনার? ইনাদের বাড়িতে আপনি—কি আশ্চর্য! কি সম্পর্ক ইনার সাথে আপনার?

ইয়াসমীন আরা বললো, ইনি আমার দুলাভাই। আগে কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সপ্তাহ খানেক হলো ইনি আমার দুলাভাই হয়েছেন। উনার স্ত্রী এই নাজমা বেগম আমার আপন মামাতো বোন।

দুইচোখ ফের কপালে তুলে ফারুক মাহমুদ বললো, এ্যাঁ! বলেন কি?

দুহাতে জোর তালি বাজিয়ে এর মাঝে মনোয়ার হোসেন বলে উঠলো—মারহাবা! মারহাবা! সে কিরে ফারুক! ইনি, মানে আমার এই নয়া শ্যালিকা তোর পরিচিত জন?

ফারুক মাহমুদ বললো, হ্যাঁ, পরিচিতই তো।

মনোয়ার হোসেন বললো, কি ভেল্কি-কি ভেল্কি! এত বড় খবরটাতো জানা ছিল না আমার?

ফারুক মাহমুদ প্রতিবাদ করে বললো, জানা ছিল না কেমন? ইনি তোর শ্যালিকা হওয়ার পরও তোর জানা ছিল না কি রকম? ভাঁড়ামী করছিস্ আমার সাথে?

ঃ না-না, কিছুই জানা ছিল না। বিশ্বাস কর, কিছুই জানা ছিল না। আমার এই নয়া শ্যালিকা আজকেই আমার এখানে এসেছেন। আমার বিবির মুখে শুনলাম, ইনি আমার বিবির ফুফাতো বোন। কে ফুফা, কি তাঁর নাম-পরিচয়, কিছুই জানা হয়নি এখনও আমার। মানে, জানার সময় পাইনি।

ঃ সে কিরে!

ঃ অবাক হবার কিছু নেই। এই মাত্র ক'দিন হলো শাদি হয়েছে আমাদের। সকল আত্মীয়ের সাথে এখনো সারা হয়নি পয়-পরিচয়। এখনো এই নতুন আত্মীয়দের অনেককেই আমি চিনিনে।

ঃ মনোয়ার!

ঃ তোকে আনতে যখন যাই, তখন ইনি এলেন। ফিরে এসে কিছু আগে আমার বিবির মুখে শুনলাম, ইনি আমার শ্যালিকা আর আমার বিবির ফুফাতো বোন।

ফারুক মাহমুদ ফের সশব্দে বলে উঠলো—লাগ ভেল্কি লেগে যা, চোখে মুখে লেগে যা। ওরে অন্ধ, এই ইনিই সেই ইয়াসমীন আরা বেগম।

মনোয়ারও ফের চমকে উঠে বললো, ইয়াসমীন আরা! কোন্ ইয়াসমীন আরা?

ফারুক মাহমুদ বললো, যাঁর বাড়ি আমি ভাড়া নিয়ে আছি, মানে যাঁদের বাড়ি, সেই ইয়াসমীন আরা। জনাব আবদুর রাজ্জাক তলবদারের একমাত্র কন্যা ইয়াসমীন আরা বেগম।

মনোয়ার হোসেন নেচে উঠে বললো, মার গোড়ালী, খট্-খট্! তুই ঐযে প্রাইভেট পড়াতে যাস্—

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ। ইনাদের বাড়িতেই ইনার খালাতো বোন আনজুম্‌কে কুরআন শরীফের তালিম দিতে যাই।

এবার মনোয়ার হোসেন সুর করে গেয়ে উঠলো—"অবাক পৃথিবী, অবাক করলে, আবাক যে বারে বার"। তাই তো লোকে বলে, দুনিয়াটা গোলাকার আর মুসলমান সব ভাই-ভাই। একি তাজ্জব যোগাযোগরে!

ঃ তাইতো দেখছি। বড়ই তাজ্জব।

ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টিতে ফারুকের দিকে চেয়ে মনোয়ার এবার বললো, তারপর ফারুক? এবার?

বুঝতে না পেরে ফারুক মাহমুদ বললো, এবার। কি এবার?

ঃ কোমর বেঁধে ফেলবো কি? এবার সেটা বল্। আচ্ছা মতো করে কোমর বেঁধে ফেললে এখন কিন্তু আর আট দিনও নয়, আটঘন্টা ও নয়, আট মিনিটেই কেল্লাফতে। কারণ পাখী এখন আমার খাঁচায়। বলটা আমার কোর্টে।

ইংগিতটা বুঝতে পেরে ফারুক মাহমুদ লজ্জিত কণ্ঠে বলো—ধ্যাৎ!

ইয়াসমীন আরা ও নাজমা বেগম এর অর্থটা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে না পেরে উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো তাদের দিকে। কিন্তু তারা তখন ঠাট্টা-মস্করায় মত্ত। মেয়ে দুটির দিকে না চেয়ে তারা ছুটিয়ে দিলো হেঁয়ালীর ফোয়ারা। কিছুক্ষণ আচ্ছামতো হেঁয়ালী পনা করে ফারুক শেষে বললো, "মা ভাত দেয়ই না, অতিথি বলে আতপ ছাড়া খাইনে"। তুই থাম, আমি একটু বাথরুম থেকে আসি।

মনোয়ার হোসেন বললো, বাথরুম?

ফারুক মাহমুদ বললো, তুই যা শুরু করেছিস না, হাসতে হাসেত পেটে আমার খিল ধরে গেছে। অন্তত চোখ-মুখটা ধুয়ে আসি—

ফারুক মাহমুদ উঠে গিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করলো। এই ফাঁকে নাজমা বেগম ইয়াসমীন আরাকে নিম্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—সেকিরে ইয়াসমীন! তুই এঁকে চিনিস? এই মেহমান কে?

ইয়াসমীন আরা উৎফুল্লকণ্ঠে বললো, চিনি মানে কি? খুবই ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। ইনি আমার খুবই পরিচিত লোক।

ঃ পরিচিত লোক? ইনি নাকি একজন দোকানদার? এঁর সাথে তোর পরিচয় ঘটলো কি করে?

ঃ ঘটবে না কেন? দোকানদার হলে কি হবে? ইনি যে একজন গুণীলোক আর মস্তবড় পণ্ডিত মানুষ। বিরাট বিদ্বান লোক। কথাবার্তা শুনে কি কিছু বুঝতে পারলিনে?

ঃ বিদ্বান?

ঃ বড় সার্টিফিকেট ধারী নন, তবে বড় বিদ্বান। অংক, ইংরেজী আরবী—এসবে এঁর পাণ্ডিত্য যদি দেখতিস্ তাহলে তুইও তাজ্জব বনে যেতিস্। কি সাংঘাতিক পাণ্ডিত্যরে বাবা।

অবিশ্বাসের সুরে নাজমা বেগম বললো, কেমন কথা! তবে যে কে একজন বললো, ইনি সেরেফ একজন প্রাইমারী পাশ লোক। অর্ধশিক্ষিত মানুষ।

প্রবল আপত্তি তুলে ইয়াসমীন আরা বললো, না-না, প্রাইমারী পাশ হবেন কেন? আর না হলেও ইনি একজন ম্যাট্রিক পাশ লোক। এ কথা আমি প্রায় হলফ করেই বলতে পারি।

এই পর্যায়ে মনোয়ার হোসেন কথা ধরে বললো, বলেন কি! আপনি হলফ করে বলতে পারেন, ইনি একজন ম্যাট্রিক পাশ লোক?

ইয়াস্‌মীন আরা বললো, হ্যাঁ, পারিই তো।

মনোয়ার হোসেন ফের প্রশ্ন করলো—ইনি আপনাকে সে কথা বলেছেন? বলেছেন ইনি একজন ম্যাট্রিক পাশ লোক?

ঃ হ্যাঁ, সেই রকমই তো বললেন সেদিন।

ঃ বললেন?

ঃ হ্যাঁ, নিজে মুখেই তো বললেন।

এ প্রসঙ্গে নাজমা বেগম বিরূপকণ্ঠে বললো, তা বললেনই না হয়। কিন্তু তাতেই বা কি হয়েছে? সেরেফ ম্যাট্রিক পাশ বিদ্যা এমন কি বিদ্যা?

জবাব দিলো মনোয়ার হোসেন। বললো, অনেক-অনেক।

নাজমা বেগম ফের প্রশ্ন করলো—অনেক?

মনোয়ার হোসেন হেসে বললো, আলবত।

ইয়াসমীনের নসীবে থাকলে ঐ অল্পটাই একদিন অনেক হয়ে যেতে পারে।

ফারুক মাহমুদের আসল পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মনোয়ার হোসেন এর বেশি আর কিছু বললো না।

ইতিমধ্যে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো ফারুক মাহমুদ। এতে করে এসব আলাপ বন্ধ হয়ে গেল। আবার শুরু হলো পয় পরিচয়ের পালা নাজমা বেগম ও ফারুক মাহমুদের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের প্রসঙ্গটা আরো কিছুক্ষণ চলার পর মনোয়ার হোসেনের অনুমতিক্রমে আন্দর মহলে চলে গেল নাজমা ও ইয়াসমীন।

পুনরায় ফাঁকা হলো ড্রইংরুম। এই ফাঁকে ফারুক মাহমুদ মনোয়ার হোসেনকে প্রশ্ন করলো—এবার বল তো, হঠাৎ এই শাদিটা তোদের হলো কি করে? যোগাযোগ হলো কিভাবে?

জবাবে মনোয়ার হোসেন বললো, দলীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। আমার শ্বশুর যে আমাদের ইসলামীদলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। নিবেদিত প্রাণ কর্মী।

ফারুক মাহমুদ উৎফুল্লকণ্ঠে বললো, বলিস্ কি! ইসলামী ব্যক্তিত্ব?

ঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ প্রেমিক মানুষ। শুধু উনি একাই নন, উনার গোটা পরিবার আর আত্মীয় স্বজন সবাই ঈমানদার আর আল্লাহভক্ত মানুষ। উনার ভাই-বোন-ভগ্নিপতিরা সবাই।

ঃ সেকি! ভগ্নিপতিরা মানে?

ঃ ভগ্নিপতিরা মানে আমার শ্বশুরের বোনের স্বামীরা। আমার স্ত্রীর ফুফারা।

ঃ ফুফারা? আবদুর রাজ্জাক তলবদারও তো তোর শ্বশুরের এক ভগ্নিপতি। অর্থাৎ তোর স্ত্রীর ফুফা। ইয়াসমীন বিবির বর্ণনা অনুযায়ী তলবদার সাহেব তোর শ্বশুরের আপন ভগ্নিপতি। কিন্তু কই, তলবদারের মধ্যে তো ইসলাম আর ঈমানের নামগন্ধও নেই?

ঃ নেই?

ঃ না। ঐ পরিবারের মধ্যে আমি ঢুকে গেছি অনেক খানি। ইসলাম-ঈমান উনার মধ্যে তো এক রত্তিও দেখিনে। যা দেখছি তা সবই বৈরাগীকেত্তন। বৈরাগী আর বোষ্টুমীতে বাড়ি উনার সরগরম থাকে সব সময়।

ঃ বলিস্ কিরে? এতটা তো জানিনে। তাহলে ঐ ইয়াসমীন আরা আর তাঁর আম্মার খবর কি? উনারাও কি ঐ বৈরাগী-বোষ্টুমীদের দলে?

ঃ তওবা-তওবা! তা নয়। উনারা খাঁটি মুসলমান আর ঈমানদার মানুষ। একমাত্র ঐ তলবদার সাহেবেরই কোন জাত-পাত খুঁজে পাচ্ছিনে আমি।

ঃ ঐ যে বললি, বৈরাগী আর বোষ্টুমীতে বাড়ি তাঁর সরগরম, তাহলে ওরা কে? ঐ বৈরাগী আর বোষ্টমীরা?

ঃ ওরা সব বাইরের লোক। বাইরে থেকে আমদানী। ঘোর বেঈমান আর ইসলাম বিদ্বেষীর দল। তলবদারকে আর এক বেঈমান পেয়ে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বনে গেছে। এখন জব্বোর দহরম মহরম।

ঃ ফারুক।

ঃ সেই সুবাদে ও বাড়িটা এখন প্রায় ওদেরই দখলে। ওরা ওখানে প্রায় চব্বিশ ঘন্টার মেহমান। ঐযে ঐ কানাই, আবুল কাশেম কানাই আর ঐ জাতের ভারত প্রেমিক আর প্রগতির ফেরিওয়ালারা দুই বেলা ভিড় করে ওখানে? ঐ যে সেদিন অবতারদের কাহিনী শুনালি, ঐ অবতারেরাই।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, এমনটি তো কিছু কিছু শুনেছিলাম আর তুইও বলেছিলি। কিন্তু সেটা যে এতটা, তা তো ভাবতে পারিনি!

ঃ এখন পারবি। কুটুম্বিতা হয়ে গেছে যখন, তখন ঐ কুটুমবাড়িতে গেলেই সব সম্যক উপলব্ধি করতে পারবি। কিন্তু একটা কথা মগজে আমার কিছুতেই ধরছে না।

তোর শ্বশুর কুলের যেচিত্র তুলে ধরলি তুই, তাদের ঈমান আকিদার যে পরিচয় দিলি, তাতে তলবদারের মতো এমন একজন লোকের সাথে তাঁরা তাঁদের ঘরের মেয়ের শাদি দিলেন কি করে?

মনোয়ার হোসেন সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা বটে। এটা একটা ভেবে দেখারই বিষয়। তবে শাদিটা তো আমার শ্বশুর দেননি, দিয়েছেন আমার দাদা শ্বশুর। যখন শাদি দিয়েছেন, তখন হয়তো জানতে পারেননি জামাই এর এই চরিত্র।

ঃ সেইটেই-সেইটেই। এছাড়া আর কোন যুক্তি তো দেখিনে। তা সে যাক। আমার পরিচয়টা বেখেয়ালে যেন এদরে কাছে প্রকাশ করে ফেলিস্‌নে। তোকে পীড়াপীড়ি করতে পারে সবাই। এদের এত কাছে এসে গেলি যখন!

মনোয়ার হোসেন জোর দিয়ে বললো, দূশ-শালা, সে ভয় করছিস্ কেন? আমি জাতে মাতাল, কিন্তু তালে ঠিক।

এই সময় অন্দর থেকে বার্তা এলো—"শুধু মুখের কথা দিয়েই কি পেট ভরাবেন মেহমানের? তাঁকে খেতে দিতে হবে না? মেহমানকে নিয়ে ডাইনিংরুমে আসুন"।

ডাইনিংরুমে মেহমানকে খাবার পরিবেশন করার কালে আর এক দৃশ্য চোখে পড়লো নাজমা বেগম ও মনোয়ার হোসেনের। নিয়ম অনুসারে পরিবেশনটা শুরু করলো নতুন বউ নাজমা বেগম। কিন্তু নিমেষেই সেই পরিবেশন কর্মটি হস্তান্তরিত হয়ে গেল। ফারুক মাহমুদকে উপলক্ষ করে ইয়াসমীন আরা নাজমা বেগমকে বলতে লাগলো—না-না, উনি ওটা খান না, এটা পছন্দ করেন না, ঐটা উনি ভালবাসেন, এই জিনিসটা এটুকু খান, এটা এভাবে খান, ভিন্ন পিরিচে আর কাঁটা-চামচে এসব খেতে ভালবাসেন— ইত্যাদি বলতে বলতে খাজিনদারীটা গোটাই নিজের হাতে নিয়ে নিলো ইয়াসমীন আরা এবং ফারুক মাহমুদের পছন্দ করা খাবারগুলো বেছে বেছে সারাক্ষণ নিজের হাতে পরিবেশন করে ফারুক মাহমুদকে খাওয়ালো। এ কাজে নাজমাকে আর হাত লাগাতেই দিলো ন। ফারুক মাহমুদকে খাওয়ানোর মধ্যে ইয়াসমীনের গৃহিনীপনা, নিপুণতা, নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা দেখে স্বাভাবিকভাবেই বেজায় বিস্মিত হলো নাজমা বেগম আর মনে মনে হাসতে লাগলো মনোয়ার হোসেন।

আহারান্তে নাজমা বেগম এক ফাঁকে তার স্বামীকে বললো, কি তাজ্জব! ঐ একটা দোকানদারের সাথে এতটা মাখামাখি হয়ে গেছে ইয়াসমীনের? ছিঃ-ছিঃ! এটা তো আর দেখা যায় না। এত অধিক পর্দানসীন আর সংযত যে মেয়ে, তার এতটা অধপতন!

নাজমার স্বামী মনোয়ার হোসেন মুচ্‌কি হেসে বললো, অধপতন বলছো কেন? বলো, অবতরণ!

ঃ অবতরণ!

ঃ মুহব্বতের দরিয়ায় অবতরণ। অবশ্য অবতরণটা অনেক আগেই হয়ে গেছে। এখন চলছে অবগাহন। গা মেলে অবগাহন। মুহব্বতের দরিয়া বলে কথা।

ঃ থুথু দেই ঐ মুহব্বতে! একি বিশ্রী কাণ্ড!

ঃ বিশ্রীকাণ্ড?

ঃ নির্জলা বেহায়াপনা! এসব অন্যলোকে দেখলে ভাববে কি, বলুন তো?

ঃ কিছুই ভাববেনা। শাদিটা হয়ে গেলে সব জায়েজ হয়ে যাবে।

নাজমা বেগম ফুঁশে উঠে বললো, কি বললেন, শাদি? ঐ একটা দোকানদারের সাথে ইয়াসমীন আরার শাদি। এটা আপনি ভাবতে পারছেন কি করে?

মনোয়ার হোসেন বললো, কেন, ভারতে দোষ কি? মাখামাখিটা হয়েই গেছে যখন, তখন বাকীটুকুও হয়েই যাক। আপছে আপ যা হতে যাচ্ছে, তাতে বাদ সাধা উচিত নয়।

ঃ উচিত নয়? ইয়াসমীন আরা একটা কোন পর্যায়ের মেয়ে, তা কি জানেন? আমারই মতো এম.এ. ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ে। আমার চেয়েও অনেক বেশি মেধাবী। পাশের পর হয়তো ভারসিটিতেই চাকরী হয়ে যাবে তার। অধ্যাপিকার চাকরী। সেই মেয়ের শাদির কথা ভাবছেন একজন নিঃস্ব আর অশিক্ষিত দোকানদারের সাথে?

ঃ অশিক্ষিত হবে কেন? অনেক লেখাপড়া জানে।

ঃ অনেক লেখাপড়া মানে তো ঐ ম্যাট্রিক পাশ?

ঃ তাতে কি হয়েছে। ডিগ্রী দিয়ে হবে কি?

ঃ বউকে খাওয়াবে কি? ঐ ফালতু এক দোকান থেকে কয় পয়সা আয় হয় যে, বউ পালবে তাই দিয়ে? বাড়ি নেই, ঘর নেই, বিষয় নেই বিত্ত নেই, লেখাপড়াও ঐ ক.ব.ঠ.। আছে কি এই লোকটার? এই লোককে শাদি করে ইয়াসমীন আরা খাবে কি আর করবেডা কি? বরের চুলোর ছাই খাবে আর ছাই উড়াবে দুহাতে। মনোয়ার হোসেন নির্লিপ্তকণ্ঠে বললো, তা উড়ায়, উড়াবে। ও কাজটাও অকাজ নয়।

ঃ অকাজ নয়?

ঃ না। "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়ায়ে দেখিও তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।"

মুখঝাম্টা মেরে নতুন বউ বিরক্তির সাথে বললো, দূর-দূর! এটা কি একটা রসকিতার বিষয়?

ঃ বিষয় না থাকলে কি করবো? নতুন বউএর সাথে কি একটু রং করতে হবে না?

এই সময় সরবে লোকজন এসে পড়ায়, এদের এ আলাপে ছেদ পড়লো এখানেই।

৭

বনিবনার অভাবে কোন মুসলমান পরিবার দুই ভাগ হয়ে গিয়ে দুটি পৃথক সংসার পাতলেই, একাংশের মুসলমান সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানিত্ব হারিয়ে হিন্দু বনে যায় এমন উদ্ভট চিন্তাভাবনা এই সারাবিশ্বে একমাত্র এদেশের একটি বিশেষ দল আর ঐ দলপন্থী বুদ্ধিজীবিরা ছাড়া আর কেউ কখনো করে না, করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না।

দুইশো বছর যাবত হিন্দু ভারত মুসলমানদের সূচাগ্র মেদিনীও ছাড় দিতে রাজী হয়নি এবং সব সময় পায়ের তলে দাবিয়ে রেখেছে মুসলমানদের, সেই মুসলমানেরা দুইশো বছর ধরে আপ্রাণ সংগ্রামের মাধ্যমে কায়েম করলো পাকিস্তান। পাকিস্তান অর্থে মুসলমানদের নিজস্ব অস্তিত্ব বিধায় ধর্ম ও কৃষ্টি তমদ্দুন নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার পৃথক আবাসভূমি। হিন্দু আধিপত্যের বাইরে মুসলমানদের একান্তই নিজস্ব দেশ এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম ও কৃষ্টি কালচার রক্ষা করে বেঁচে থাকার পৃথক রাষ্ট্র।

বনিবনার অভাবে যে মুহূর্তে সেই মুসলমান রাষ্ট্র দুভাগে ভাগ হয়ে গেল, অর্থাৎ সেই পাকিস্তানের মুসলমানেরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামের দুটি পৃথক রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে ভাগ হয়ে গেল, সেই মুহূর্তেই বাংলাদেশের একটি বিশেষ দল আর ঐ দলপন্থী ভোগবাদী মুসলমানেরা হৃষ্টচিত্তে ধরে নিলো—তারা আর মুসলমান নেই, ইসলাম থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা এবং পৌত্তলিক বনে গেছে। ধরে নিলো, শুধু নিজেরাই নয়, বাংলাদেশের সকল মুসলমান, (ইসলামী জীবন যাপন করার জন্যে যারা দুইশো বছর যাবত এত সংগ্রাম করেছে তারা) পৌত্তলিক বনে গেছে কিংবা পৌত্তলিক হবো হবো করছে।

এই ধারণার বশে ঐ বিশেষ দল ও দলপন্থী মুসলমানেরা নিজেরাই কেবল হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান আঁকড়ে ধরে পৌত্তলিকতার দিকে ঝুঁকে পড়লো না, বাংলাদেশের তামাম মুসলমানদের ইসলাম থেকে সরিয়ে নিয়ে পৌত্তলিক বানানোর অঙ্গীকারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে গেল। তাদের অজুহাত—পাকিস্তানকে দুভাগ করার ব্যাপারে হিন্দু রাষ্ট্র ভারতের হস্তক্ষেপ ছিল এবং হিন্দুভারত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করতে সাহায্য করেছে। অতএব পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের তামাম মুসলমান সেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে রাতারাতি ইসলাম ত্যাগ করে গেরুয়া পরে বসে আছে। তৎকালীন ক্ষমতাসীন ঐ বিশেষ দল আর ঐ দলপন্থীরা দেশের মোট জনগণের মাত্র ত্রিশ শতাংশের মতো হওয়া সত্ত্বেও, ধর্ম নিরপেক্ষতার ধূয়া তুলে দেশের বাদবাকী

সত্তর শতাংশ মানুষকে, অর্থাৎ মুসলমানদের ইসলাম থেকে বের করে এনে পৌত্তলিক বানানোর উদ্দেশ্যে সেই যে জবরদস্তী শুরু করলো এবং দেশবাসীকে বিবদমান দুদলে ভাগ করে ফেললো—সেই বিবাদ আজও চলে আসছে সমানে। ভারতের ইংগিতে ঐ বিশেষ দল আজও সেই বিবাদ তুঙ্গে তুলে নিয়ে হুংকার ছাড়ছে অমিতবিক্রমে।

সেই সাথে, সারা বাংলাদেশের লোক স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বতোভাবে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও, ঐ বিশেষ দল বাংলাদেশকে একাই স্বাধীন করেছে আর এদেশ একমাত্র তাদেরই পৈতৃক সম্পত্তি—এই দাবী করে আসছে ডাংগর গলায়। সাথে সাথে, সেই দাবী প্রতিষ্ঠা করার অসৎ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রায় সত্তরভাগ লোকের সাথে কোন্দল করে আসছে অবিরাম। শান্তিকে দেশ ছাড়া করছে কমপক্ষে পচাঁত্তরভাগ তারা একাই। সৃষ্টি করছে নিত্য নতুন বিশৃঙ্খলা। www.boighar.com

ঈসায়ী ২০০১ সানের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক ভোটে বিজয়ী হয়। এতে করে পৈতৃক সম্পত্তি বেদখল হয়ে গেল দেখে ঐ বিশেষ দল ও ঐ দলপন্থীরা আওয়ারা বনে যায়। নির্বাচনের ফলাফল বের হওয়ার আগে ক্ষমতাসীন দলের প্যারাফার্ণেলিয়ার, অর্থাৎ নিজস্ব ময়দানের নির্বাচনে ঐ বিশেষ দল নিশ্চিতভাবে জিতবে ধারণায়, "নির্বাচন সুন্দর হয়েছে-সুষ্ঠু হয়েছে," বলে এন্তার প্রচার শুরু করে ও খুশিতে দুলতে থাকে। কিন্তু যেই মুহূর্তে ফলাফল প্রকাশ হয়, অমনি পাল্টে যায় ঐ বিশেষ দলের চরিত্র। নির্বাচনে যারপরনাই কারচুপি হয়েছে বলে তারাই আবার তৎক্ষণাৎ আওয়াজ তুলে গগণ ফাটানো চীৎকার শুরু করে এবং সংগে সংগে লিপ্ত হয় এই নির্বাচন ভণ্ডুল করার ষড়যন্ত্রে। ঐ বিশেষ দলের ডেপুটি স্পীকার সাহেব অকারণেই সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করানো বন্ধ রেখে কালহরণ করতে থাকেন। সেই ফাঁকে ঐ বিশেষ দলের প্রধান ঘোরাতে থাকেন কলকাঠি। দেশের প্রেসিডেন্ট, তত্বাবধায়ক সরকার প্রধান, এমনকি সামরিক বাহিনীর সাথেও তিনি যোগাযোগ চালাতে থাকেন এবং এই নির্বাচন বাতিল করে ভিন্ন শাসন চালু করার জন্যে সবিশেষ অনুরোধ করেন তাঁদের। এই দুরভিসন্ধির কারণে ১লা অক্টোবরের ইলেকশানের শপথ পাঠ পিছুতে পিছুতে ১১ই অক্টোবরে এসে সম্পন্ন হয়।

ইলেকশান বানচাল করতে না পেরে জোট সরকার শপথ নেয়ার পর মুহূর্ত থেকেই ঐ বিশেষ দল নেমে পড়ে ময়দানে, শুরু করে আন্দোলন এবং এই সরকারকে অস্বীকার করে বুলন্দকণ্ঠে দাবী করতে থাকে নতুন নির্বাচন।

বলা বাহুল্য, ক্ষমতা চায় ঐ বিশেষ দলটি। এ ক্ষমতা অন্য কাউকে দিতে তারা নারাজ। তাদের বিগত দিনের দুঃশাসন, দলীয়করণ ও পারিবারিকী করণ, দুর্নীতি ও নিপীড়ন এবং সর্বোপরি, মৌলবাদী সম্বোধনে দেশ থেকে মুসলমান ও ইসলাম নিশ্চিহ্ন করার উদগ্র উম্মাদনার জন্যেই যে মুসলমান প্রধান দেশের মানুষ ভোট দেয়নি তাদের—এটাও মানতে তারা রাজী নয়। তিনশো আসনের এক তৃতীয়াংশ আসনও মানুষ যাদের দেয়নি, অর্থাৎ যে বিশেষ দলকে মানুষ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই

বিশেষ দলকে দুই তৃতীয়াংশেরও অধিক আসনের বিজয়ীদের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে একেবারেই অনিচ্ছুক। অর্থাৎ ক্ষমতা তাদেরই থাকতে হবে।

সেই দাবীতে ক্ষমতা হারানোর দিন থেকেই তারা হাত-পা ছুড়ে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য। এ সরকারের মেয়াদ পূরণের প্রশ্ন কোন প্রশ্নই নয় তাদের কাছে।

আইন শৃঙ্খলার অবনতি বিগত ঐ বিশেষ দলের শাসন আমলেও ছিল এবং বর্তমানের চেয়ে অনেক দুঃসহভাবে ছিল। ঐ বিশেষ দলের সরকার প্রধানের প্রত্যক্ষ উস্কানী ছিল সে অবনতির পেছনে। একটি লাশের বদলে দশটি লাশ ফেলে দেয়ার প্রকাশ্য নির্দেশ ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর। চরম প্রতিবাদ ওঠে তাঁর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। তবু ঐ বিশেষ দল মেয়াদের একদিন আগেও গদী ত্যাগ করেনি। এখন তারা কি করে আশা করে মেয়াদ শেষ না হতেই জোট সরকার গদী ত্যাগ করবে—এটা তারা ছাড়া আর কারো বোধগম্য নয়। বিশেষ করে, ঐ বিশেষ দলের প্রধানের মতো সন্ত্রাস উস্কে দেয়ার পরিবর্তে জোট সরকারের প্রধান সন্ত্রাস দমনে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যেখানে। ঐ বিশেষ দলের এ আবদার মামার বাড়ির আবদারকেও হার মানায়। মোট কথা, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ঐ বিশেষ দল ও দলের বুদ্ধিজীবিরা নানা ইস্যুতে শুরু করছে সরকার বিরোধী আন্দোলন। আন্দোলনের নামে তারা দেশের বাইরে শুরু করেছে দেশ-বিরোধী অপপ্রচার আর দেশের ভেতরে শুরু করেছে জ্বালাও-পোড়াও মূলক আইন শৃঙ্খলাবিরোধী নানাবিধ অপকর্ম আন্দোলনের নামে তারা শুরু করেছে হরতাল এবং একের পর এক অসংখ্য হরতাল। ঐ বিশেষ দলনেত্রী ক্ষমতায় থাকতে হরতাল বিরোধী আহ্বান জানান উদাত্তকণ্ঠে এবং প্রকাশ্য জন সমাবেশে দরাজকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করেন—বিরোধীদলে গেলেও আর কখনোই হরতাল করবেন না বলে এমন দুমুখো নীতি বোধ হয় একমাত্র তাদেরই শোভা পায়।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে—চোখ ফুটো করার মতো কত সুতীক্ষ্ণ ন্যায্য দাবী যেখানে পূরণ হয় না বিশ্বজোড়া চীৎকারে, চীৎকার করে করে নেতিয়ে পড়ে বিশ্বকণ্ঠ, সেখানে এত অন্যায্য, অযৌক্তিক আর মনগড়া দাবী নিয়ে মাত্র এক তৃতীয়াংশ জনতা গোটা দেশের বিরুদ্ধে এত তাফালিং করার শক্তি পায় কোত্থেকে? নেতিয়ে পড়ার বদলে সেই শক্তি এত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় কিসের জোরে? উত্তরটাও এসে যায় স্বাভাবিক ভাবে ঃ "খুঁটির জোরে"। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ইজরাইল যেমন গোটা আরব বিশ্বের উপর তাফালিং করে বেড়াচ্ছে আমেরিকার খুঁটির জোরে, তেমনি এক তৃতীয়াংশ জনতার ঐ বিশেষ দল দুই তৃতীয়াংশ জনতার বিরুদ্ধে এত গলাবাজী আর তাফালিং করে বেড়াচ্ছে ভারতের খুঁটির জোরে।

"ভাদা" অর্থাৎ ভারতের দালাল হিসাবে এরা যে কাজ করছে দেশটাকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানানোর জন্য এবং কেউ কেউ দেশটাকে ভারতের সাথে একাকার করে

দেয়ার জন্য-এটা এ যাবত অনেকটা প্রচ্ছন্ন ছিল। মোটামুটি সকলেই এটা সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেও, এ তথ্য মোটামুটি ঢাকা ছিল এতদিন। এত উদোম হয়নি। এবার ঐ বিশেষ দলের নেতাকর্মী আর সমর্থকরাই ভরা হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আর বিশেষ পন্থীরা নিজেরাই এ তথ্য মেলে ধরেছেন প্রকাশ্য জন সভায়। বলেছেন—ভারতের দালাল হয়েই সারাজীবন বেচে থাকতে চান তারা ভারতের দালাল হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে তাঁরা গর্ব বোধ করেন। আরো বলেছেন, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের কোনই কল্যাণ হয়নি।

"বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি পরিষদ" নামের এক পরিষদের সভাপতি কে, এম.সোবহানের সভাপতিত্বে ২০/২/২০০৪ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মর্মে বক্তব্য রাখেন ঐ বিশেষ দল প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রাজ্জাক এম.পি. বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্সের সভাপতি আবদুল আইয়াল মিন্টু, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভি.সি. আলাউদ্দীন আহমদ, ঐ বিশেষ দলের নেতা এ্যাডভোকেট এম.এ. বারী, ব্যারিষ্টার শওকত আলী, ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার দীলিপ সিন্‌হা, জাসদের জনাব আবদুর রব হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক, মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ড কাউন্সিলের ঐ বিষেশ দলপন্থী অংশের সভাপতি জাফরুল্লাহ প্রমুখ। এখন এই গরমে ফুলে বেড়াচ্ছে ঐ বিশেষ দলপন্থী সকলেই। নারী পুরুষ সকলেই এখন এই পূণ্যবাণী-প্রচারে সরব ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ধর্মনিরতাপেক্ষপন্থী প্রগতির মেয়েরাও যে একর্মে মোটেই নাজুক নয়, সেটা সেদিন দেখা গেল ইয়াসমীন আরার আব্বা তলবদার সাহেবের বাড়িতেই।

শাদির কিছুদিন পরে তলবদার সাহেব তথা ফুফার বাড়িতে বেড়াতে এলো মনোয়ার হোসেনের স্ত্রী নাজমা বেগম। বেড়াতে ঠিক নয়। বেড়াতে এখানে সে বড় একটা আসেনা। ইয়াসমীন আরার সাথে সাক্ষাত করার গরজেই এবার তাকে আসতে হলো অনেকদিন পরে। সামনে এম.এ.ফাইন্যাল পরীক্ষা। ইয়াসমীন আরা ও নাজমা বেগম একই ক্লাসের ছাত্রী। অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রী ইয়াসমীনের কিছু সাজেশান প্রয়োজন ছিল নাজমার। কয়েকদিন যাবত ইয়াসমীনের সাক্ষাত না পেয়ে নাজমা বেগম চলে এলো ফুফার বাড়িতে। শাদির পরে সৌজন্য সাক্ষাতের অজুহাতে। অন্যকথায় রথ দেখা কলা বেচা উভয় উদ্দেশ্য নিয়ে।

সব সময়ই আব্রু করে নেকাব এঁটে বাইরে বেরোয় নাজমা বেগম। আজও সে সেইভাবে এলো। ফারুক মাহমুদের দোকানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ একইভাবে আব্রু করে ইয়াসমীন আরাও এই সময় বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। ড্রইংরুম পেরিয়ে বাইরের আঙ্গিনায় পা দিতেই নাজমার মখোমুখি হয়ে গেল ইয়াসমীন আরা। নাজমাকে দেখে সে উল্লাসে নেচে উঠে বললো, ওমা, নাজমা-তুই! তুই আমাদের বাড়িতে! এ যে অমাবস্যার চাঁদ!

জবাবে নাজমা বেগম মৃদু হেসে বললো, কেন, ফুফার বাড়িতে বেড়াতে আসতে নেই বুঝি? শাদির সময় ফুফাতো আর এলেন না আমাদের বাড়িতে? তাই আমিই চলে এলাম সৌজন্য সাক্ষাতে।

ইয়াসমীন আরা একই রকম খোশকণ্ঠে বললো, বেশ-বেশ, খুব ভাল-খুব ভাল। তা একাই এলি, না সাথে কেউ এসেছেন?

নাজমা বেগম ভারিক্কীকণ্ঠে বললো, এসেছেন। আমার উনিই আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

ঃ উনি? উনি কে?

ঃ তোর দুলাভাই।

ঃ দুলাভাই মানে? মনোয়ার হোসেন ভাই?

ঃ জি।

ঃ ওমা সেকি! তাহলে উনি গেলেন কোথায়?

ঃ উনি উনার বন্ধু ফারুক সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে তাঁর দোকানে গেছেন।

ঃ ফারুক সাহেবের দোকানে? তা আসবেন তো শিগ্গিরই?

নাজমা বেগম নীরস কণ্ঠে বললো, না। আমাকেই এখান থেকে ঐ দোকানে যেতে হবে। দোকানে গেলে ওখান থেকে উনি নিয়ে যাবেন আমাকে।

ঃ কেন-কেন, উনি আসবেন না কেন?

ঃ কি করে আসবেন? আমি তোদের আত্মীয়া তাই এলাম। উনি নতুন জামাই। নতুন আত্মীয়। কেউ গিয়ে তাঁকে না আনুন অন্তত ফুফা সাহেবের একটা মৌখিক দাওয়াত ছাড়া অযাচিত ভাবে উনি আসবেন কি করে, বল্?

একটু চিন্তা করে ইয়াসমীন আরা বললো, ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো! অনেক আগেই তাঁকে দাওয়াত করে আনা উচিত ছিল আব্বার। আচ্ছা ঠিক আছে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই আব্বা যাতে করে তাঁর এই অবশ্যকরণীয় কাজটা করেন, সেটা আমি দেখবো। আব্বা এখন বাড়িতে নেই। থাকলে এখনই তাঁকে ঐ দোকানে পাঠিয়ে দিতাম দুলাভাইকে দাওয়াত করে আনতে।

শংকিত হয়ে নাজমা বেগম বললো, খবরদার-খবরদার! এ কাজটি উনি যেন না করেন। যদিও তোর দুলাভাই ফরম্যালিটির ধার তেমন ধারেন না, তবু ফুফা সাহেবের অনৈসলামিক মানসিকতার কথা উনি ইতিমধ্যেই শুনেছেন। শুনেছেন, ইসলামপন্থী লোকদের প্রতি উনার অনীহার কথা। তাই দোকানে-বাজারে বা রাস্তা-ঘাটে পেয়ে তাকে দাওয়াত করলে উনি মাইণ্ড করবেন। ভাববেন নেহাতই দায় এড়ানোর জন্যে এই দাওয়াত তিনি করছেন।

ইয়াসমীন আরা বললো, এ্যাঁ তাই নাকি?

নাজমা বেগম বললো, হ্যাঁ। এমনিতে খুব সাদাসিধে মানুষ তোর দুলাভাই, নিরহংকার মানুষ। ফুফা সাহেব একবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে যেমন তেমন দাওয়াত

একটা করে এলেই বারেক আর দরকার হবে না কিছু। বন্ধুর এখানে আসার টান বরাবরই তাঁর আছে। লাইসেন্স একবার পেয়ে গেলেই, যখন তখন চলে আসবেন তোদের এখানে। আর ডাকতে হবে না কাউকেই।

ঃ আচ্ছা।

ঃ তবে সেই লাইসেন্সটা দিতে হবে তাঁর বাড়িতে গিয়ে। পথে ঘাটে নয়।

ঃ বুঝেছি-বুঝেছি, ব্যাপারটাতো ঠিক তাই-ই। ঠিক আছে। সে লাইসেন্স অচিরেই আমি দেওয়ানোর ব্যবস্থা করবো। এখন বল্, হঠাৎ তোর এই আগমনের হেতু? নেহাতই সৌজন্য সাক্ষাত নয় নিশ্চয়ই।

নাজমা বেগম ঈষৎ হেসে বললো, তা বটে-তা বটে। উদ্দেশ্য তো আছেই অন্য একটা।

ঃ তাহলে সে উদ্দেশ্যটা কি শুনি?

ঃ আরে! এখানে দাঁড়িয়েই সব কথা শেষ করতে চাস্ নাকি? বসতেও বল্‌বিনে?

খেয়াল হতেই ইয়াসমীন আরা লজ্জিতকণ্ঠে বললো, ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছিঃ-ছিঃ। আয়-আয়, এই ড্রইংরুমে গিয়েই আপাতত বসি একটু আয়—

নাজমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সে ড্রইংরুমে বসলো। এরপর শুরু হলো দুবোন বা দুবন্ধুতে আলাপ। নাজমা তার পরীক্ষার ব্যাপারে সাজেশানের কথা বললে, ইয়াসমীন আরা বললো, ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন? পরীক্ষা সামনে হলেও কাল পরশুই তো আর হচ্ছে না, এখনো বেশ সময় আছে। কারেকট্ সাজেশান এখনও আমি খাড়া করতে পারিনি। খাড়া করার চেষ্টায় আছি। খাড়া হোক অবশ্যই তোকে আমি জানাবো। তোকে না জানিয়ে কি আমি চুপ থাকতে পারি?

আরো কিছু আলাপের পর আন্দরে যাওয়ার জন্যে তারা উঠি উঠি করতেই সরবে আর সোল্লাসে এসে ড্রইংরুমে ঢুকে পড়লো বগলকাটা টাইট গেঞ্জি-আর চিপা ফুলপ্যান্ট পরিহিতা চার চারটে তরুণী। এদের মধ্যে দুই তরুণী কমন অর্থাৎ বন্দনা হক আর মাধুরী মীর্যা। অপর দুই তরুণীর নামও একটু পরেই জানা গেল। একজনের নাম অজন্তা আহম্মদ ও অপরজনের নাম জুলিয়েট চৌধুরী। বলা বাহুল্য, এসব নাম সবগুলোই আকিকা করে রাখা নাম নয়। কালো চাদরে আব্রুকরা আর নেকাব আঁটা দুই দুইটি মেয়েকে এক সংগে তলবদারের ড্রইংরুমে বসে থাকতে দেখে একেবারেই হক চকিয়ে গেল আগন্তুক মহিলারা। ভূত দেখার মতোই মুহূর্ত খানেক নির্বাক হয়ে গেল সবাই। এরপরেই একে অন্যকে সরবে বলতে লাগলো—ওমাই গড্! একিরে অজন্তা! এ আমরা কোথায় এলাম? এটা কি তলবদার আংকেলের বাড়ি না কোন একটা মৌলবাদীর আস্তানা। এত পর্দা আব্রুর সমাগম!

অজন্তা কিছু বলার আগেই মাধুরী মীর্যা তার পাশের জনকে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললো, তাইতোরে জুলিয়েট, ক্রমেই যে পর্দা-আব্রুর ছড়াছড়ি শুরু হলো এখানে। অনগ্রসর আর কূপমণ্ডুক মেয়ে মানুষে বাড়িটা যে দিন দিন ভরে যেতে লাগলো!

জুলিয়েট বিবি তাকে সায় দিয়ে বললো, ঠিক-ঠিক। এক ইয়াসমীনকেই তলবদার আংকল্ মানুষ বানাতে পারছেন না, তার উপর আবার এই জোড়ায় জোড়ায় সেকেলে মেয়ের আমদানী? ব্যাপার কি! তলবদার আংকল্ কি শেষমেষ তাহলে তাঁর মৌলবাদী শ্বশুর কূলের কাছেই আত্মসর্ম্পন করছেন?

এদের এই বেপরোয়া আচরণ আর অসংগত উক্তি ইয়াসমীন আরা কিছুক্ষণ নীরবে সহ্য করলো। এরপর সে সক্রোধে বললো, কি চাই এখানে? এ বাড়িতে আর এই ঘরে এসে তোমরা এমন দাফাদাফি করছো কেন? এটা কি কোন দেবালয় যে, মুসলমান মহিলারা এখানে অবাঞ্ছিত?

কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে মাধুরী মীর্যা সবিস্ময়ে বললো, আরে কে? ইয়াসমীন আরা নাকি? কি সর্বনাশ! নিজের বাড়িতেও এইভাবে বোরকা-নেকাব পরে চোখ মুখ ঢেকে নিয়ে বসে আছো? কি তাজ্জব! দিনে দিনে মনুষ্য-সমাজের এতটাই বাইরে চলে যাচ্ছো তুমি?

ইয়াসমীন আরা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো, যেতেই তো হবে। ঢেকে রাখার নামে গুপ্ত অঙ্গগুলো সরাসরি মেলে ধরে মনুষ্য-সমাজের এতটাই ভেতরে ঢুকে গেছো তোমরা যে, ঐ সমাজের বাইরে আসা ছাড়া, আমরা আর যাবো কোথায়? তা যাক সে কথা, তোমাদের বৃন্দাবন তো ওদিকের ঐ ক্লাব, মানে জালসাঘর। ওখানে গিয়ে নাচন-কুঁদন যা হয় তাই করোগে তোমরা এঘরে ঢুকে পড়েছো কেন?

এবার বন্দনা হক পাল্টা প্রশ্ন করলো, কেন, এখানে আসা কি আমাদের নিষেধ? এখানে আসতে তলবদার আংকেলের তো কোন আপত্তি দেখিনি কখনো?

ইয়াসমীন আরা বললো, তাঁর আপত্তি না থাকলেও আমার আপত্তি আছে। শুধু এঘরেই নয়, এ বাড়িতেই তোমাদের আসা নিয়ে চরম আপত্তি আছে আমার। কিন্তু তোমাদের আস্কারা দেয়া আব্বার যখন এতটাই গরজ তখন তোমাদের জন্যে তো আলাদা করে ঘর রেখেছেন উনি, তোমরা সেখানে যাও। এখানে এসে এমন অসভ্য আচরণ করছো কেন?

সংগে সংগে মিস্ জুলিয়েট উপহাস করে বললো, এ্যাঁ! কি বললে? অসভ্য আচরণ? আমরা অসভ্য আচরণ করছি? আরে, বলে কিরে মাধুরী! নিজেই যে সভ্য মানুষ হতে পারলো না আজ পর্যন্ত, সে বলে কিনা অসভ্য আচরণ করছি আমরা! বলিহারী যাই আর কি!

মাধুরী মীর্যা বললো, যোগ দিলো কবে মানে? এদের চেনোনা? এই জুলিয়েট চৌধুরী আর অজন্তা আহম্মদকে আগে কখনো দেখোনি? অন্তত ভারসিটিতে? ওদিকে আবার, তোমার মামা গৌতম সাহেব হাতে পায়ে ধরে কতবার এদের নিয়ে এসেছে এখানে, তাও কি চোখে পড়েনি তোমার? বিশেষ করে, এই অজন্তা যে কতবড় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, সেটাও কি জানো না?

ঃ আমার তা জেনে কাজ নেই। আমি জানতে চাই—অজন্তা দেবীরা অজন্তার দেশ ছেড়ে এই মৌলবাদীর দেশে পড়ে আছেন কেন?

বন্দনা হক বললো, অজন্তার দেশ মানে? ভারত?

ঃ হ্যাঁ, ভারত। ওটাই তো দেবীদূগ্গাদের পরম প্রিয় স্থান। ভারত ফেলে দেবী দূগ্গারা মৌলবাদীর দেশে থেকে মৌলবাদীদের সাথে পেঁচাল করছে কেন? ভারতে গেলেই তো পারে।

অজন্তা আহম্মদ এবার ফুঁশে উঠে বললো, ভারতে যাবো মানে? এই বাংলাদেশ আর ভারত কি আলাদা দেশ?

ইয়াসমীন আরা বিপুল বিস্ময়ে বললো, সেকি! আলাদা দেশ নয়?

ঃ না, একশোবার নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশকে এইভাবে ভারত থেকে পৃথক করা আমরা মানিনে—মানতেও চাইনে।

ঃ কেন মানতে চাওনা?

ঃ তাতে করে বাংলাদেশের কোন কল্যাণ তো হয়ইনি, বরং ক্ষতি হয়েছে বিস্তর।

ঃ কে বলেছে সে কথা?

ঃ এই বাংলাদেশেরই শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা। বিচারপতি কে.এম.আবদুস্ সোবহান, একটি বিশেষ দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রাজ্জাক এম.পি. চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি আবদুল আওয়াল মিন্টু ও জাহাঙ্গীর নগর ভারসিটির সাবেক ভি.সি. প্রফেসার আলাউদ্দীন আহমদ—প্রভৃতি বাংলার সর্বোত্তম সন্তানেরা।

ঃ এঁরাই বাংলার সর্বোত্তম সন্তান? এদের অধিক উত্তম আর কেউ নেই?

ঃ না-না, নেই। থাকতে পারে না।

ঃ আচ্ছা। তা কোথায় বলেছেন?

ঃ এই তো এই গত ২৮/২/২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি পরিষদের আয়োজিত সভায়। সেই সভায় এক ডজনেরও অধিক এদেশের সেরা সন্তানেরা একবাক্যে এই কথা বলেছেন। বলেছেন, ভারতকে একান্তই আপন আর পরম প্রিয় দেশ ছাড়া পর বা অনাত্মীয় ভাবার কোন অবকাশই নেই আমাদের।

এতক্ষণে মুখ খুললো নাজমা বেগম। সে প্রতিবাদ করে বললো, সে কথা আমিও শুনেছি। শুধু ওটুকুই নয়, তাঁরা ভারতকে নিয়ে আরো অনেক মাতামাতি করেছেন। ওদের তুমি বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান, সেরা সন্তান—এই সব বলছো?

ঃ হ্যাঁ-বলছি। তাঁরা সেরা সন্তান নন তো কি?

ঃ তাঁরা নিছক "ভাদা"। ভারতীয় দালাল। এদেশের সিংহভাগ মানুষের কাছে ধিককৃত ভারতীয় দালাল ওঁরা। দালালী করেন যাঁরা তাঁরা তো ও সব দালালীর কথা বলবেনই।

লজ্জিত হওয়ার বদলে অজন্তা আহম্মদ বরং খুশি হয়ে বললো, হ্যাঁ, পথে এসো। ভারতের দালালী করেন যাঁরা, তাঁরা কি পরম পুরুষ নয়? এই অবশ্য কর্তব্যটির পথ প্রদর্শক যাঁরা, তাঁদের তুমি ধিক্কৃত মানুষ বলছো?

ঃ কেন বলবো না? এটা কি কোন গৌরবের কাজ? নিজের দেশ ফেলে ভিনদেশের দালালী করাটা কি মহৎ কাজ কোন?

জবাব দিলো মাধুরী মীর্যা। সে দরাজকণ্ঠে বললো, হাজার বার মহৎ কাজ। এই মহৎ কাজটি এদেশের প্রত্যেকেরই করা উচিত। শুধু উচিতই নয়, প্রত্যেকেরই অবশ্যকরণীয় কাজ এটা। পথ প্রদর্শকের মতো এই বাস্তব বিষয়টিই তুলে ধরেছেন তাঁরা।

ঃ বটে! প্রত্যেকেরই করা উচিত? ভারতের দালালী করাটাকে প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য বলছো তুমি?

ঃ বলছি-বলছি। ডানবাম ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে বাংলাধেশের ১৪ কোটি মানুষের সকলেরই আশু কর্তব্য এটা। এই পরম কর্তব্য পালন যারা করে না, তারা কেবল অকৃতজ্ঞই নয়, বাংলার স্বাধীনতারও চরম শত্রু।

এবার ইয়াসমীন আরা ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো, চুপ্ করো। নেহায়েত একই ভারসিটিতে পড়ি বলে এতক্ষণ সহ্য করে যাচ্ছি তোমাদের। নইলে এই বাতুলতা শুরু করার আগেই চাকর ডেকে তোমাদের এই ঘর থেকে বের করে দিতাম। বেহায়াপনা করার আর জায়গা পেলে না? ভারতের দালালী করাটা এদেশের সকলের আশু কর্তব্য? ছি!

জবাবে এবার জুলিয়েট বিবিও চড়া গলায় বললো, অবশ্যই আশু কর্তব্য। শুধু দালালী করা কেন, ভারতের তোয়াজ করা, ভারতের মন জুগিয়ে চলা, ভারতবাসীর তুষ্টি সাধন করাও এদেশের প্রতিটি অধিবাসীর পরম কর্তব্য। বাঘের অনুগ্রহ পেতে হলে বাঘকে তোয়াজ করে চলাই বিড়ালের একমাত্র পথ। উত্তম পন্থাও বটে।

ঃ কে বাঘ আর কে বিড়াল? ভারত বাঘ আর বাংলাদেশ বিড়াল? বাঘের হামলা থেকে বাঁচার জন্যেই বাংলাদেশের সবাইকে ঐ বাঘকে তোয়াজ করা উচিত? মরি-বাঁচি লাঠি হাতে তুলে নেয়া কি উচিত নয় কারো? বাংলাদেশের সবাই কি এতটাই ভীরু?

ভাঁজ করা একখানা খবরের কাগজ হাতে ইয়াসমীনের তথাকথিত মামা আবদুল গণি গৌতম অন্দর থেকে এসে ড্রইংরুমে ঢুকলো এবং খবরের কাগজ খানা ইয়াসমীনের সামনে সবেগে ফেলে দিয়ে বললো, সেরেফ সে কারণেই নয়, আরো হাজারটা কারণ আছে ভারতের দালালী করার। কে.এম. সোবহান, আবদুর রাজ্জাক, আলাউদ্দীন আহমদ প্রমূখ অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সে সব কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সুস্পষ্ট ভাবে। তাঁরা যে বিবরণ দিয়েছেন, এই খবরের কাগজে সবই তা বেরিয়েছে। পড়ে দ্যাখো, তাহলেই বুঝতে পারবে, কেন ভারতকে আমাদের ভক্তি করা উচিত।

ইয়াসমীন আরা বিস্মিতকণ্ঠে বললো, একি মামা, আপনি?

গৌতম মিয়া বললো, হ্যাঁ আমি। দরজার ওপার থেকে আমি তোমাদের সব কথা শুনলাম। ঐ কাগজ খুলে দেখো, তাহলেই ভ্রান্তি তোমাদের ঘুঁচবে। তোমাদের মতো রাজাকার-আলবদর জাতীয় মেয়েদের তো মুখের কথায় বোধোদয় হবে না, এই কাগজ, অর্থাৎ এই লিখিত দলীল পড়ে দেখো—

আগন্তুক যুবতীরা এবার কলকণ্ঠে বলে উঠলো—ঠিক বলেছেন-ঠিক বলেছেন। এই কূপমণ্ডুক মেয়েরা তো চোখ মেলে গোটা বিশ্ব দেখে না, তাই সব কিছু বুঝতেও পারে না। এবার ঐ পত্রিকা পড়ে দেখুক, কতবড় সত্য আর ন্যায্য কথা নিয়ে মগজ ক্ষয় করছি আমরা।

মাধুরী মীর্যা এবার অভিমানী সুরে বললো, থাক ওসব কথা। উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে কাজ নেই। তা এত জরুরী তলব কিসের গৌতম ভাই? এমন ভাবে সবাইকে আমাদের ডেকেছেন যে, পড়িমরি তৎক্ষণাৎ ছুটে না এসে আর পারলাম না। কিসের এত তাড়া তাও বলেননি।

মিস্ জুলিয়েট আরো কাছে এসে আরো অন্তরঙ্গ সুরে বললো, ইয়েস-ইয়েস ব্যাপার কি ডিয়ার? ঘটনা কি সুইট্ গৌতম ভাই? ডাক দিয়ে নিজেই লাপাত্তা যে? জলসাঘরে গিয়ে দেখি কেউ নেই সেখানে।

গৌতম মিয়া ব্যস্তকণ্ঠে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, জরুরী কাজে একটু ভেতরে গিয়েছিলাম। চলো-চলো, সবাই ঐ ক্লাব ঘরে মানে জলসাঘরে চলো। জরুরী আলাপ আছে-খুবই জরুরী—।

সবাইকে তাড়া দিয়ে নিয়ে গৌতম মিয়া জলসাঘরে চলে গেল। ড্রইংরুম ফাঁকা হলে নাজমা বেগম হাঁফ ছেড়ে ইয়াস্‌মীনকে বললো, চল্ চল্, আমরাও ভেতরে যাই চল্। অনর্থক এই ফ্যাসাদে পড়ে অনেক দেরী হয়ে গেল আমার। ভেতরে গিয়ে সবার সাথে চটপট একটু দেখা করে আসি। ফিরতে দেরী হলে আমার উনি আবার নাখোশ হবেন বেজায়।

খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে ইয়াসমীন আরা সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব স্বাভাবিক। চল্—

ফারুক মাহমুদের দোকানে বসে ফারুক মাহমুদ ও মনোয়ার হোসেন দুবন্ধু গল্পের নামে দীর্ঘক্ষণ যাবত গেঁজিয়ে গেঁজিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো। ক্লান্ত হয়ে দুজনই নীরব রইলো কিছুক্ষণ। এরপর মনোয়ার হোসেন হঠাৎ করেই সরবে বলে উঠলো—ওহহো, তাইতো! আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করাই হয়ে ওঠে না। ব্যাপার কিরে ফারুক? তোর কি এক বৈষয়িক জটিলতা নিয়ে আর সেই সাথে তোর ভবিষ্যতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে কি যেন বলতে চেয়েছিলি সেবার? কই, সে সব তো আর বল্‌লিনে?

এ প্রশ্নে ফারুক মাহমুদ কিছুটা দমে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে না বোঝার মতো প্রশ্ন করলো—কোন ব্যাপার বল্‌তো?

মনোয়ার হোসেন বললো, সে কি! ঐ যে তোর বাড়িতে যাওয়ার আগের দিন তোর এই দোকানে বসেই বলেছিলি—কি যেন এক বৈষয়িক জটিলতা নিয়ে তুই ব্যস্ত

আছিস্ খুবই? সমাধান করতে না পারলে আমার সাহায্য নিবি বলেছিলি, সেটার কি হলো? জটিলতাটা কি কেটে গেছে?

ফারুক মাহমুদ সংগে সংগে বলে উঠলে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস। ব্যাপারটা সেই রকমই। মানে অনেকটাই কেটে গেছে। বাড়িতে গিয়ে সে জটিলতার সুরাহাটা প্রায় করে ফেলেছি—এই আর কি।

ঃ করে ফেলেছিস্?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, প্রায়। সেই জন্যেই এনিয়ে তোকে আর বিরক্ত করতে চাইনি।

মনোয়ার হোসেন গম্ভীরকণ্ঠে বললো, বিরক্ত করতে চাসনি? তোর কোন কাজে বিরক্ত হবো আমি—এই তোর ধারণা?

ঃ না-না, ঠিক বিরক্ত করা নয়, অপ্রয়োজনে তোর সময় নষ্ট করতে চাইনি, এই আর কি।

www.boighar.com

হাসতে লাগলো ফারুক মাহমুদ। মনোয়ার হোসেন নীরসকণ্ঠে বললো, হুঁ! তা বৈষয়িক সমস্যাটা কেটে গেছে, ভাল। কিন্তু তোর সেই ভবিষ্যতের লক্ষ্যটা? অর্থাৎ, বড় ব্যবসা বা চাকরী করা—বাড়িঘর করা—বিয়েথা করা—এসব? এসব নিয়েও কি আর ভাবার দরকার নেই তোর?

ঃ আছে-আছে। কিছুদিনের মধ্যে সব তোকে বলবো। চিন্তাভাবনাটা গুছিয়ে এনেছি অনেকখানি। স্থির-সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পৌঁছলেই তোকে বলবো। শুধু বলবোই না, তোর সাহায্যও চাইবো ফাইন্যাল টাচ্টা দেয়ার জন্যে।

ফারুক মাহমুদ আবার হাসতে লাগলো। মনোয়ার হোসেন বিরক্ত হয়ে বললো, আরে দূর! কেবলই তোর এড়িয়ে যাওয়ার বাহানা। যা তুই জাহান্নামে যা, আমার কি? ভবিষৎ নিয়ে তোর যখন কোনই চাড়-চেতনা নেই, আমি কেন খামাখা ছটফট করে মরি!

ঃ মনোয়ার!

ঃ থাকগে ওসব কথা। ওনিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাইনে।

ঃ নাখোশ হলি?

ঃ নাখোশ! তা হবো কেন? তোর গরজ যদি পড়ে তাহলে তুই নিজেই বলবি, না হলে বলবিনে। এনিয়ে নাখোশ হওয়ার কি আছে?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, সময় মতো ঠিকই আমি বলবো।

হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে মনোয়ার হোসেন বললো, সে যা হয় করিস্। কিন্তু ব্যাপার কি বলতো? বেলা প্রায় ডুবুডুবু, তবু তার কোন পাত্তা নেই, বাড়ি যাবো কখন?

প্রসঙ্গ খুঁজে পেয়ে ফারুক মাহমুদ নড়ে চড়ে বলে উঠলো—এ্যাঁ? কার কথা বলছিস্? তোর বিবি সাহেবার কথা? বিবি সাহেবা তোর এখনো কেন আসছে না, সেই কথা?

ঃ হ্যাঁ, সেই কথাই তো। গেলো তো একদম গেলই যে। আর ফেরার নামটি নেই! কেউ ভাগিয়ে নিয়ে গেল নাকি?

ফারুক মাহমুদ রসিকতা করে বললো, হ্যাঁ-তা পারেই তো। অসম্ভব নয়, মোটেই আসম্ভব নয়! কথায় বলে, নাও-লাঠি-নারী, যখন যার হাতে, তখন তারই"। একবার হাতছাড়া হলেই—

কথার মাঝেই সেখানে এসে হাজির হলো ইয়াসমীন আরা ও নাজমা বেগম। দোকান ঘরে ঢুকে একটু আড়ালে তারা দাঁড়ালো। দেখতে পেয়েই ফারুক মাহমুদ ফের উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো—আরে না-না, হারায়নি-হারায়নি। ঐ যে দ্যাখ্, এসে গেছে। যুগলে এসে গেছে। একটার জায়গায় দুইটা।

মুখচেপে হাসতে লাগলো ফারুক মাহমুদ। সেই হাসিতে যোগ দিয়ে ইয়াসমীন আরা মনোয়ার হোসেনকে লক্ষ্য করে বললো, বোনকে আমি পৌঁছে দিতে এলাম দুলাভাই। একটু দেরী হয়ে গেলো তো? সে জন্যে আবার গালফুলাবেন না যেন।

মনোয়ার হোসেন কপট রোষে বললো, কেন ফুলাবো না? একঘন্টার জায়গায় পাঁচঘন্টা লাগলে গালের কি দোষ? ওটা তো অমনি অমনি ফুলে উঠবে। অনর্থক এই এত দেরী পছন্দ করে কে?

ইয়াসমীন আরা বললো, হ্যাঁ, দেরীটা অনর্থকই হয়ে গেল। হঠাৎ করে বাজে এক ঝামেলায় পড়ে গেলাম কিনা, তাই আসতে দেরী হলো।

ফারুক মাহমুদ প্রশ্ন করলো—ঝামেলা? কিসের ঝামেলায় পড়ে গেলেন? কে ঝামেলা করলো?

ঃ দালালেরা, ভারতের দালালেরা।

ঃ ভারতের দালাল! কোথা থেকে এলো?

ঃ নতুন কেউ নয়। যারা সব সময় আমাদের বাড়িতে এসে ভিড় করে থাকে, সেই নারী-পুরুষের দল। আজ আবার ঝামেলা করেছিল মেয়েরাই বেশি। বন্দনা, মাধুরী জুলিয়েট, অজন্তা-এই সব মার্কা মারা রমণীকুল। সেই সাথে আমার সেই তথা কথিত মামা গৌতম মিয়াও।

ঃ তাই নাকি? কি বলে তারা?

ঃ ঐ যে ঐ বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি পরিষদের আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় আবদুর রাজ্জাক সাহেবেরা যা বলেছেন, সেই কথা। ঐ রাজ্জাক সাহেবদের মতো এদেশের সবাইকে ভারতের দালালী করতে হবে—এই নিয়ে ঐ মেয়েদের সাথে সেকি তর্ক! ওদের পক্ষে এসে আবার যোগ দিলেন আমার সেই মামা গৌতম মিয়াও।

ঃ বটে! কেন সবাইকে তা করতে হবে—সে কারণের কথা ওরা বলেনি?

ঃ বলেনি আবার? অনেক বলেছে। যেটুকু বাদ ছিল খবরের কাগজ এনে আমার মামা বাবু সেটুকুও পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

ঃ খবরের কাগজ?

ঃ হ্যাঁ, এই যে সেই কাগজ। আপনাদের দেখাবো বলে সে কাগজটা আমি হাতে করেই এনেছি। এই যে দেখুন—।

এগিয়ে এসে কাগজ খানা ফারুক মাহমুদকে দিয়ে গেল ইয়াসমীন আরা। কাগজ খানা খুলতে খুলতে ফারুক মাহমুদ বললো, তাজ্জব! একদম দলিল দস্তা-বেজের মাধ্যমে ওরা সেটা প্রচার করা শুরু করেছে?

নীরবে সব শুনে মনোয়ার হোসেন এবার ফারুক মাহমুদকে বললো, ঘটনাটা তো আমি তুই-দুজনেই জানি। তবু পড়তো ঐ কারণগুলো। কি লিখেছে এ কাগজে পড়ুতো, শুনি—।

কাগজে নজর রেখে ফারুক মাহমদু বললো, এযে একটা দু'টো নয়, দশ দশটা কারণ দেখছি।

মনোয়ার হোসেন বললো, হোক, তবু পড়।

কারণগুলো সিরিয়ালভাবে পড়তে লাগলো ফারুক মাহমুদ ঃ

১। ভারত আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ও মুক্তিদাতা। যারা ভারতের বিরোধিতা করে, তারাই বাংলাদেশের আসল শত্রু।

২। ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের কোনই লাভ হয়নি।

৩। ভারতের কারণেই আমরা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করেছি। ভারত ছাড়া বাংলাদেশ কখনো বাঁচতে পারবে না।

৪। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক হচ্ছে রক্তের সম্পর্ক। কারণ আমাদের আহত মুক্তি যোদ্ধাদেরকে ভারতীয়রাই রক্ত দিয়েছিল।

৫। দ্বিজাতি তত্ত্বের নামে ভারত বিভাগকে আমরা মেনে নিতে পারিনি বলেই ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি।

৬। ভারত আমাদের অর্থনীতির জন্যে কোন হুমকি নয়, বরং সহায়ক শক্তি। চীনই হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

৭। ভারত সিংহের মতো, আমরা ওদের তুলনায় বিড়াল মাত্র। বিড়ালের উচিত সিংহকে বিরক্ত না করা।

৮। ভারতের ঋণ আমাদের কখনোই শেষ হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশের কিছু মানুষ অযথাই অকৃতজ্ঞের মতো ভারতের সমালোচনা করে।

৯। আমরা ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় এবং ভারতের বিরোধিতা না করায় অনেকেই আমাদেরকে ভারতের দালাল আখ্যায়িত করে। কিন্তু এজন্য আমরা লজ্জিত বা বিব্রত নই, বরং ভারতের দালাল হতে পেরে আমরা গর্বিত। আমরা ভারতের দালাল হয়েই বেঁচে থাকতে চাই। যারা তা চায় না, তারা-নিমকহারাম।

১০। ভারতের দালালী বাংলাদেশের সকলেরই করা উচিত। ভারতের বিনিময়ে আমরা অন্য কোন দেশের বন্ধুত্ব চাই না।

ফারুক মাহমুদ থামলে মনোয়ার হোসেন ঈষৎ গম্ভীরকণ্ঠে ফারুক মাহমুদকে বললো, বে-ড়ে বলেছে বটে, না কি বলিস?

ফারুক মাহমুদও ঐ একই কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, "বে-ড়ে" বলা ছাড়া তো আর ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে।

ঃ এখন প্রথমেই ভেবে দ্যাখ, যেহেতু আবদুর রাজ্জাক সাহেবেরা নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একমাত্র ধারক বাহক মনে করেন এবং ভারতেরও দালালী করেন, সেইহেতু এটা কি ধরে নেয়া যায় না, তাঁদের মতে ভারতের দালালী করাই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা?

ফারুক মাহমুদ সরবে আর সোচ্চারকণ্ঠে সমর্থন দিয়ে বললো, ইয়েস্। হান্ড্রেড পারসেন্ট। তাদের কাছে সেটা তাই-ই।

মনোয়ার হোসেন ফের বললো, একজন মানুষ অন্যের দালালী করে তখনই যখন দালালীর বিনিময়ে নগদ প্রাপ্তি ঘটে। আমরাও তাদের মতো দালালী করলে ভারত আমাদেরকে কি পরিমাণ টাকা পয়সা দেবে, সে সভায় সে ব্যাপারে কিন্তু কে.এম. সোবহান—আবদুর রাজ্জাক—আলাউদ্দীন গংরা খোলাসা করে কিছুই বলেননি। নগদ প্রাপ্তি ঘটবে তাদের আর আমরা সবাই খালি হাতে দালালী করবো, এটা কি কোন কাজের কথা?

ফারুক মাহমুদ হেসে বললো, কখ্খনো নয়-কখ্খনো নয়।

ঃ ওদিকে আবার দ্যাখ, ১৯৭১ সালে ভারত আমাদেরকে আশ্রয় আর সামারিক সাহায্য না দিলে মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধে আমরা যেভাবে বিজয় অর্জন করেছিলাম, তা অবশ্যই সম্ভব হতো না-এটা ঠিক। কিন্তু তাতে কি আমাদের খুব ক্ষতি হতো? ভারতের আশ্রয় প্রশ্রয় না পেলে আমাদের তো যেতেই হতো জনযুদ্ধে। হয়তো বা হানাদারদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হতো বছরের পর বছর ধরেও। কিন্তু এরূপ জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করলে, সেটাই কি যথার্থ স্বাধীনতা হতো না? জনযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে উঠা নেতৃত্বই কি হতো না জাতির সত্যিকার নেতৃত্ব?

ঃ ওহ্! বিলকুল-বিলকুল। একদম ন্যায্য আর বাস্তব কথা বলেছিস্।

রাজনীতির লোক তুই, তোদের চোখ-মগজ সবই চোখা।

ঃ এই যে পরম দাসত্বমূলক ৭ দফা চুক্তি করে মুক্তিযুদ্ধের সর্বময় কমান্ড আর বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হলো আর কাঁঠাল পাকানো হলো কিলিয়ে এতে জাতি কি খুবই উপকৃত হলো?

ফারুক মাহমুদ বললো, কিছু মাত্র না। এক বিন্দুও নয়। যাদের মিনিমাম বোধশক্তিটুকু আছে, তারা একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবে।

ঃ ১৬ ডিসেম্বর থেকে ভারত যেভাবে ২০/২৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ বাংলাদেশ থেকে লুটে নিয়ে গেল আর এদেশের মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবীদাররা যেভাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তি লুট, রিলিফ লুট, লাইসেন্স-পারমিটবাজি, দখলবাজি, প্রাইভেট বাহিনীর মাধ্যমে প্রতিবাদকারীদের ঘায়েল—ইত্যাদির যে তাণ্ডব চালিয়েছিল, জনযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা নেতৃত্ব থাকলে এসব কি কোন দিনই সম্ভব

হতো? কোনদিনই কি সম্ভব হতো মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ব্রিফকেস্ আর মদের বোতল ধরিয়ে দিয়ে জাতি আর মুক্তিযোদ্ধা উভয়েরই এরকম মর্মান্তিক ক্ষতি সাধন করা?

ঃ নেভার-নেভার। আবদুর রাজ্জাক সাহেবেরা এটা চেপে গেলে আর স্বীকার করতে না চাইলে কি হবে, দিন বরাবর স্পষ্ট এ সত্য এদেশের একজন পাগলেও বোঝে।

ঃ ১৯৭১ সালে ভারত যে আমাদেরকে আশ্রয় আর সহায়তা দিয়েছিল, তা কি জন্যে দিয়েছিল? বাংলাদেশের মানুষ সকলেই তাদের দালালী করবে—এজন্য? নাকি, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, এদেশকে তাদের তাঁবেদার বানানো যাবে, তাদের ভালমন্দ সকল পণ্যের বাজার বানানো যাবে, এদেশের পাটের বাজার কেড়ে নেয়া যাবে, হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নেয়া যাবে—সেজন্যে? এই শেষের উদ্দেশ্যগুলির জন্যেই নয় কি? এখন আবদুর রজ্জাক সাহেবদের কথাই যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ ভারত যদি বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষকে দালাল বানানোর জন্যেই ১৯৭১ সালে আমাদেরকে আশ্রয় আর সাহায্য-সহায়তা দিয়ে থাকে, তাহলে কি সত্যিই আমাদের ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? কাউকে দালাল বানানো কি এতই মহৎ কাজ?

এবার ফারুক মাহমুদ ইয়াসমীন আরা ও নাজমা বেগম এক সাথে বলে উঠলো—শেম্! শেম্!

ঃ ১৯৭১ সালে যারা ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধ করেছেন, দিল্লী-কলিকাতা, দেরাদুন-আগরতলার সমস্ত কাণ্ডকীর্তন দেখেছেন আর দেখেছেন মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় ভূমিকা–তাঁদের মত হচ্ছে এই যে, ভারত ১৯৭১ সালে আমাদের সাহায্য সহায়তা দিয়েছিল প্রথমত ভারতের জাতশত্রু পাকিস্তানকে ঘায়েল করার জন্য, দ্বিতীয়ত বাংলাদেশকে ভারতের বৈধ-অবৈধ পণ্যের একচেটিয়া বাজার বানানোর জন্য, বাংলাদেশ থেকে যথাসম্ভব পণ্য সামগ্রী উঠিয়ে নেয়ার জন্য, পাটের আন্তর্জাতিক বাজার দখলের জন্য আর তৃতীয়ত বাংলাদেশকে তাদের লিও-কলোনী বা তাঁবেদার রাষ্ট্র বানানোর জন্য।

ফারুক মাহমুদ বললো, সম্পূর্ণ ঠিক। শুধু তারাই কেন, সেই সময় বুঝার বয়স যাদেরই হয়েছিল, তারাও প্রায় সবাই আজ এই কথাই বলে।

মনোয়ার হোসেন পুনরায় আবেগের সাথে বললো, আবদুর রাজ্জাক সাহেবেরা কি হিসেব করে দেখেছেন, ১৯৭১ সালে আমাদেরকে আশ্রয়-ট্রেনিং আর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ বাবদ ভারত কি পরিমাণ টাকা ব্যয় করেছিল আর বিজয়ের পর তারা যে সম্পদ বাংলাদেশ থেকে লুটে নিয়েছিল, ওদিকে আবার ৯৩ হাজার পাক সেনাদের যে অস্ত্র তারা হাতিয়ে নিয়েছিল তার মূল্য কত? আবদুর রাজ্জাক সাহেবেরা কি হিসেব রাখেন-বাংলাদেশের পাটের বাজার দখল করে ভারত এই গত ৩৩ বছরে কত হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে? কত হাজার কোটি টাকা তারা আয় করেছে

বাংলাদেশকে তাদের ভাল মন্দ, বৈধ-অবৈধ পণ্যের একচ্ছত্র বাজারে পরিণত করে? ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা-১৯৭১ থেকে ২০০৩ সালের ডিসেম্বার মাস পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা তাদের ১৯৭১ সালের ব্যয়ের তুলনায় কমপক্ষে দুশোগুণ বেশি।

গালে হাত দিয়ে ইয়াসমীন আরা ও নাজমা বেগম বললো, ওমা, কি সাংঘাতিক! কি সাংঘাতিক কথা!

ফারুক মাহমুদ বললো, সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক। এটা ভাবতে গেলেও ঘুরে যায় মাথা। অর্থাৎ চিন্তা করাই যায় না।

মনোয়ার হোসেন বললো, ভারত যে উদ্দেশ্য বা যে লক্ষ্য নিয়েই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়-ট্রেনিং-অস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে থাক না কেন, আমরা অবশ্যই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে আমাদের দালাল হতে হবে কেন? কেন ভারতকে দিতে হবে দশকের পর দশক ধরে বাংলাদেশকে শোষণ আর লুটের সুযোগ?

ফারুক মাহমুদ বললো, অবশ্যই। সে প্রশ্নই ওঠে না।

ঃ এ ছাড়াও ভরত দখল করে নিয়েছে বাংলাদেশের তালপট্টি দ্বীপ, নদী সংযোগ মহাপ্রকল্পের মাধ্যমে শুরু করেছে বাংলাদেশের তাবৎ নদীকে শুকিয়ে ফেলা আর বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য-ইকোলজিও ইকোসিস্টেমকে ধ্বংস করে দেয়ার কাজ। আশ্রয়-প্রশ্রয়, অস্ত্র আর ট্রেনিং দিচ্ছে শান্তিবাহিনী, বঙ্গসেনাসহ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপকে। যারা ভারতের দালাল তাদের কাছে এ সমস্ত কাজ খুবই মধুর আর উপাদেয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভারতের দালাল যারা নয়, তারা এই সমস্ত ভরতীয় কর্মকাণ্ডকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে আর করা উচিত—একবার ভেবে দেখো দেখি? দেশের প্রায় সত্তরভাগ লোক কি সহ্য করতে পারে এটা, না সহ্য করতে চাইবে?

ফারুক মহমুদ শক্তকণ্ঠে বললো, হরগিজ্ নেহি। তারা জান দেবে তবু এসব কিছুতেই সহ্য করবো না।

ঃ ভারত যে বাংলাদেশকে তাদের বৈধ-অবৈধ পণ্যের বাজারে পরিণত করে আমাদের শিল্পায়নের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে, তার জন্যেও কি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া আর দালালী করা উচিত? কি বলতে চান রাজ্জাক সাহেবরা? এতটার পরেও তাঁরা যদি ভারতের দালাল হয়েই বেঁচে থাকতে চান আর সেজন্যে গর্ববোধ করেন, তা অবশ্যই তাঁরা করতে পারেন। জাত "ভাদা" বলে কথা। কিন্তু অন্যেরা তা কখনোই পারেন না। পারেন না বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিতে। পারেন না দেশের চৌদ্দ কোটি মানুষকে অনুন্নত, পশ্চাতপদ আর যুগের পর যুগ ভারতের মুখাপেক্ষী করে রাখতে।

ফারুক মাহমুদ সোল্লাসে বলে উঠলো—সাব্বাস্-সাব্বাস! কি বাস্তব আর গভীর তোমার উপলব্ধি।

নাজমা বেগম ও ইয়াসমীন আরা ফের একসাথে বলে উঠলো—গভীর বলে গভীর? যেমনই গভীর তেমনই তীক্ষ্ণ।

ইয়াসমীন আরা বললো, এ সব ধারণা আমাদের আবছা আবছা থাকলেও, এতটা স্পষ্ট আর প্রশস্ত উপলব্ধি কখনো ছিল না।

মনোয়ার হোসেন বললো, থাকতে হবে। দলালেরা এই দালালীর প্রসঙ্গ বারেক উত্থাপিত করা মাত্রই তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে এসব। জোঁকের মুখে লবণ না পড়লে তো কামড় ছাড়বে না জোঁক।

এই সময়ে কদর আলী এসে বললো, সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে স্যার। চা কি আর একবার দেবো?

হুঁশে এসে মনোয়ার হোসেন ব্যস্তকণ্ঠে বললো, ওরে-বাপ্‌রে! না-না, আর চা নয়। বেলাটা যে একদম ডুবে গেছে তা খেয়ালই করিনি। রাস্তা-ঘাটের যে করুণ অবস্থা, নিরাপত্তা বলে কোথাও কিছু নেই। আমরা যাই। ইয়াসমীন সাহেবাকে তোমরা তাঁর বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসো— www.boighar.com

স্ত্রী নাজমাকে তাড়া দিয়ে নিয়ে মনোয়ার হোসেন তখনই বাড়ির দিকে রওনা হলো।

৮

রামিসা আনজুম্‌কে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের তালিম দিতে ফারুক মাহমুদ এখন আর প্রতিদিনই যায় না। সপ্তাহে একদিন বা দুই সপ্তাহে দুতিন দিন যায়। এই সপ্তাহে এই একদিন সে এলো। আনজুম্‌কে তালিম দেয়া শেষ করে উঠি উঠি করতেই ফারুক মাহমুদ পড়ে গেল ইয়াসমীন আরার আতিথেয়তার আবর্তে। ফারুক মাহমুদ দৈনিক এখন আসে না আর ইয়াসমীন আরা দৈনিক তার আতিথেয়তা করার সুযোগ পায় না বলে ইয়াসমীন আরার অভিমানের শেষ নেই। সপ্তাহে যে একদিন আসে, সে দিনটি হয় বিশেষ দিন ইয়াসমীন আরার জন্যে। শাহী আয়োজন না হলেও, তার ভাষায় তার গরীবানা আয়োজনটাও তাক্ লাগায় মেহমানকে।

তালিম নিয়ে আনজুম যখন উঠে গেল, তখন মাগরিব ওয়াক্ত যায় যায়। ড্রইংরুমে প্রায়ই এখন উট্‌কো লোকের ঝামেলা হয় দেখে, সপ্তাহের এই এক দুদিন আনজুমকে তালিম দেয়ার জন্যে পড়ার ঘরটা ছেড়ে দেয় ইয়াসমীন আরা। আজও এই পড়ার ঘরে বসেই তালিম দিলো ফারুক মাহমুদ। মাগরিবের সময় যায় দেখে ওখানেই সে আদায় করলো মাগরিবের নামাজ। নামাজ সেরে উঠতেই, ইয়াসমীন আরা হাজির হলো

একরাশ নাস্তাপানির সরঞ্জাম নিয়ে। তাকে সাহায্য করতে সংগে এলো কাজের মেয়ে জহুরা বিবি। আপত্তি করা বৃথা। আপত্তি করে কোনদিনই পার পায়নি ফারুক মাহমুদ। তাই বিনাবাক্যে সে বসে গেল নাস্তায়।

নাস্তাপানির শেষেও উঠি উঠি করে উঠতে পারলো না ফারুক মাহমুদ। ইয়াসমীন আরার সুখ দুঃখের একটার পর একটা গিট্ খুলতে খুলতে কেটে গেল আরো খানিক সময়।

এরপর যখন ছাড়া পেয়ে চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো ফারুক মাহমুদ, তখন তার বেরোনোর পথটাই বন্ধ হয়ে গেল।

ড্রইংরুমটা নির্জন ছিল এতক্ষণ। ফারুক মাহমুদের বেরোনোর পথ ঐ ড্রইংরুমের ভেতর দিয়েই। ড্রইংরুম আর ইয়াসমীনের পড়ার ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করা ছিল। ফারুক মাহমুদ উঠে ঐ দরজার কাছে আসতেই মহাপ্রলয় শুরু হলো ড্রইংরুমের বাহির দিকের দুয়ারে এবং সে প্রলয় তৎক্ষণাৎ চলে এলো ড্রইংরুমের ভেতরে। তুমুল হুটপাট, হৈচৈ আর আহাজারি শুরু হলো সেখানে।

থেমে গেল ফারুক মাহমুদ। ইয়াসমীন আরার ইশারায় ফের ফিরে এসে বসে পড়লো সে। ড্রইংরুমে তখন শোনা যাচ্ছে তলবদার সাহেব, গৌতম, নাজমুল আলম নানক আর মাঝে মাঝে নওকর ইরফান মিয়ার গলা। এই সময় এই রাতে ইয়াসমীনের ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে পড়লে বিষয়টা মোটেই প্রীতিকর হবে না, অপ্রিয় এক কৌতূহলের সৃষ্টি হবে বুঝে, তাকে থামিয়ে দিলো ইয়াসমীন। এঁটো থালাবাটি সহকারে অন্দরমুখী দরজা দিয়ে অন্দরে চলে গেল কাজের ঝি জহুরা বিবি। ইয়াসমীন আরাও উঠে দাঁড়িয়ে চাপাকণ্ঠে ফারুক মাহমুদকে বললো, চুপ করে বসুন। ওরা হয়তো এখনই চলে যাবে অন্দরে আর উপর তলায়। ওরা চলে গেলে বেরোবেন। আমি এই আশেপাশেই আছি।

ফারুক মাহমুদও চাপাকণ্ঠে বললো, আপনার আব্বা যে আর্তনাদ করছেন কেবলই, ঘটনা কি?

ইয়াসমীন আরা বললো, সেইটেই জানার জন্যে ড্রইংরুমের ঐ ভেতরের দরজার দিকে যাচ্ছি আমি। কোন কথা না বলে আপনি চুপচাপ বসে থাকুন। ড্রইংরুম ফাঁকা হতে বেশি সময় লাগবে না বলেই মনে হচ্ছে।

ইয়াসমীন আরাও অন্দরমুখী দরজা দিয়ে তার পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নীরবে বসে রইলো ফারুক মাহমুদ। ড্রইংরুমে চলতে লাগলো তাণ্ডব। ইয়াসমীনের আব্বা তলবদার সাহেব আর্তনাদ করে পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন, হায়-হায় আমার সব গেল! আমি সর্বশান্ত হয়ে গেলাম! একদম পথে বসে গেলাম আমি!

তলবদারকে ধরে নিয়ে ইরফান মিয়া ড্রইংরুমের কাছাকাছি আসতেই তলবদারের আহাজারি শুনে "কি হলো-কি হলো"—বলে ক্লাবঘর থেকে ছুটে এলো গৌতম ও নানক। প্রশ্ন করতে করতে তারাও তলবদারকে ধরে নিয়ে ড্রইংরুমে এলো। কিন্তু

কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তলবদার সাহেব কেবলই "আমার সব গেল-সব গেল" করতে লাগলেন। তলবদারের কাছে কোন জবাব না পেয়ে গৌতম মিয়া চাকর ইরফান মিয়াকে প্রশ্ন করলো—তোমরা কোথা থেকে আসছো? কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

জবাবে ইরফান মিয়া বললো, কোর্টে। আমরা কোর্ট থেকে আসছি।

গৌতম মিয়া চমকে উঠে বললো, সেকি! আজ কি মামলার দিন ছিল?

ইরফান মিয়া বললো, জি। তাই তো ছিল। কোর্টে যাওয়ার সময় সাহেব আপনাকে কত খুঁজলেন, কিন্তু পাওয়াই গেল না আপনাকে।

ঃ কোন খারাপ খবর আছে নাকি? মানে, মামলার রায়-টায় হয়ে গেল নাকি?

ঃ আমি কি সে সব বুঝি? তবে আদালতের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই সাহেব এই রকম হা হুতাশ জুড়ে দিয়েছেন।

ঃ সর্বনাশ! ঘটনা কি?

নাজমুল আলম নানক বললো, আগে আংকেলকে বসাও না ঐ সোফাসেটে। উনাকে একটু থামতে দাও। উনি একটু শান্ত হলেই জানা যাবে সব কিছু।

তাই করা হলো। তলবদার সাহেবকে এনে সোফাসেটে বসানো হলো। মাথার উপরের ফ্যানটাও ফুল ফোর্সে ছেড়ে দেয়া হলো। এরপর গৌতম মিয়া ইরফান মিয়াকে বললো, এই যাও তো, এক গ্লাস পানি আনো জলদি। দুলাভাইয়ের গলাটা কেমন শুকিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে।

সংগে সংগে গর্জে উঠলেন তলবদার সাহেব। থাক, আর দরদ দেখাতে হবে না। আমার এতবড় সর্বনাশটা কে করলো, তাই আগে বলো?

গৌতম মিয়া ভয়ে ভয়ে বললো, সর্বনাশ! কি সর্বনাশ দুলাভাই? মামলায় কি হেরে গেছেন আপনি?

তলবদার সাহেব সরোষে বললো, হেরে না গেলেও, ঐ হেরে যাওয়ার মতোই। আমার এ সর্বনাশ কে করলো, তাই বলো?

ঃ কি সেই সর্বনাশ দুলাভাই?

ঃ মহাসর্বনাশ। তুমি ছাড়া তো এই গোপন তথ্য আর কেউ জানতো না! এটা ফাঁশ করলো কে?

ঃ গোপন তথ্য! কিসের কথা বলছেন? ঘটনাটা আগে খোলসা করে না বললে, বুঝবো কি করে?

ঃ আর বুঝে কাজ নেই। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়েছে।

ঃ অর্থাৎ? তার মানে কি?

ঃ এতদিন মামলাটা ছিল বিক্রেতার চিট্ করার উপর। অর্থাৎ ডবল্ সেলের মামলা। দুবার বিক্রয়ের মামলা। বিক্রেতা ঐ মৃত ফিরোজ আহমদের কাছে একবার আর আমার স্ত্রীর কাছে অর্থাৎ আমার মেয়ের নামে আর একবার—এই দুবার বিক্রয় করেছে বিক্রেতা। বিক্রেতা চিট্ করেছে। একই সম্পত্তি দুবার দুজনের কাছে বিক্রয়

করেছে—মামলাটা এতদিন এই ইস্যুর উপর ছিল। দুটি দলিলেই বিক্রেতার সই আছে, হাকিম এতদিন এই বুঝেছিলেন আর মামলাটাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই ফায়সালা করার চেষ্টা করছিলেন।

ঃ তারপর?

ঃ আজ বাদীপক্ষের উকিল ধরিয়ে দিয়েছে যে, বিক্রেতা চিট্ করেনি। আমার মেয়ের নামে কেনা দলিলটাই জাল। দলিলের ঐ সই বিক্রেতার সই নয়।

আর একদফা চমকে উঠে গৌতম মিয়া বললো, সেকি! সেকি কাণ্ড!

তলবদার সাহেব বললো, সেই কাণ্ডই ঘটেছে। তুমি তো জানো, মালিকের সইটা এমন নিখুত ভাবে নকল করেছিলাম আমি যে, ঐ সইটা জাল, এটা ধরার সাধ্য কারো ছিল না। হাকিমও ধরতে তা পারেন নি। ফলে যেহেতু আমার মেয়ের নামেই দালীলটা আগে করে দিয়েছে আর বাড়িঘর মিলকারখানা সব আমদের মানে আমার মেয়ের দখলে আছে, সেহেতু পরে দলিল করে নেয়া বাদীর দাবী নিতান্তই দুর্বল দাবী—এই মর্মে মামলার রায়টা আমদের পক্ষেই এসে গিয়েছিল। জিতে যাচ্ছিলাম আমরা। অন্য কোন শক্ত যুক্তি আর কাগজপত্র দেখাতে না পারায় নেতিয়ে পড়েছিল বাদীপক্ষের উকিল। আর একটা তারিখ পার হলেই রায়টা আমাদের পক্ষেই আসতো। মামলায় জিতে যেতাম আমরা। এই বিষয় সম্পত্তি সব আমাদেরই থাকতো। এই সময় আমাদের দলিল জাল ও সই বিক্রেতার সই নয় বলে বাদীপক্ষের উকিল শক্ত-কণ্ঠে দাবী তোলায়, সব গোলমাল হয়ে গেল।

ঃ বলেন কি! শুনে হাকিম কি বললেন?

ঃ বলবেন আবার কি! সঙ্গে সঙ্গে সই দুটি মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। মিল কারখানার কাগজপত্রে বিক্রেতার আগের যে সব সই স্বাক্ষর ছিল, বাদীপক্ষ সেগুলো হাকিমের কাছে সাব্‌মিট করায় হাকিম সেই সই স্বাক্ষরের সাথে আমাদের দলিলের সই মিলিয়ে দেখতে লাগলেন।

ঃ তারপর?

ঃ কিছুক্ষণ গভীরভাবে মিলিয়ে দেখার পরেই হাকিমের মুখের চেহারা বদলে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, "তাইতো, সইটাতো বিক্রেতার সইয়ের সাথে মিলছে না। হস্তাক্ষরটা তো এক হস্তাক্ষর নয় বলেই মনে হচ্ছে!

ঃ দুলাভাই।

ঃ এরপরেই সইগুলো তিনি এক্সপার্টের কাছে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। সইগুলো পরীক্ষা করে দেখে এক্সপার্ট রিপোর্ট দিলেই রায় দেবেন হাকিম। এক্সপার্ট সইটাকে জাল না বললে বিষয় সম্পদ সব আমদেরই থাকতে পারে, জাল বললে সম্পত্তি থেকে আমরা সংগে সংগে আউট। সব কিছু বাদীপক্ষের হবে।

হায়-হায়, কি যে হয়, কে জানে!

নাজমুল আলম নানক এবার সদর্পে বললো, অসম্ভব। হবে বললেই হলো।

তলবদার সাহেব বললেন, অর্থাৎ?

নানক বললো, মোটেই ঘাব্‌ড়াবেন না আংক্‌ল্‌। এইযে এক গাদা জোয়ান জোয়ান ছেলে মেয়ে আপনার জলসাঘর জাঁকিয়ে নিয়ে বসে আছি আমরা আর বলতে গেলে আপনিই আমাদের পালছেন, সেটা কি অম্‌নি অমনি? মামলায় হেরে গেলেই কি সব হারাবার জন্য? আপনি মোটেই হতাশ হবেন না। আমারা থাকতে দেখি, আপনার বাড়িঘর আর মিলকারখানা দখল করে কোন বাপের বেটা? এমন লাঠিপেটা করবো যে ওসবের কাছে কোন ব্যাটা ভিড়তেই পারবে না। এর উপর এই সব ডপ্‌কি ডপ্‌কি মেয়েদের দিয়ে একটার পর একটা এমন রেপ্‌কেস্‌ ঠুকে দেবো যে, কোন কিছুর দখল নেয়া তো দূরের কথা, বাপ বাপ করে এই শহর থেকে পালানোর পথ পাবে না ঐ ভিন্‌ এলাকার বাদীর ছেলে।

তলবদার সাহেব অসহায় কণ্ঠে বললেন—আরে সে সব তো অগত্যার কথা। মামলায় নিতান্তই জিততে না পারলে, ওটা একটা শেষ চেষ্টা মাত্র। তোমরা আছো আজগুবী হামলা-ধাক্কা সামাল দেবে বলে। মামলায় জেতাটাই হলো আসল। দখলের জোর একটা জোর হলেও, মামলায় হেরে যাওয়ার পর সেটা আর তেমন কোন কায়েমী জোর নয়।

গৌতম মিয়া প্রশ্ন করলো, মামলায় জেতার কি কোন সম্ভাবনাই দেখছেন না দুলাভাই?

ঃ সম্ভাবনা আর কি! এক্সপার্টের ঐ একটা রিপোর্টই এখন সব। ওরই উপর ঝুলে আছে সব কিছু।

ঃ এক্সপার্ট কি আমাদের বিপক্ষেই রিপোট দেবে বলে ভাবছেন?

তলবদার সাহেব ফের অসহায় কণ্ঠে বললেন, তাই দেয়াই তো স্বাভাবিক। সইটাতো আসলেই জাল।

ঃ সেকি! তাহলে উপায়?

ঃ উপায় এখন একটাই। একগাদা টাকা দিয়ে আমাদের উকিলকে পাঠিয়ে দিলাম ঐ এক্সপার্টকে হাত করতে। যদি হাত করতে পারে, তবেই ভরসা।

গৌতম মিয়া হাঁফ ছেড়ে বললো, যাক তবু তো আশা এখনো আছে। সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি।

তলবদার সাহেব পুনরায় ক্ষোভের সাথে বললেন, যায়নি, যেতে কতক্ষণ? ওসব ধানাই পানাই রাখো। এ সর্বনাশ কে করলো আমার, সেই কথা বলো? বাদীপক্ষের কানে কে দিলো এ কথা যে, ঐ সই জাল? এই দীর্ঘদিন যাবত কেউ যেটা স্বপ্নেও ভাবেনি, এমন নিখুঁতভাবে জাল করা যে, ভাবতে পারতোও না কখনো, সেখানে এ সর্বনাশ কে করলো আমার? বাদী পক্ষের কানে কে দিলো এ কথা?

ঃ দুলাভাই?

ঃ একমাত্র তুমি ছাড়া একটা কাকপক্ষীও এ কথা জানতো না। তুমি বলে না দিলে ওরা এ তথ্য পেলো কোথায়?

গৌতম মিয়া সবিস্ময়ে বললো, সেকি। আমি?

তলবদার সাহেব চড়া গলায় বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি। নিমকহারাম, মনে তোমার এই ছিল?

ঃ দোহাই দুলাভাই, এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কখনো এ কথা তাদের জানাইনি।

ঃ তাহলে তারা জানলো কোথা থেকে! তুমি কি একথা কখনো তিন কান করেছিলে? আর কাউকে বলেছিলে একথা? আমি তুমি ছাড়া তৃতীয় আর কেউ তো এ কথা জানতো না।

অলক্ষ্যে এবং তড়িৎবেগে গৌতম মিয়া তার পার্শ্বে উপবিষ্ট নানকের দিকে তাকালো। এতে করে নানকের চোখ মুখও শুকিয়ে গেল। এরপর গৌতম মিয়া বললো, কছম করে বলছি দুলাভাই, একথা আর কাউকে আমি বলিনি।

তলবদার সাহেব বললো, তাহলে আমাকে জানতে হবে-এ তথ্য বাদীপক্ষ পেলো কোথায়? কে দিলে এই খবর-কে করলে এই সর্বনাশ—

বলতে বলতে আর টলতে টলতে অন্দরের দিকে রওনা হলেন তলবদার সাহেব। এই ফাঁকে গৌতম মিয়া নানকের দিকে ইংগিত পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই নানক চাপা এবং ব্যস্তকণ্ঠে বললো, বিশ্বাস করো ভাই, আমি কাউকে বলিনি। আমিও এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

গৌতম মিয়া বললো, তাজ্জব! তাহলে কথাটা ফাঁশ হলো কি করে?

ঃ গৌতম!

ঃ আচ্ছা থাক। এখন আয় দেখি, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে তলবদার সাহেব পড়ে যেতে পারেন—তাঁকে আগে সামলাই আয়। ইরফান মিয়াটা যে কোথায় গেল আবার।

ঃ কিন্তু এ খবর কে জানালো তাহলে?

ঃ সে খবর পরে করার চেষ্টা করবো, এখন আয়—

নানককে ঠেলে নিয়ে গৌতমও তলবদারের পেছনে ছুটলো এবং তলবদারসহ সবাই তারা উপর তলায় উঠে গেল।

এদের উপর তলায় উঠতে দেখেই ফারুক মাহমুদের কাছে ছুটে এলো ইয়াসমীন আরা। এসেই সে ফারুক মাহমুদকে আকুলকণ্ঠে বললো, এঁদের সব কথাকি শুনেছেন?

ফারুক মাহমুদ বললো, হ্যাঁ শুনেছি।

ইয়াসমীন আরা বললো, হায়-হায়! একি দুঃসংবাদ। এখন কি হবে?

ইয়াসমীন আরার চোখে মুখে অসহায়ভাব ফুটে উঠলো গভীরভাবে। ফারুক মাহমুদ প্রশ্ন করলো, কিসের কি হবে?

ঃ ঐ দলিল জাল বলে প্রমাণ হয় যদি?

ঃ জাল দলিল জাল বলে প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনাই তো বেশি।

ঃ সর্বনাশ! তাহলে তো আমরা হেরে যাবো মামলায়। বাদী এসে নিয়ে নেবে সব কিছু। এই বাড়িঘর-মিলকারখানা সব, ফারুক মাহমুদ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, ঠিকমতো বিচার হলে তাই তো নেয়ার কথা।

ঃ মাহমুদ সাহেব।

ঃ আইনে পেলে যার জিনিস সে তা নেবে না! আপনি দুঃখ করে করবেন কি?

ঃ তাহলে আমাদের কি হবে? আমরা যাবো কোথায়?

ঃ তেমন দুর্ভাগ্য যদি হয়ই আপনাদের, আপনারা আপনাদের আগেকার বাড়িতে চলে যাবেন।

ঃ সেকি! সেখানে গিয়ে খাবো কি? আব্বার তো আর চাকরী বাকরী কিছু নেই। মিলকারখানার আয় উপায় চলে গেলে কি খেয়ে বাঁচবো আমরা?

ঃ সেটা ভেবে কি করবেন? জীবন দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

ঃ কথাটা ঠিক হলেও সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। একদম ছাপ্পড় ফেঁড়ে আহার আল্লাহ দেন না। সে জন্যে একটা উপলক্ষ্য চাই। অম্নি অম্নি নয়।

ঃ উপলক্ষ্য অবশ্যই চাই আর আপনিইতো সেই উপলক্ষ্য। শুনেছি, পাশ করে বেরুলেই ভারসিটিতে চাকরী পাবেন আপনি। তখন আর আপনাদের এই দুই-তিনটে মানুষের কোন অভাব থাকার তো কথা নয়।

ইয়াসমীন আরা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো, আমাদের দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা দেখেই আপনিও উপহাস শুরু করলেন?

ফারুক মাহমুদ শশব্যস্তে বললো, উপহাস! তওবা-তওবা! তা করবো কেন? আমি তো একটা সম্ভাবনার কথা বললাম মাত্র।

ঃ এটা সম্ভাবনার কথা নয়, কাঁঠাল গাছে থাকতেই গোঁফে তা দেয়ার কথা। পরীক্ষা দিলামই না, পরীক্ষা ভাল হবে কি খারাপ হবে তার ঠিক নেই, ভারসিটিতে চাকরী পাওয়ার কিস্মত আদৌ হবে কিনা, আর আপনি আগেই বলে দিলেন সেই কথা? আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই ধরনের কথা কি ঠাট্টার পর্যায়ে পড়ে না?

ঃ না-না, কথাটা আমি আদৌ সেভাবে বলিনি। আপনি আগেই খুব ভেঙ্গে পড়ছেন বলে অবলম্বনের পথ বাত্লাতে গিয়ে ওকথা বলেছি। নইলে, অবলম্বন কি ঐ একটা? আল্লাহ দিলে কখন কোন্ অবলম্বন কোন্ দিক থেকে এসে যাবে, আপনি তা ভাবতেই পারবেন না।

ঃ এসে যাবে?

ঃ জরুর এসে যাবে। মুস্কিলও যেমন আছে, আসানও তেমনি আছে।

ঃ যথা?

ঃ ইতিমধ্যেই ভাল ঘরে আপনার বিয়ে-থা হয়ে যেতে পারে, আপনার বড়লোক মামারা আপনাদের সাহয্যে এগিয়ে আসতে পারেন, আপনার আব্বারও আয় উপার্জনের নতুন পথ ঘাট বেরিয়ে আসতে পারে। অবলম্বনের সম্ভাবনা কি একটা দুটো?

ঃ বটে! আমার বিয়ে-থা'কেও একটা অবলম্বন বলছেন?

ঃ বলছিই তো। ভাল একটা শাদি হলে, অর্থাৎ আপনি একটা সৎপাত্রের হাতে পড়লে, সেটা কি একটা অবলম্বন নয়? নিজেতো অবলম্বন আপনি পেয়েই যাবেন, তার উপর আপনার পাত্রটা যদি সৎ মানুষ হন, তাহলে আপনার আব্বা-আম্মারও একটা অবলম্বন খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন তিনি। হয়তো—।

ইয়াসমীন আরা প্রতিবাদ করে বললো, ফের ঐ 'হয়তো' আর 'যদি'র কথা? ওটাও কি আদৌ কোন অবলম্বন?

ঃ কেন নয়?

ঃ ইচ্ছে করলেই কি সৎপাত্র পাওয়া যায় যখন তখন? সেটা কি গাছের ফল? এসব মিথ্যা আশ্বাস বন্ধ করুন। দুঃসময় এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে গেলে সৎপাত্র ঠিক সেই মুহূর্তে জুটবে কোত্থেকে, শুনি?

ফারুক মাহমুদ এবার ঈষৎ হেসে বললো, তাহলে আগে থেকেই খুঁজতে শুরু করুন।

ঃ ফের?

ঃ আহহা! দুঃসময়ের প্রসঙ্গটা না হয় ছেড়েই দিলাম। দুর্ভাগ্য আসুক আর না আসুক, শাদির বয়সটাতো হয়েছে আপনার। আজ হোক, কাল হোক, শাদি যখন করতেই হবে, সৎপাত্র আপনি এখন থেকেই খুঁজতে শুরু করুন।

ইয়াসমীন আরাও এবার একটু হাল্কা কণ্ঠে বললো, খুঁজতে শুরু করবো? এও কি একটা কথা হলো? নিজের পাত্রের খোঁজ কি নিজে করা যায়?

ঃ নিজে না করলে আর করবে কে? আপনার আব্বার যা মতি গতি, তাঁর তো কোন ভ্রূক্ষেপই নেই এদিকে। আপনার হয়ে খুঁজবে কে?

ইয়াসমীন আরা ফস্ করে বললো, আপনিও তো খুঁজতে পারেন।

বিভ্রান্ত ভাবে চেয়ে ফারুক মাহমুদ বললো, এ্যাঁ, কি বললেন?

ঃ এতই যখন বোঝেন আমার খোঁজার কেউ নেই, একাজটা তো আপনিও করতে পারেন। পারেন না?

ফারুক মাহমুদ ভড়কে গিয়ে বললো, আমি?

ইয়াসমীন আরা বললো, আপনি একজন সৎ লোক। আর একটা সৎ লোক খুঁজে বের করা কি আপনার পক্ষে খুবই কঠিন?

ঃ ইয়াসমীন সাহেবা!

ঃ অবাক হচ্ছেন কেন? অনেকদিন থেকেই একথাটা আপনাকে বলবো বলবো করছি আমি। বিশেষ করে আপনার বন্ধুর সাথে আমার বোন নাজমার শাদিটা যেদিন

হলো, সেই দিন থেকেই। কিন্তু শরমের কারণে আপনার কাছে তুলতে পারিনি সে কথাটা। আজ যখন প্রসঙ্গটা উঠেই পড়লো, নিন না সে দায়িত্বটা আপনি। দিন না খুঁজে একটা অবলম্বন আমার।

ঃ সেকি! আমি?

ঃ হ্যাঁ আপনি। এত ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক আপনার সাথে আমার, আর একটা অবলম্বন খুঁজে দেয়ার কষ্টটুকু কি করবেন না আমার জন্যে?

ঃ তার-মানে—

ঃ আর কিছু লেখাপড়া করলে খোঁজাখুঁজি করতেই হতো না। আপনি নিজেই তো হতে পারতেন আমার অবলম্বন। চাই কি, কিছুটা বড় ধরনের দোকান পাট, তথা ব্যবসাপাতি শুরু করলে এখনো তা হতে পারেন আপনি।

ইতিমধ্যে ড্রইংরুমের দিকে ইরফান মিয়ার গলাশোনা গেল। ফারুক মাহমুদ চমকে উঠে বললো, এইরে, ড্রইংরুমে আবার বুঝি এসে গেল লোকজন।

ইয়াসমীন আরা নির্দ্বিধায় বললো, আসুক।

ফারুক মাহমুদ সবিস্ময়ে বললো, তার অর্থ? লোকজন এসে গেলে আমি বেরুবো কি করে?

ঃ তাদের সামনে দিয়েই বেরুবেন।

ঃ সেকি! তারা তাহলে মনে করবেন কি? এতো রাতে আপনার এই ঘর থেকে বেরুলে, আজই তো আমাকে আপনাকে ঘিরে একটা কুৎসা রটে যাবে!

ঃ যায় যাক। সেটা গেলেও তো একটা পথ পাই।

ঃ কি রকম-কি রকম?

ঃ সকলের মুখ বন্ধ করতে আপনাকেই আমার অবলম্বন বানিয়ে নেবো। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘরে দৌড়ে গিয়ে উঠলে, আপনি আর আমাকে ফেলে দেবেন কি করে?

ঃ ইয়াসমীন আরা!

ঃ যে দুর্দিনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে সামনে, তাতে এটাই বা মন্দ হবে কি? হলেনই বা সামান্য একজন দোকানদার, এমন সৎলোকের উপর নির্ভর করলে, মোটেই ঠকা হবে না আমার।

ঃ একি অসম্ভব কথা বলছেন?

ঃ মোটেই অসম্ভব নয়। শেষমেষ হয়তো এইটেই করতে হবে আমাকে।

ঃ ইয়াসমীন আরা!

ঃ একজন ডুবন্ত মানুষ হাতের কাছে খড়-কুটো যা পায়, তাই আঁকড়ে ধরে। এ ড্রাউনিং ম্যান্ ক্যাচেস্ এ্যাট্ স্ট্র—বলেই আন্দরের দিকে ছুটে পালালো ইয়াসমীন আরা।

সপ্তাহ দুই হলো আর পাত্তা নেই ফারুক মাহমুদের। সেই যে রাত্রিবেলা চলে এলো ইয়াসমীন আরাদের বাড়ি থেকে, তারপর আর একবারও সে যায়নি সেখানে। অপেক্ষায় থেকে থেকে ইয়াসমীন আরা গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। ভাবতে লাগলো, তাহলে কি সত্যি সত্যিই কেটে পড়লো লোকটা। আবেগের মুহূর্তে আমার ঐ কথাটা শুনেই কি ঘাবড়ে গেল সে আর বাদ দিলো এদিকের যাতায়াত? ঈমানটা তার তাহলে কি এতটাই দুর্বল? ভেতর আর বাহির তাহলে কি তার সত্যিসত্যিই আলাদা? আবেগের ঐ একটা কথাতেই যে ভয় পায়, দুর্দিনের সঙ্গী হতে সাহস নেই যার, তাকে আর শক্ত ঈমানের মানুষ বলে ভাবা যায় কি করে? ভাবতে লাগলো, ঘটনা কি, তা তো একবার দেখতে হয় যাচাই করে।

ভাবতে ভাবতে অবশেষে যাচাই করতেই চলে এলো ইয়াসমীন। ফারুক মাহমুদের বাড়িতে এসে দেখে, দোকান পাট সব বন্ধ দোকান ঘরের দুয়ার জানালা সব ভেতর থেকে বন্ধ করা। ভেতরের দিকের দেউটির দুয়ারটাই খোলা আছে মাত্র।

দেউটি দিয়ে ভেতরে এলো ইয়াসমীন। ভেতরে এসে দেখে, ঢন ঢন করছে বাড়ি। ফারুক মাহমুদের শয়ন ঘরের দুয়ারে শিকল লাগিয়ে দিয়ে বারান্দায় বসে ঝিমুচ্ছে আধবুড়ো এক লোক। লোকটার চোখ ভাল থাকলেও কানে শোনে কম, জ্ঞানবুদ্ধি তার আরো কম। এক পা দু'পা করে লোকটার কাছে এসে ইয়াসমীন আরা প্রশ্ন করলো, তুমি! তুমি কে?

চোখ মেলে চেয়েই লোকটা সোজা হয়ে বসলো এবং বললো, উমিদ? উমিদ আলী বাড়ি গেছে।

ইয়াসমীন আরা ফের প্রশ্ন করলো, উমিদ আলী! সে আবার কে?

লোকটা বললো, আবার কবে আসবে জানিনে। আমাকে বলে গেছে, যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ বসে থাকো, কোথাও যেও না।

ইয়াসমীন আরা ফাঁপরে পড়ে গেল। বিরক্তির সাথে পুনরায় প্রশ্ন করলো, বেশ করেছে। তা তুমিই বা কেন, আর উমিদ আলীই বা কেন? কদর আলী কোথায়, কদর আলী?

ঃ বাড়ি গেছে।

ঃ ফের বাড়ি গেছে! কদর আলী মানে এই বাড়ির চাকর কদর আলী। সে কোথায়?

ঃ সেই চাকরই তো বাড়ি গেছে। উমিদ আলীকে চাকরী দিয়ে কদর আলী কেটে পড়েছে। আমি এখন উমিদ আলীর এ্যাক্টিন।

ঃ কি মুস্কিল! তাহলে এ বাড়ির সাহেব কোথায়? সাহেব? তিনিও কি আগেই কেটে পড়েছেন।

ঃ না। এ বাড়িতে আর কোন সাহেব নেই। এখন সাহেব আমি। উমিদ আলী ভাই ফিরে এলে তখন সাহেব উমিদ আলী। ব্যস্ মামালা ডিস্‌মিস্।

ঃ তুমি কে? নাম কি তোমার?

ঃ পীত্‌র‍্যাজ্। পীত্‌র‍্যাজ্ আলী। বাড়িতে আমাদের একটা মস্তবড় পীত্‌র‍্যাজ্ গাছ আছে তো, তাই আমার নামটা—

ইয়াসমীন আরা ধমক দিয়ে বললো, থামো! ব্যাটা তো বড় জ্বালালো দেখছি।

ঃ জি, কিছু বললেন?

ঃ থাক। পীত্‌রাজ, গাব, নীম—যে গাছই থাক, সে খোঁজে আমার দরকার নেই। ঘরে শিকল লাগানো দেখছি, ঘরে কি কেউ নাই?

কোন ঘরে? এই ঘরে? কি যে কন্? ঘরে মানুষ থাকলে, শিকল দিয়ে রাখে কেউ?

ঃ কে দিয়েছে শিকল? তুমি?

ঃ না, উমিদ আলী।

ঃ তাহলে তুমি এখানে বসে আছো যে?

ঃ উমিদ আলী বলে গেলো তাই আছি। উমিদ আলী চলে এলেই আমি চলে যাবো।

ঃ বাড়ি কোথায় তোমার?

ঃ ঐ উমিদ আলীর বাড়ির কাছেই। প্রায় দেড় দিনের পথ। প্রথমে বাস, তার পরে ভ্যান, তার পরে নৌকায় গেলে তবেই বাড়ি।

ইয়াসমীন আরা সবিস্ময়ে বললো, সেকি!

পীত্‌রাজ আলী সখেদে বললো, আর সেকি! উমিদ আলীর নজরে পড়েই তো ফেঁশে গেলাম। বললো, ভাই একটু বস্ আমি এই এলাম আর কি! সেই যে দৌড় দিলো আর পাত্তা নেই।

ঃ তাজ্জব!

ইয়াসমীন আরা কি করবে—ফিরে যাবে, না ঘর খুলে দেখবে ভাবতেই, ঘরের মধ্যে নড়াচড়ার একটা শব্দ হলো এবং সেই সাথে ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ এলো—উমিদ আলী-উমিদ আলী—।

ইয়াসমীন আরা চমকে উঠে বললো, সেকি! ঘরের মধ্যে কিসের শব্দ শোনা যায়?

লাফিয়ে উঠে পীত্‌রাজ আলী প্রায় চীৎকার করে বললো, চোর-চোর, তাহলে চোর ঢুকেছে ঘরে।

ইয়াসমীন আরা বললো, চোর! চোর ঢুকেছে মানে?

সঙ্গে সঙ্গে পীতরাজ আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো, নানা, চোর ঢুকবে কি করে? ঘরে তো শিকল দেয়া? তাহলে ভূত-ভূত! ওরে বাপরে! খালি বাড়ি পেয়ে নির্ঘাৎ ভূত ঢুকেছে ঘরে!

বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে আঙ্গিনায় নেমে এলো পীত্‌রাজ আলী। ইয়াসমীন আরা শিকল খুলে দ্রুত ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঢুকেই তার দুই চক্ষু স্থির। দেখে খাটের উপর মরার মতো পড়ে আছে ফারুক মাহমুদ। শরীরটা তার মিশে গেছে খাটের সাথে।

ইতিমধ্যে সশব্দে ফিরে এলো উমিদ আলী। বললো, কি হলো, কি হলো পীত্‌রাজ মিয়া, চেঁচাচ্ছো ক্যান্?

পীত্‌রাজ আলী ঐ একই রকম আতংকের সাথে বললো, ভূত-ভূত, ঘরের মধ্যে ভূত ।

ঃ ভূত! সেকি!

ঃ ভূতই নয় শুধু। এইমাত্র সুন্দরী এক মেয়েও ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। মনে হলো, খুবই সুন্দরী। ওটাও ভূত-পেত্নী কেউ কিনা, কে জানে!

ঃ কি বলছো পাগলের মতো?

ঃ পাগলের মতো ক্যান্? শিকল দেয়া ঘরে মানুষ ঢুকে কি করে? নির্ঘাৎ ভূত!

ঃ আরে থামো! হুঁশ বুদ্ধিটা দিনে দিনে সব ফুরিয়েই যাচ্ছে তোমার। শিকল দেয়া ঘরে মানুষ ঢুকবে কেন? ঘরের মধ্যে হুজুর ঘুমিয়ে গেলেন দেখে আমিই তো ঘরে শিকল দিয়ে গেলাম। তাহলে হুজুরের ঘুমটা বোধ হয় এই মাত্র ভাঙ্গলো। দেখি-দেখি- উমিদ আলী দ্রুত এগুলো। এ দিকে ফারুক মাহমুদকে এ অবস্থায় দেখে, ইয়াসমীন আরা আর্তনাদ করে বলে উঠলো—সেকি! একি অবস্থা আপনার? এ অবস্থা আপনার হলো কি করে!

চোখ মেলে চেয়ে ফারুক মাহমুদ ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, কে? একি আপনি এসেছেন? পানি দিন, আমাকে একটু পানি দিন।

পানি দিতে দিতে ইয়াসমীন আরা বললো আপনার এ অবস্থা হলো কি করে হঠাৎ?

পানি খেয়ে ফারুক মাহমুদ বললো, অসুখে। সপ্তাহ খানেকের ভীষণ অসুখে একদম ধরাশায়ী হয়ে গেছি।

ঃ সেকি! তা কদর আলী কই? তাকে তো দেখছিনে?

ঃ তাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। জরুরী কাজে তাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েই তো এই মুসিবতে পড়েছি।

ঃ দেশে পাঠালেন?

ঃ আমারই যাওয়ার কথা। কিন্তু শরীরটা কয়দিন ধরে খুবই ম্যাজ ম্যাজ করতে থাকায় কদর আলীকেই পাঠালাম। কিন্তু পাঠিয়ে দেয়ার পরেই আমি পড়ে গেলাম বিছানায়।

ঃ তাহলে আপনার দেখাশুনা? এটা কে করছে?

ঃ উমিদ আলী নামের এক লোককে কদর আলী যোগাড় করে দিয়ে গেছে।

ঃ কিন্তু সেই উমিদ আলীকেও তো দেখলাম না বাড়িতে? দেখলাম, তার বদলে বসে আছে আর এক বুড়োহাব্‌ড়া আধপাগল লোক।

ফারুক মাহমুদ আক্ষেপ করে বললো, ঐটাই ঐ উমিদ আলীর মস্তবড় দোষ। আর একে নিয়ে এইটেই হয়েছে এক মস্তবড় সমস্যা। হাতের কাছে কাউকে পেলেই তাকে বসিয়ে রেখে দুমিনিটের জন্যে হলেও উমিদ আলীর বাইরে যাওয়া চাইই।

এই সময় উমিদ আলী দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে বললো, এসে গেছি হুজুর, আমি এসে গেছি।

ফারুক মাহমুদ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, এসে গেছো বেরোও বেঈমান, বেরোও। মরি আমি একাই মরে থাকি। তোমার মতো বেঈমানের আমার কোনই গরজ নেই। সারাবেলা ডেকে ডেকে খুন! যখনই ডাকি, তখনই কোন সাড়াশব্দ নেই। বেরোও আমার সম্মুখ থেকে।

উমিদ আলী ভয়ে ভয়ে বললো, হুজুর—

ইয়াসমীন আরা বললো, যাওতো, এখন একে উত্তেজিত করো না। ঐ বাইরে গিয়ে দাঁড়াও—

www.boighar.com

মুখ কাঁচু মাচু করে বেরিয়ে গেল উমিদ আলী। ইয়াসমীন আরা ফারুক মাহমুদকে বললো, সেকি! আপনার এই অবস্থা, তবু আমাকে একটা খবর দেননি কেন?

ফারুক মাহমুদ বললো, কাকে দিয়ে দেবো? কদর আলী চিনতো আপনাকে। উমিদ আলী তো চেনে না।

ঃ কি সর্বনাশ! সেকি! আপনার দোস্ত? আপনার দোস্ত মনোয়ার হোসেন সাহেবও কি আসেননি এর মধ্যে?

ঃ না। ও নয়, কেউ নয়। অন্য কোন জনপ্রাণীই এসময় আমার কাছে আসেনি।

ঃ হায়-হায়, সে কি কথা!

ঃ বিপদ যখন আসে, তখন এ ভাবেই আসে। তামাম সাগর শুকিয়ে যায় এক সাথে।

ঃ কি অসম্ভব কথা! কি অভাবনীয় ব্যাপার। হায়-হায়! কদর আলী নেই-বন্ধুবান্ধব নেই—খবর দেয়ার লোকও নেই! এতটা যে চিন্তা করতেও পারছিনে। এইভাবে একা একা পড়ে মরে থাকতেন যদি?

ঃ তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই যেতো।

ঃ জি?

ঃ এ টুকুই বাকী আছে শুধু। ঐটুকু ঘটলেই সব আগুন নিভে যায়। ছুটে যায় সব মোহ, এজীবনের চিন্তাভাবনা-পরিকল্পনা—সব কিছু।

ঃ ফারুক সাহেব!

ঃ ধন সম্পদ, ঘর সংসার, নামযশ—সব অর্থহীন, সব মিথ্যা। দুইচোখ বুজলেই সব অন্ধকার। বেঁচে থাকতেই আহা বলার কেউ যার পাশে নেই, মরার পর তার আর ওসব কোন কাজে লাগবে?

ঃ কি সাংঘাতিক! তাই যদি ভাবেন, তাহলে আপনজন ছেড়ে, দেশ ছেড়ে এই বিদেশ বিভূঁইয়ে পড়ে আছেন কেন?

ঃ না থেকে কি করবো? আপন বলতে কোথাও যার তেমন কেউ নেই, তার দেশই বা কি, বিদেশই বা কি? সবই সমান। আহা বলার যার যেখানে পাশে কেউ থাকে, সেই স্থানই তখন তার সব স্থান থেকে আপন।

ঃ আচ্ছা! তা এইজন্যেই কি বিষয় সম্পদের প্রতিও কোন মোহ নেই আপনার?

ঃ ছিল-ছিল, প্রচণ্ডই ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—ঐ মোহটা না থাকলেই ভাল হতো। ঐ এক ফালতু মোহই তো এই বিদেশ বিভূঁইয়ে এনে ফেলে দিয়েছে আমাকে।

ঃ ফারুক সাহেব।

ঃ সোনার খাট সোনার বিছানায় শুয়ে থাকলাম, অথচ চরম মুহূর্তে মুখে এক ফোটা পানি দেয়ারও কাছে কেউ থাকলো না, তাহলে সে বিছানার মূল্য কি আর সে জীবনের দাম কি?

ঃ কেন, টাকা খরচ করলে কি দেখাশুনা করার লোকের কোন অভাব আছে? একজনের জায়গায় তিনজন রাখলে তো আর এ অভাব থাকে না।

ফারুক মাহমুদ জোর দিয়ে বললো, থাকে-থাকে। আজ বুঝতে পারছি, এ অভাব বরাবরই থাকে। টাকার বিনিময়ে চাকর-নফর পাওয়া যায়, কিন্ত দরদ পাওয়া যায় না। আর দরদের অভাব থাকলে, দশজন চাকর নফর থাকলেও প্রয়োজনের মুহূর্তে একজনকেও পাশে পাওয়া যায় না। দাপিয়ে দাপিয়ে একা একাই মরে থাকতে হয়।

ঃ কিন্তু আপনার কদর আলী তো জানি খুবই দরদ করে আপনাকে। সে থাকলে নিশ্চয়ই আজ আপনার এ দশা হতো না?

ঃ তা হতো না, এটা ঠিক। তবে কথা কি, দরদী হলেও কদর আলী চাকর। মজুরীর বিনিময়ে কাজ করতেই তার এখানে আগমন। দরদী হলেও চাকরের দরদ দিয়ে কেমন যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয় না জীবন। ফাঁক ফোকর থেকেই যায় অনেকটা। যতই দরদী হোক, চাকরেরও আপনজন থাকে। বাপ-মা, বৌ-বাচ্চা, আত্মীয়-স্বজন থাকে। জ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক, মন তার ঝুলে থাকে সেই দিকেই অধিক। আজ মনে হচ্ছে, আপনজনের দরদ ছাড়া, মানুষের জীবন কোন দিনই পুরোপুরি ভরে ওঠার নয়।

ঃ বলেন কি! এতটাই ভাবতে শুরু করেছেন?

ঃ বড়ই অসহায় বোধ করছি। চরমভাবে একাকী বোধ করছি। আর এ জন্যেই এ দিকটা স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে আমার কাছে। বুঝতে পারছি সত্বর একটা অবলম্বন চাই আমার। চাই জীবনের চিরসঙ্গী। অবলম্বনহীন অবস্থায় এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে এভাবে আর একটা দিনও কাটানো উচিত নয় আমার।

ঃ ফারুক মাহমুদ সাহেব!

ঃ একমাত্র চাকরকে অবলম্বন করেই সারাজীবন বেঁচে থাকা যায় না। একটা আত্মিক অবলম্বন চাই। আপনি আপনার অবলম্বনের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছিলেন না?

ঐ ভাবনা এখন প্রকট হয়ে উঠেছে আমারও। বিগত পাঁচ-সাতদিন একটানা বেঁহুশ হয়ে পড়ে থাকার পর এই উপলব্ধি আমার তীব্র হয়ে উঠেছে।

বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠলো ফারুক মাহমুদ। পাশ ফিরে শুয়ে হা করে শ্বাস টানতে লাগলো। খেয়ালে এসে ইয়াসমীন আরা ব্যস্তকণ্ঠে বললো, থাক-থাক। আর কোন ব্যাখ্যা দিতে হবে না। কথা না বলে এবার একটু সরে যান তো বিছানার ঐ একপাশে। চাদরটা না বদলালেই নয়। বিশ্রী দুর্গন্ধ হয়েছে চাদরের।

ঃ জি?

ঃ চিরসঙ্গী যোগাড় করতে যতদিন না পারছেন, ততদিন আমিই তাঁর হয়ে মানে এ্যাকটিং করার চেষ্টা করবো। আপনাকে তো এইভাবে পচিয়ে মারা যাবে না! ও চিন্তা আপাতত রাখুন। এবার বলুন, আর কোন চাদর বা কাপড় টাপড় কোথাও কিছু আছে কিনা?

পাশের ওয়্যারড্রোবের দিকে ইংগিত করে ফারুক মাহমুদ বললো, ঐ ওটার মধ্যে আছে।

ওয়্যারড্রোব্ খুলে সেদিকে চেয়েই ইয়াসমীন আরার দুচোখ ছানাবড়া। দেখলো, শুধু একখানা দুইখানা বেড্‌শীট্‌ই নয়, বিভিন্ন রকমের অত্যন্ত মূল্যবান বিছানাপত্র আর পোষাক-পরিচ্ছদে ওয়ারড্রোব্ ভর্তি। ফারুক মাহমুদকে সাধারণত যে সব পোষাক পরে থাকতে দেখা যায়, তার চেয়ে এগুলো অনেক বেশি মূল্যবান ও উচ্চমানের।

ইয়াসমীন আরাকে সেদিকে বিস্মিত নজরে চেয়ে থাকতে দেখে ফারুক মাহমুদ ম্লানকণ্ঠে বললো, এক কালে ওসবই ব্যবহার করতাম। কিন্তু দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে এই আস্তানা গাড়ার পর থেকে ওসব আর পরি না। এই সামান্য দোকানদারের গায়ে ওগুলো মানায় না।

কোন জবাব না দিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে বিছানাপত্র পাল্টিয়ে দিলো ইয়াসমীন আরা। এরপর বললো, ওষুধপত্র খাচ্ছেন কিছু?

ফারুক মাহমুদ বললো, ডাক্তার ডাকার হুঁশই আগে ছিল না এই দিন দুয়েক হলো উমিদ আলীকে দিয়ে একজন ডাক্তার ডেকে এনেছিলাম। তাঁরই দেয়া ঐ একশিশি ওষুধু দুদিন ধরে খাচ্ছি।

ইয়াসমীন আরা ক্ষোভের সাথে বললো, বেশ করেছেন। ওষুধের বদলে ঐ ডাক্তার যে আপনাকে একশিশি বিষ দিয়ে যায়নি—এইটেই খোশ নসীব আপনার।

ঃ তা দিলেও তো করার কিছু ছিল না। এর অধিক আর কি করতে পারি আমি?

ঃ কিছুই আর করতে হবে না আপনাকে। এরপর যা করার, সে দায়িত্ব আমার।

ঃ জি?

ঃ উমিদ আলীর হাতে পড়ে থাকলে বাঁচার উম্মীদ আর পাঁচটা দিনও করা আপনার বৃথা। ছি ঃ-ছি ঃ-! কি পচা দুর্গন্ধের মধ্যে ফেলে রেখেছে আপনাকে। ঘরদোর-মেঝে, উঃ! চারদিকে ভিন ভিন করছে মাছি। আপনি চুপ করে থাকুন। ইরফান চাচা আর আমাদের ঝি জহুরা বিবিকে নিয়ে এক্ষুণি আবার আসছি আমি।

ঃ ইয়াসমীন আরা!

ঃ আপনার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, ডাক্তার কোবরেজ, খাওয়া-দাওয়া এখন থেকে সব আমাদের হাতে। কদর আলী আসুক আর না আসুক, আর কিছুই ভাবতে যাবেন না আপনি।

বলেই দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল ইয়াসমীন আরা।

অতঃপর ঝি চাকর নিয়ে এসে ইয়াসমীন আরা একাগ্রচিত্তে লিপ্ত হলো ফারুক মাহমুদের সেবায়। উপযুক্ত চিকিৎসা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও প্রয়োজনীয় শুশ্রূষার ফলে পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যেই ফারুক মাহমুদ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলো। এরই মাঝে কদর আলী ফিরে এলে, ফারুক মাহমুদের ভার কদর আলীর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিজগৃহে ফিরে এলো ইয়াসমীন আরা। বিদায়ের কালে বললো, পয়লা দিন এসেছিলাম এক গাদা অভিযোগ নিয়ে। আমাদের বাড়ি আপনি কেন ছাড়লেন, এসেছিলাম তারই কৈফিয়ত নিতে। কৈফিয়াত মানে, আপনার ঘাড়েই শেষমেষ চাপতে পারি আমি—এই কথা শুনেই আপনি পালিয়ে গেলেন কিনা, এসেছিলাম তারই হদিস করতে। কিন্তু এসে যা দেখলাম, তাতে আমার আক্কেল গুড়ুম। সব অভিযোগ আমার মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল কর্পূরের মতো। উল্টো অনুতাপে ভুগতে লাগলাম আমি। আরো ক'দিন আগে কেন আপনার খোঁজে এলাম না—এই আফসোসেই পুড়ে মরলাম কয়দিন।

একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ফারুক মাহমুদ বললো তারপর?

ইয়াসমীন আরা বললো, আল্লাহর রহমে আজ সব কিছুর অবসান ঘটেছে। তাই যাবার সময় আজ আবার বলে যাই—আপনার ঘাড়ে চাপতে পারি এই ভয়েই যেন আমাদের ওখানে যাতায়াতটা বন্ধ করে দেবেন না। একইভাবে চেয়ে থেকে ফারুক মাহমুদ বললো, তারপর?

ঃ তারপর আর কিছু বলার নেই।

ঃ তবু শোনার জন্যে কান পেতেই রইবো আমি সব সময়।

ঃ ফারুক সাহেব।

ফারুক মাহমুদ আস্তে করে হাত তুলে বললো, আল্লাহ হাফেজ!

৯

আর একবার তুমুল বিতর্ক শুরু হলো তলবদার সাহেবের ড্রইংরুমে। একদলের সারবস্তুহীন নির্জলা গলাবাজী ও নির্লজ্জ একগুঁয়েমীর পাশে অন্যদলের বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক বক্তব্য, বিতর্কটাকে উত্তরোত্তর এক হাস্যকর নাটকে রূপান্তরিত করলো। অন্যকথায়, মানুষের বেহুদাপনার এক উলঙ্গ চিত্র এতে করে উপস্থাপিত হলো।

স্ত্রীর ইচ্ছে পূরণে ইয়াসমীনের আব্বা আবদুর রাজ্জাক তলবদার সাহেব নিজেই গিয়ে দাওয়াত করে নিয়ে এলেন তাঁর সম্বন্ধীর মেয়ে-জামাইকে। অর্থাৎ সম্বন্ধীর মেয়ে নাজমা বেগম এবং নাজমা বেগমের স্বামী মনোয়ার হোসেনকে। ভাইয়ের মেয়ে-জামাই একসাথে এই প্রথম তাঁর বাড়িতে আসায়, এ উপলক্ষ্যে ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন ইয়াসমীনের আম্মা আস্‌মা বেগম। তলবদার সাহেব নীরবে স্ত্রীর সে ইচ্ছায় যোগান দিয়ে যেতে লাগলেন। ঠেলায় পড়লে বাঘে ঘাস খায়, অবস্থা তাঁর এখন অনেকটা এই রকমই আর কি!

তলবদার সাহেবের সংসারটা ইদানিং স্ত্রী আসমা বেগমের ইচ্ছা অনুযায়ীই চলতে শুরু করেছে। জালিয়াতী করে দখল করা বিষয়-সম্পত্তি হাত ছাড়া হয় হয় দেখে, বেজায় চুপসে গেছেন তলবদার সাহেব। তাঁর উকিল তাঁকে জানিয়েছেন, মামলায় আর দ্বিতীয় তারিখ নাও পড়তে পারে। সামনের যে তারিখ আছে ঐ তারিখেই সব কিছু ফয়সালা হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এই বাড়িঘর আর মিল কারখানার মালিকানাটা এই তারিখেই কোর্টে চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে। এক গাদা টাকা নিয়ে গিয়েও তলবদার সাহেবের উকিল হ্যান্ড্‌রাইটিং এক্সপার্টকে হাত করতে পারেননি। কাজেই এক্সপার্টের রিপোট তলবদার সাহেবের পক্ষে আসার সম্ভাবনা এখন শতকারা পঁচানব্বুই ভাগই শূন্যের কোঠায়। এতে করে সবকিছু হারানোর অন্তিমঘন্টা তলবদার সাহেবের অন্তরে এখন থেকেই বাজতে শুরু করেছে। এই বাড়িঘর আর মিলকারখানা হাতছাড়া হয়ে গেলে তলবদার সাহেবের অবস্থা হবে ফুটো বেলুনের চেয়েও করুণ। রুজি রোজগারের তামাম পথ বন্ধ হয়ে যাবে তাঁর। তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল হতে হবে তার স্ত্রীর করুণার উপর। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী আসমা বেগম ওয়ারিশ হিসাবে যা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি পাবেন, তাই দিয়ে সংসার চলবে তখন। পরিস্থিতি আঁচ করে তলবদার সাহেব তাই তালকানা হয়ে গেছেন এবং স্ত্রীর ইচ্ছে-মর্জি পূরণ করে চলেছেন।

ভাইঝি আর ভাইঝির বর বাড়িতে আসায়, ইয়াসমীনের আম্মা আসমা বেগম বেশ ঘটা করেই খানাপিনার আনজাম করতে লাগলেন। এই অনুষ্ঠানে ফারুক মাহমুদকে দাওয়াত করে আনার তাকিদটাও প্রবল ভাবে অনুভব করলেন তিনি। নানা কারণে ফারুক মাহমুদের প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকে পড়েছেন আসমা বেগম সাহেবা। ফারুক মাহমুদের চতুর্মুখী প্রতিভার সাথে আসমা বেগম সাহেবার একটা অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাও ফারুক মাহমুদকে এই বাড়ির এক একান্তই অন্তরঙ্গ মানুষে পরিণত করেছে। বিশেষ করে, ফারুক মাহমুদকে বাদ দিয়ে এ বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানই কল্পনা করতে পারেন না ইয়াসমীনের আম্মা আসমা বেগম সাহেবা। বলা বাহুল্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জোরদার দাওয়াত গিয়ে পৌঁছেছে ফারুক মাহমুদের কাছেও।

জোর তাকিদ এড়াতে না পেরে ফারুক মাহমুদ এসে যথা সময়ে হাজির হলো তলবদার সাহেবের বাড়িতে। মনোয়ার হোসেন আগেই এসেছিল। এদের নিয়ে তলবদার সাহেব এসে ড্রইংরুমে বসলেন। যথা সম্ভব আব্রু করে ইয়াসমীন আরা ও নাজমা বেগমও ড্রইংরুমে এসে একপাশে অন্য এক সোফা সেটে বসলো। ডিনার টাইমে আরো কিছু মেহমান আসার কথা থাকায়, ড্রইংরুমের বহির্মুখী দরজার দিকে আরো কিছু আসন এনে আগে থেকেই পেতে রাখা ছিল। ডিনার টাইম আসতে এখনও অনেক দেরী। তাই সে সব আসন ফাঁকা পড়েই রইলো।

ড্রইংরুমে এসে মেয়ে জামাইদের সাথে বসে তলবদার সাহেব গল্পালাপ শুরু করলেন। কাজের ঝি জহুরা বিবিকে নিয়ে এসে তলবদার পত্নী আসমা বেগম ড্রইংরুমে চা-পানি সাপ্লাই দিতে লাগলেন।

কুশলবার্তার পর্ব শেষ করে তলবদার সাহেব অন্য কথায় যেতেই, সরবে ও সবেগে ড্রইংরুমের দরজায় এসে ভিড় করে দাঁড়ালো এক পাল যুবক যুবতী। এরা কোন আমন্ত্রিত অতিথি নয়। বলা বাহুল্য, এরা এ বাড়ির সেই মার্কামারা সার্বক্ষণিক অবাঞ্ছিত আগন্তুক। সর্বক্ষণ এ বাড়ি সরগরম করে রাখা সেই অযাচিত ব্যক্তিবর্গ। অজন্তা, বন্দনা সহ যুবতীরা সংখ্যায় জনচারেক গৌতম নানক সহ যুবকেরাও জনাচারেক। হাস্যেলাস্যে জোড়ায় জোড়ায় এসে অবলীলাক্রমে ড্রইংরুমের দরজায় জট্‌লা করে দাঁড়ালো। এই দলের অগ্রভাগে ছিল গৌতম মিয়া। তলবদার সাহেবকে অন্যদের সাথে আলাপরত দেখে সে মোটেই খুশি হলো না। নাখোশকণ্ঠে বললো, নাঃ, দুলাভাইকে কোন সময়ই ফ্রি পাওয়ার উপায় নেই। আলতু-ফালতু আলাপ! এখনই ঐ ক্লাবঘরে আসুন, জরুরী কথাবার্তা আছে।

এদের আগমনে একমাত্র তলবদার সাহেব ছাড়া, ড্রইংরুমে উপবিষ্ট আর কেউ যে খুশি হতে পারলো না—তা সবার চোখ মুখের চেহারা দেখেই বোঝা গেল। তলবদার সাহেবও খুশি হতে পারতেন না, যদি না শেষ ভরসাটা তাঁর এদের উপরই থাকতো। অর্থাৎ মামলায় হেরে গেলে বাদীপক্ষকে কোন কিছুই দখল নিতে না দিয়ে লাঠি পেটা

করে তাড়িয়ে দেয়ার দায়িত্বটা এরাই সাগ্রহে নিয়ে রেখেছে বলে তলবদার সাহেব খুশি হওয়ার নামে হাসিমুখে ঢেঁকি গিলতে লাগলেন। গৌতম মিয়া তলবদার সাহেবকে উঠে আসার জন্যে পুনরায় তাকিদ দিলে, উপবিষ্ট সকলের মনোভাব লক্ষ্য করে তলবদার সাহেব আমতা আমতা করে বললেন, তা কথা হলো, একটু পরে এলে কি চলে না গৌতম মিয়া? নতুন কুটুম এই প্রথম এ বাড়িতে এসেছে, দুটো কথা না বলে এদের ফেলে যাই কি করে, বলো?

গৌতম মিয়া ফের রুষ্টকণ্ঠে বললো, নতুন কুটুম! কিসের নতুন কুটুম?

তলবদার সাহেব সহাস্যে বললেন—আরে এসোই না ভেতরে তোমরা। ঐ আসনগুলোতে এসে বসো সবাই। এই নতুন কুটুমদের সাথে পরিচয় করে দেই তোমাদের।

"একে নাচুনে বুড়ি তাতে ফের ঢোলে বাড়ি"। এ বাড়ির এই ড্রইংরুমে সচারাচর এরা কেউ ঢোকার আমন্ত্রণ পায় না। শূন্য ঘরেও না। এদিকটা পর্দানসীন ইয়াসমীন আরার রাজত্ব। আজ এই দরবার মাফিক সাজানোগুছানো ড্রইংরুমে ঢোকার আহবান তলবদার সাহেব কর্তৃক পাওয়া মাত্র এই যুবক যুবতীরা সবাই হুড়মুড় দুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো ড্রইংরুমে এবং গৌতম মিয়া কিছু বলার আগেই সবাই হাত-পা মেলে বসে পড়লো ফাঁকা আসনগুলিতে। দেখেশুনে গৌতম মিয়াও শূন্য এক আসনে বসে পড়লে তলবদার সাহেব তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, বুঝলে গৌতম, এই হলো আমার সম্বন্ধীর মেয়ে নাজমা বেগম আর এ হলো মনোয়ার হোসেন—এই নাজমা আম্মার বর। অল্পদিন হলো শাদি হয়েছে এদের আর এই আজই এরা প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছে।

ফের গৌতম কিছু বলার আগেই মনোয়ার হোসেনকে লক্ষ্য করে আগন্তুকদের একজন, অর্থাৎ আবুল কাশেম কানাই, সবিস্ময়ে বলে উঠলো, সেকি! এই লোক আপনাদের নতুন কুটুম? এ লোক তো ঘোর মৌলবাদী। আর ঐ যে ওর পাশের ঐ দোকানদার—ও লোকও তো ভীষণ ভারত বিদ্বেষী আর সাম্প্রদায়িক। এদের সাথে কুটুম্বিতা পাতিয়েছেন আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরে নাজমুল আলম নানক বললো, আরে তাইতো রে! কি তাজ্জব-কি তাজ্জব। সেকি আংকেল! এত লোক থাকতে এই মৌলবাদীদের খুঁজে পেলেন আপনি? মেয়ের শাদি দেয়ার আর লোক পেলেন না খুঁজে?

বলেই সে গৌতমকে প্রশ্ন করলো—ব্যাপার কি গৌতমভাই? তুমি? তুমি বাড়িতে থাকতে আংকেল এসব কি শুরু করেছেন? বেছে বেছে মৌলবাদীদের এনে মেয়েদের শাদি দিয়ে দিচ্ছেন তিনি আর তুমিও তা প্রতিরোধ করতে পারোনি?

এদের কথাবার্তার ধরন দেখে অন্দরমুখী দরজার আড়ালে দাঁড়ানো তলবদার পত্নী আসমা বেগম রীতিমতো রুষ্ট হলেন এবং চাপাকণ্ঠে স্বামীকে বললেন—এসব কি হচ্ছে? আসুন তো ভেতরে, কথা আছে!

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে তলবদার সাহেব অগত্যা অন্দর মুখী দরজা দিয়ে সবার অলক্ষ্যে ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরেই ঐ অন্দরমুখী দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালো চাকর ইরফান মিয়া সহ আরো তিন চার জন হৃষ্টপুষ্ট নিকট আত্মীয়। তলবদার পত্নী আসমা বেগম সাহেবাই তাদের পাঠিয়ে দিলেন ওখানে। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অধিক বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনে উগ্র আগন্তুকদের ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দেয়া।

ঐ সব উগ্র আগন্তুকেরা তখন মুডের উপর ছিল। এসব কারো নজরে পড়লো না। তলবদার সাহেবের অন্তর্ধানও নয়। তাই নানকের প্রশ্নের জবাবে গৌতমমিয়াও মুডের উপর বললো, আরে না-না, দুলাভাই একাজ করলে কি আর ছেড়ে কথা বলতাম? একাজ করেছে দুলাভাইয়ের সম্বন্ধী। দুলাভাইয়ের সম্বন্ধীই দিয়েছে তার মেয়ের এ শাদি। এখানে তলবদার সাহেবের হাত ছিল না কিছু।

সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কাটলো কৌশিক আহম্মদ কেদার। প্রগ্রতির ফেরিওয়ালা আর কলির কেষ্টো সেই মদ্যপ শিক্ষক কৌশিক আহম্মদ বললো, আংকেলের সম্বন্ধী মানে? সে আবার কোন্ মাল্‌রে গৌতম? অনগ্রসর কূপমণ্ডুক মৌলবাদীর সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়—সে আবার কোন্ উজবুক?

মনোয়ার হোসেন আর সহ্য করতে পারলো না। এদের এই বেয়াদবী আর বেহায়াপনা অনেক আগেই তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কৌশিক আহম্মদ কেদারের এই কথায় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল তার। সে বললো, কে? কথা বলছেন কোন দেবতা ওটা? কলির কেষ্টো ঠাকুর নন কি? বা-বা-বা! আপনিও এসে জুটে গেছেন এদের সাথে? এযে দেখছি, একেবারে অষ্ট বজ্র সম্মেলন!

কৌশিক আহম্মদ কেদার সক্রোধে বললো, কি বলতে চান? কি বলতে চান আপনি?

মনোয়ার হোসেন বললো তিন তিনটে মেয়ের সর্বনাশ করা সেই কেষ্টোঠাকুর নন কি আপনি? মদ খেয়ে শুড়িখানার সামনে উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকা আর সে কারণে জেলখাটার সাথে শিক্ষকতার চাকরী হারানো সেই পীর সাহেব কি নন আপনি? চরিত্র বলে নিজের যার কিছুই নেই, সে একজন সৎ আর জ্ঞানবান মুরুব্বী লোককে বলে উজবুক! বেহায়াপনা আর দেখবো কত?

জবাব দিলো কানাই মিয়া। আবুল কাশেম কানাই মিয়া। সে প্রতিবাদ করে বললো, কার চরিত্র নেই? এই কেদার মিয়ার? একজন অনগ্রসর কূপমণ্ডুক মানুষ হয়ে বলছেন কেদার মিয়ার চরিত্র নেই? কেদারভাই একজন কত বড় প্রগতিশীল আর মুক্তচিন্তার অগ্রসর মানুষ—তা কি জানেন? www.boighar.com

জবাবে মনোয়ার হোসেন বললো, জেনে আর কাজ নেই। মদ খেয়ে মাতাল হওয়া আর অবাধ যৌন কর্ম করে বেড়ানো যার স্বভাব, সে মুক্তচিন্তার অগ্রসর মানুষ, না লাজ-লজ্জা আর বিবেকহীন বন মানুষ, যে কোন বোদ্ধা জনই তা বোঝেন।

এই সময় ফারুক মাহমুদ মনোয়ার হোসেনকে নীচু গলায় প্রশ্ন করলো, সেকিরে! তবে এই লোকই কি সেই লোক, যার প্রগতিবাদের স্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কোর্টে একেবারে উদোম হয়ে গিয়েছিল? মানে শিক্ষক হয়ে লিভ্‌টুগেদার করে মেয়েদের সর্বনাশ করা আর মদ খেয়ে মাতাল হওয়া—

মনোয়ার হোসেনও ঐ একই কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে বললো, আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি! এই সেই কলির কেষ্টো ঠাকুর আর মদ্যপ শিক্ষক—যার কথা সেদিন তোকে বলেছিলাম।

নীচু গলায় হলেও কথাগুলো একেবারে অস্পষ্ট ছিল না। শুনতে পেয়ে আবুল কাশেম কানাই সদর্পে বললো, তা এনিয়ে ফাসুর ফুসুর করার কি আছে? মদ খাওয়াটা এমন কি গর্হিত কাজ যে তা চুপি চুপি বলতে হবে? মদের মর্যাদা অনগ্রসর অজ্ঞজনেরা বুঝবে কি? মদ ভদ্রলোকেরাই খায় আর মদ খেলে মানুষ মাতালও হয়। এ সব সভ্য আর ভদ্রলোকদের ব্যাপার স্যাপার। কূপমণ্ডুকেরা এটা বোঝে—সাধ্য কি?

এবার ফারুক মাহমুদ বললো, তা বটে! সাঁওতাল-বুনো মেথর-মুচি এরাও প্রচুর মদ খায়। এরাও তাহলে ভদ্রলোক আর আপনাদের মতোই ভদ্রলোক—না কি বলেন?

হোঁচট খেয়ে কানাই বললো, কেন, কেন, আমাদের মতো হবে কেন? ওরা তো নীচু জাত। আমরা হলাম জাত ভদ্রলোক। ওদের মতো ধেনো মাল আমরা খাইনে। আমরা খাই খাস বিলাইতি মাল।

ঃ অর্থাৎ, জাত ভদ্রলোকেরা মদও খায় আর মাতালও হয়। মদ খাওয়া মাতাল হওয়া এসব খানদানী কারবার—এই তো?

ঃ জরুর। সভ্য জগতের দিকে একবার চোখ তুলে দেখুন।

ঃ তা আর দেখবো কি ব্রাদার? কোন্‌টা সভ্যজগত আর কোন্‌টা অসভ্য বন্য জগৎ, সেটাই তো ঠিক মতো বুঝতে পারিনে। তা যাক, ব্যাভিচারও তাহলে ভদ্রলোকেরাই, অর্থাৎ অগ্রসর মানুষেরাই করে, নাকি বলেন? মানে, ব্যাভিচার করাটা ভদ্রলোকেরই কাজ আর পরকিয়া প্রেম তাদের কাছে একটা আটপৌরে ব্যাপার, তাইতো?

ঃ অফ্‌কোর্স! জেন্টলম্যানস্ বিজনেস্। পানির মতো এই সাফ কথাটা বোঝেন না কেন?

ঃ তাহলে ভদ্রলোক আর লম্পটের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই, তাই নয় ব্রাদার?

ঃ না নেই। ফ্রি সেক্স, ফ্রি সেক্সচুয়্যাল কানেকশান ভদ্রলোকদের কালচার। লীভ্-টুগেদার ভদ্র লোকেরাই, অর্থাৎ অগ্রসর মানুষেরাই করে। সেক্সচুয়্যাল স্বাধীনতা, অর্থাৎ ইচ্ছে মতো সেক্সচুয়্যাল এন্‌জয়মেন্ট করার সুযোগই যদি নারী পুরুষের না থাকলো, যখন যাকে পছন্দ তখন তার সাথে যদি লীভ্-টুগেদার

করতেই না পারলো, তাহলে জীবনে তাদের স্বাধীনতা বলে আর থাকলো কি? জীবনের ছন্দ বলেও তো আর তাহলে কিছুই থাকে না।

এ ধরনের কথাবার্তা শুরু হতেই লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ছুটে পালালো ইয়াসমীন আরা আর নাজমা বেগম। এরা চলে যাওয়াতে ফারুক মাহমুদদেরও সরাসরি জবাব দেয়ার অনেক খানি সুবিধে হলো। জবাবটা এবারও মনোয়ার হোসেনই দিলো। বললো, তা যা বলেছেন। সেদিক দিয়ে কুকুর-বিড়াল আর গরু-ছাগলের জীবন বড়ই ছন্দময়। মানুষ হয়ে জন্মেই যত বিপত্তি, না কি বলেন ভাই সাহেব?

ঃ বিপত্তি! বিপত্তি হবে কেন? বিপত্তি মনে করলেই বিপত্তি, বিপত্তি মনে না করলে, কোনই বিপত্তি নেই। ওসব আপনাদের মতো অজ্ঞ আর অনগ্রসর মানুষের সংকীর্ণতা। মুক্ত মনের মনীষী ব্যক্তিরা এসব নিয়ে কোন সংকোচ বোধ করেন না বা এসব নিয়ে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়ও তাঁরা পছন্দ করেন না।

ঃ মনীষী ব্যক্তিরা কেমন? সব মনীষী ব্যক্তিরা?

ঃ সব না হোক, মুক্ত চিন্তার মনীষী ব্যাক্তিরা। লক্ষ্য করলেই দেখবেন, সেক্স এর ব্যাপারে তাঁরা বড়ই উদার।

ঃ তাই নাকি? তারা তাহলে কারা? দুচারজনের নাম বলুন তো?

ঃ দু'চারজন বলছেন কি? এঁদের সংখ্যা কি দুচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ? বলতে পারেন শত শত। মুক্ত চিন্তার কবি সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাংবাদিক আর অগ্রসর মানুষ, সবাই।

ঃ যথা?

ঃ সৈয়দ শামসুল হক, তসলিমা নাসরীন—এদের কথা বাদই দিলাম। বর্তমানে দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব আর জনপ্রিয় লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের নাম তো শুনেছেন? হুমায়ুন আজাদের মতো এমন একজন মনীষী ব্যক্তিও এ ব্যাপারে কতই না উদার।

ঃ মনীষী ব্যক্তি? অধ্যাপক হুমায়ন আজাদ একজন মনীষী ব্যক্তি নাকি? মনীষী ব্যক্তি হতে কি কোন গুণাবলীই লাগে না? একজন নষ্ট মানুষ মনীষী ব্যক্তি হয় কি করে?

প্রথম দিকে ধাক্কা খেয়ে কৌশিক আহম্মদ কেদার এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে সে এবার মাথা তুলে বললো, নষ্ট মানুষ মানে? তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এমন একজন গুণী মানুষ যদি মনীষী ব্যক্তি না হন, তাহলে আর মনীষী ব্যক্তি কে? এছাড়াও তিনি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। আহ্! তিনি যা লেখেন না, একেবারে তোফা!

ঃ আচ্ছা। তার লেখা তাহলে খুবই সুস্বাদু, তাই নয়?

কেদার মিয়া জোশের সাথে বললো, সুস্বাদু বলে সুস্বাদু? তাঁর লেখা পাঠকেরা গোগ্রাসে গেলে।

ঃ গোগ্রাসে গেলে? সব পাঠকেরাই কি গোগ্রাসে গেলে তার লেখা?

ঃ গেলেই তো। তাঁর লেখার মর্ম যারা বুঝে, তারা সবাই গেলে।

ঃ এই একখানা কথার মতো কথা বলেছেন বটে। সবাই তো আর সব জিনিসের মর্ম বোঝে না। যে জিনিসের মর্ম যারা বোঝে, সে জিনিস তারা ঠিকই গোগ্রাসে গেলে। হাজার কথার এক কথা।

ঃ বটেই তো—বটেই তো।

ঃ বটেই-বটেই। এই ধরুন কলেরা রুগীর বর্জ্যও একটা জিনিস। কিন্তু এর মর্ম কি সবাই বোঝে? একশ্রেণীর চতুস্পদ প্রাণী আছে যাদের কাছে তা পরম উপাদেয় আর তারা তা গোগ্রাসে গেলে। তবে মানুষ তো নয়ই, পশু হলেও কিন্তু সব পশু ঐ বর্জ্য পদার্থ গেলে না।

ঃ মানে?

ঃ মানুষ ঐ অখাদ্য খায় না।

ঃ তার অর্থ? আপনার ভাষায় তাহলে অধ্যাপক হুমায়ন আজাদ সাহেবের লেখা অখাদ্য? আর সেই জন্যেই মানুষ তা খায় না?

ঃ খায়। ঐ যে বললাম, ঐ বিশেষ শ্রেণীর পশুর মতো যাদের রুচি, তারাই খায়। তবে তাদের কাছে ঐ লেখকের লেখা যতই উপাদেয় হোক, কোন রুচিবান মানুষের কাছে আদৌ তা নয়।

আবদুল গণি গৌতম এতক্ষণ প্রায় নীরবই ছিল। এবার সে মুরুব্বীর চালে বলে উঠলো, আরে থামুন! বলতে বলতে আপনি যে অনেক বেশি বলতে শুরু করেছেন মিয়া। যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছেন। অধ্যাপক হুমায়ন আজাদের লেখা কলেরা রুগীর বর্জ্যের মতোই অরুচিপূর্ণ জিনিস নাকি?

ঃ বিলকুল তাই। তার উপন্যাস 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' এর ব্যাপারটা তো আছেই, তার উপর তার হাল আমলের লেখা উপন্যাস "পাক সার জমিন সাদ বাদ" যারা পড়েছেন, তাঁরা এক বাক্যে সে কথা স্বীকার করবেন। অবশ্য আমি বলছি রুচিবান পাঠকের কথা। রুচি যাদের ঐ বিশেষ শ্রেণীর চতুষ্পদের মতো, তাদের কথা আমি বলছিনে। তাদের কাছে ও সব প্রিয় বস্তু হতেই পারে। ঐ সব অশ্লীল আর অশ্রাব্য কথা যারা লেখে তারা আবার লেখক আর জনপ্রিয় লেখক! বলিহারী রুচি আর বলিহারী মূল্যায়ন!

ঃ কেন, ও উপন্যাস তো আমিও পড়েছি। ওতে দোষের দেখলেন কি? অন্যেরা যে সব কথা রাখঢাক করে বলেন, উনি সেটা খোলামেলাভাবে বলেছেন—এতে দোষ হলো কি?

ঃ হলো না? রাখঢাক না করে কি সব কথাই খোলা মেলাভাবে বলা যায়, না সব কাজ খোলামেলা ভাবে করা যায়। প্রজনন সংক্রান্ত সে সব কাজ পশুরা খোলামেলা করতে পারে, মানুষ কি তাই পারে? মানুষের কি শরম, সংযম, সভ্যতা শিষ্টাচার—কিছুই থাকবে না?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ অর্থাৎ হুমায়ূন আজাদ তো একজন পথের মানুষ বা টোকাই নয়, একজন শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। একজন শিক্ষক মানেই একজন আদর্শ মানুষ। আদর্শ আর নৈতিক চরিত্রের প্রতীক ও দিশারী তিনি। হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীর কাছে পিতৃতুল্য আর শ্রদ্ধেয় তাঁর ইমেজ্। তিনি নীতি আদর্শের ধারক বাহক। সেই একজন শিক্ষক হয়ে হুমায়ন আজাদ তার লেখায় যৌনকর্মের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে এত মাতামাতি করতে পারেন কি করে? একেবারেই নষ্ট মানুষ ছাড়া একজন সাধারণ মানুষও তো এই রকম পর্ণো লিখতে পারে না। মাতা-পিতা, ভ্রাতাভগ্নি আর পুত্র কন্যা যার আছে, তার পক্ষে তো এসব লেখা সম্ভবই নয়। আর এলেখা নজরে পড়লে তার মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি আর পুত্র-কন্যারা তাকে কোন্ নজরে দেখবে—এটা ভেবে একজন অতি সাধারণ মানুষের কলমেও এসব আসবে না। হুমায়ুন আজাদের কলমে তা আসে কি করে? তার কি পুত্র কন্যা কিছুই নেই, নাকি তারাও সবাই সেক্স এর খোলাবাজারের খদ্দের?

গৌতম মিয়া বিরক্তির সাথে বললো, কি যে বলেন! কুপমণ্ডুক আর কুনো ব্যাঙ বলেই বিশ্বের খবর আপনারা রাখেন না আর সেই কারণেই এসব চিন্তা ভাবনা আপনাদের মগজ থেকে আজও দুর হচ্ছে না। পাশ্চাত্য জগতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, অনেক লেখকই এসব সমানে লিখছে।

ঃ না, সমানে লিখছে না। যৌন স্বাধীনতা আর যৌনতত্ব নিয়ে এতটা নষ্টামী করতে তারাও পারছে না। তাদের সামনেও অনেক বাধা নিষেধ আছে। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, অনেক। আদর্শ পেশার লোক হয়ে, বিশেষ করে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থেকে এতটা নষ্টামী করার সুযোগ তাদেরও নেই।

ঃ নেই?

ঃ না, নেই। বার্ট্রেন্ড রাসেলের নাম তো শুনেছেন নিশ্চয়ই। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক। শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন বার্ট্রেন্ড রাসেল। সেই বার্ট্রেন্ড রাসেলের লেখায় যৌনতত্ব আর যৌন স্বাধীনতা নিয়ে অধিক মাতামাতি থাকায়, বার্ট্রেন্ড রাসেলের সেই শিক্ষকতার চাকরীটা আর থাকেনি। শিক্ষকতার পেশা থেকে তাঁকে বের করে দেয়া হয়। ছেলেমেয়েরা ব্যাভিচারী ব্যাভিচারিণী হয়ে যাবে বিবেচনায় ঐ পাশ্চাত্য দেশের মাতা-পিতারাও বার্ট্রেন্ড রাসেলের কাছে ছেলেমেয়েদের পড়তে দিতে চায়নি। এছাড়া আরো অনেক খৃষ্টান লেখকের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে লেখা নিয়েও মামলা মোকর্দমা হয়। জেল-জরিমানা হয়। কিন্তু এই সোনার বাংলায় তা হয় না। এদেশে হুমায়ুন আজাদ সহ এই জাতীয় লেখকেরা যৌন নোংরামী নিয়ে আর কারো ধর্মীয় অনুভুতিতে চরম আঘাত করার উদ্দেশ্যে যা—ইচ্ছে তাই লিখলেও, এসব লেখকের শাস্তি হয় না, এদের বিরুদ্ধে মামলা হয় না আর এরা শিক্ষকতার মতো আদর্শ পেশায়

অবলীলাক্রমে থেকে যায়। ধন্য আমার সোনার বাংলা আর ধন্য এই সোনার বাংলার কিছু লোকের রুচি।

আবার হৈ হৈ করে লাফিয়ে উঠলো আবুল কাশেম কানাই। সরোষে বললো, বটে-বটে! সেই রাগেই তাহলে তাকে খুন করতে গিয়েছিলেন আপনারা, মানে আপনাদের মতো মৌলবাদীরা?

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো ফারুক মাহমুদ। বললো, আপনি দেখেছেন? মৌলবাদীরাই যে তাকে খুন করতে গিয়েছিল এটা আপনি দেখেছেন?

কানাই মিয়া বললো, দেখতে হবে কেন? মৌলবাদীরা ছাড়া তাকে খুন করতে যাবে আর কে?

ঃ আপনারাও যেতে পারেন। আপনাদের মতো ভারতীয় দালাল গোষ্ঠী ক্ষমতা লাভের জন্যে যেভাবে ক্ষেপে উঠেছেন আর দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে যেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছেন, তাতে আপনাদের আন্দোলন চাঙ্গা করে তোলার লক্ষ্যে এই কাজ আপনারাও করতে পারেন। লাশ নিয়ে রাজনীতি করতে আপনারা বরাবরই পারঙ্গম। সে ক্ষেত্রে বিতর্কিত লেখক হুমায়ুন আজাদের লাশটা তো আপনাদেরই প্রয়োজন ছিল বেশি। ঘোলাপানিতে সুন্দর মাছ শিকার করা হতো!

ঃ খবরদার! আমাদের ঘাড়ে মিথ্যা দোষ চাপাচ্ছেন কেন?

ঃ কেন চাপাবো না? প্রমাণ ছাড়াই আপনারা যখন সঙ্গে সঙ্গে মৌলবাদীদের দোষী করতে পারেন, তখন আমরাও তো এই দোষ আপনাদের ঘাড়ে দিতে পারি। লাশ নিয়ে রাজনীতি করার প্রবণতা যেখানে এত বেশি আপনাদের—সেখানে—।

ঃ কখনো না। আমরা কখনো লাশ নিয়ে রাজনীতি করিনে। আমাদের দল বা বামদলগুলোর কেউই তা কখনো করে না। হুমায়ুন আজাদ আমাদের দলের লোক। আমরা তাকে খুন করতে যাবো কেন?

ঃ তাই যদি না যাবেন আর আপনাদের দলের হাত যদি না থাকবে, তাহলে কুপিয়ে আহত করা মানুষকে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা না করে তাকে তুলে ধরে তার ছবি তোলা আর ঐ অর্ধমৃত দেহটা নিয়ে এত উল্লাস করার লোক ঐ মুহূর্তে ওখানে এলো কোত্থেকে? সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আঘাতকারীদের তো তখন ওখানে থাকার কথা নয়।

ঃ থাকার কথা নয়?

ঃ না, নয়। এটা এখন আপনাদের দলের পূর্ব-পরিকল্পনা বলেই অনেকের কাছে মনে হচ্ছে। তাই আহত হওয়ার সাথে সাথেই, কিংবা বলা যায়—চোখের নিমেষেই, ক্যামেরা এলো, ছবি তেলা হলো, সামরিক হাসপাতালে নিলে রুগী বেঁচে যেতে পারে বলে সামরিক হাসপাতালে নেয়াতে বাধা দেয়া হলো এবং কফিন মিছিল বেরুলো। একদম ভানুমতির খেল্। কফিনটা আগে থেকেই তৈরী করা না থাকলে আর মিছিল করার জন্যে অগ্রিম পরিকল্পনা না থাকলে, এত লোক চোখের পলকে জুটলো

কোত্থেকে আর সাজানো গুছানো কফিনটা সঙ্গে সঙ্গে মিছিলকারীদের কাঁধে এলো কি করে? আপনাদের দেবতা বিশ্বকর্মা এসে বুঝি তৎক্ষণাৎ ওটা বানিয়ে দিয়ে গেল?

ঃ আরে-আরে! মনগড়া কথা খুব গড় গড় করে বলে যাচ্ছেন যে বড়? আমরা তাকে খুন করতে চাইবো কেন?

ঃ ঐ যে বললাম, আপনাদের চলমান আন্দোলন তীব্র করে তোলার জন্যে একটা লাশ আপনাদের বড়ই প্রয়োজন ছিল আর হুমায়ুন আজাদ সাইজের একটা লাশ তো ছিল সে ক্ষেত্রে একটা তোফা ব্যাপার। চট্ করে পাবলিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতো। সেজন্য দু'একজন নিজের দলের লোক খরচ হয়, হোক। ওদিকে আবার, ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের এমন একটা টাট্‌কা সরেস সুযোগ! অর্থাৎ সন্দেহের আঙ্গুল কেউ আপনাদের দিকে তুলবে না। হুমায়ুন আজাদ একজন বিতর্কিত লেখক আর ইসলামপন্থীরা সেজন্যে নাখোশ। অতএব অশ্বত্থমা হত, ইতি গজঃ।

গর্জে উঠলো নানক। বললো, থামুন। ফালতু কথা বলবেন না। হুমায়ুন আজাদ সাহেব নিজেই বলেছেন, মৌলবাদীরা তাঁকে খুন করার জন্যে কুপিয়েছে।

আবার জবাব দিলো মনোয়ার হোসেন। বললো, তাই তো বলবে। হুমায়ুন আজাদ আপনাদের দল করে। কে তাকে আঘাত করেছে তা অবশ্য এখনও অনিশ্চিত সেটা এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি। উদ্ঘাটিত হলে তবেই বোঝা যাবে আসল ঘটনা কিন্তু আপনাদের দলের লোকেরাই যদি তাকে আঘাত করে থাকে, তাহলেও কি হুমায়ুন আজাদ বলবেন সে কথা? তিনি কি সেক্ষেত্রে বলবেন, তার দলের লোকেরাই তাকে আঘাত করেছে? তাহলে থুথুটা তার নিজের গায়ে এসেই পড়বে না কি? তাছাড়া তার ঐ বিশেষ দলই তাকে আঘাত করেছে বললে, জামাই আদরে সরকার তার এত তদবির করবে কেন, আর সরকারী পয়সায় এত চিকিৎসাইবা করাবে কেন? হুমায়ন আজাদ তো নীরেট একজন মূর্খ নন? যা ঘটেছে তা আর রদ হবার নয়, সেটা তিনি বোঝেন। খামাখা কেন নিজের গায়ে থুথু ফেলবেন তিনি?

ঃ তার মানে? আপনি তাহলে বলতে চান, এটা আমাদের দলের ষড়যন্ত্র?

অসম্ভব কি? ব্যাপারটা যখন অন্ধকারেই রয়ে গেছে তখন কেবল মৌলবাদীরাই দায়ী হবে কেন? আপনাদের দলও হতে পারে।

ঃ অসম্ভব! আমাদের দল কখনো ষড়যন্ত্র করে না। ষড়যন্ত্র করে লোক মারে না তারা।

ঃ মারে না? উদিচীর অনুষ্ঠানে, রমনার বটমূলে, টুঙ্গিপাড়ায় ও অন্যান্য জন সমাগমে নিজেরা বোমা ফাটিয়ে এত মানুষ মারলো আর সেই দোষ পরহেজগার ইমাম ও নামাজী মুসল্লীদের ঘাড়ে সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় চাপিয়ে দিলো, তবু বলছেন আপনাদের দল মানুষ মারার ষড়যন্ত্র করে না? হরতাল সফল করার জন্য এই সেদিনও

চলন্ত বাসে পেট্রোল ঢেলে এত মানুষ পুড়িয়ে মারলো, তবু বলছেন আপনাদের দল মানে আপনারা মানুষ মারেন না, আর মানুষ মারার ষড়যন্ত্র করেন না। যদিও প্রেট্রোল ঢেলে মানুষ মারার ব্যাপারটা এখনো তদন্তাধীন। www.boighar.com

ঃ না, করিনে। আমরা, মানে আমাদের দল আর বামদলগুলোর কোন দল, কখনো মিথ্যা কথা বলিনে, মিথ্যা নিয়ে ঢোল বাজাইনে আর মিথ্যা নিয়ে অপপ্রচার করিনে। ওটা মৌলবাদীদের কাজ। আলবদর রাজাকার আর মৌলবাদীদের কাজ।

ঃ বটে! আপনারা কখনো মিথ্যা কথা নিয়ে ঢোল বাজান না বা মিথ্যা প্রচার করেন না? জাজ্জল্যমান একটা মিথ্যাকে সত্য বানানোর জন্য আপনারা যে হারে ঢোল পেটেন, কোন ঈমানদার তা কখনো করতে পারে না। ঈমানদারদের ঈমানে আর রুচিতে তা চরমভাবে বাধে।

যথা। দেখান তো দেখি এমন একটা ঘটনা?

ঃ দেখবেন? একটা সাধারণ ঘটনাই দেখুন। এইতো বছর দুয়েকের মতো সময় আগে ওটা আপনারা করলেন কি? এক শেয়ালের সাথে শত শেয়াল গলামিলিয়ে এই যে সমানে চীৎকার করতে লাগলেন—"আমাদের দলনেত্রী একজন প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্রী। উনি প্রথম বিভাগে বি.এ. পাশ করেছেন, ফাস্ট ক্লাস পেয়েছেন বি.এ.তে, শুধু ফাস্ট ক্লাশই নয়, ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হয়েছেন বি.এ.পরীক্ষায়"-এই বলে যে নির্লজ্জের মতো এত গলাবাজী করলেন, তবু বলছেন মিথ্যা প্রচার চালান না আপনারা? উনার স্বামী ডাক্তার সাহেব যদি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে না দিতেন, মানে সত্যটা প্রকাশ না করতেন তাহলে কি থামানো যেতো আপনাদের। ডাক্তার সাহেব যখন বললেন—বি.এ.তে কয়েকবার ফেল করার পর বাপের সুপারিশে আপনাদের দলনেত্রী স্পেশাল কনসিডারেশানে বি.এ.পাশ করেছেন তবেই না খামুশ হলেন আপনারা।

ঃ আরে সে কোন্ অতীতে কে কোন্ মিথ্যা কথা বলেছে, আজও সেই তেনা ছিঁড়ছেন? হাল আমলে দেখান দেখি—কোথায়, কবে, কখন আমাদের দলের কে কোন্ মিথ্যা কথা বললো?

বললো না? বাহ্! এত শিগ্গির এমন জাজ্জল্যমান ঘটনাটি ভুলে গেলেন? স্মৃতি শক্তি আপনাদের এতটাই কম? আপনাদের দলের জেনারেল সেক্রেটারী, সাধারণ কোন সমর্থক নয়, দলের একদম সাধারণ সম্পাদক সাহেবের ডাহা মিথ্যা কথাটা ভুলে গেলেন এই কয়দিনেই। সেই সাহেব মাসাধিক কাল ধরে এন্তার বলে বেড়ালেন—আমি হলপ করে বলছি, আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে আমি বলছি, ৩০শে এপ্রিলের পরের দিনই খালেদা জিয়া আর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না, সাবেক প্রধান মন্ত্রী হয়ে যাবেন। কিন্তু যেই ৩০শে এপ্রিল পার হয়ে গেল আর খালেদা জিয়া সাবেক প্রধান মন্ত্রী হলেন না অমনি আপনাদের দলের সাধারণ সম্পাদক সাহেব হলফিল্ আর নির্দ্বিধায় বলে বসলেন, না আমি সে কথা কখনো বলিনি, ওটা সাংবাদিকেরা বলেছে। এতটা নির্লজ্জ হতে পারলেন আপনাদের সেক্রেটারী? পারলেন এতবড় মিথ্যা কথা

বলতে? বোঝার উপর শাকের আঁটি-আপনাদের দলনেত্রীও সুর পালটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, ৩০শে এপ্রিলই ডেড লাইন হবে কেন, সামনের মাস গুলো তেও ৩০ তারিখ আছে। মা তোর কত রঙ্গ দেখবো, বল্।

ঃ তা এসবকে মিথ্যা কথা বলছেন কেন? এসব হচ্ছে রাজনৈতিক চাল।

ঃ চাল? চালবাজী করে মিথ্যা কথা বললে সেটা কি মিথ্যা কথা হয় না? মিথ্যার বদ্‌রং তাতে কি ধু'য় মুছে উঠে যায় আর মিথ্যাটা সত্য হয়ে যায়? এসব ঘৃণ্য চালবাজী আপনারা করতে পারেন কি করে?

সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার কল ঘুরিয়ে ফেললো নানক।

বললো, চালবাজী? নাঃ! চালবাজীই বা করলাম আমরা কোথায়?

মনোয়ার হোসেন বললো, করলেন না? আপনারা আর আপনাদের দল সহ বামদলগুলো তা করছে না? দেশে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে বর্তমান সরকার এত চেষ্টা করছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এদেশে এত নিরাপদে আর হেফাজতে আছে, তবু আপনাদের দল আর কিছু কিছু বামদল দেশে বিদেশে এইমর্মে এন্তার চীৎকার করে বেড়াচ্ছে যে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শেষ হয়ে গেল, আল কায়দা-আলবদর আর সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীরা তাদের মেরে ধর্ষণ করে শেষ করে ফেললো। বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে এই বিষ আপনারা সমানে ঢালছেন। সেই সাথে এদেশের ভাদা জাতীয় বুদ্ধিজীবী আর ভারতের সেবাদাস ও মুসলিম বিদ্বেষী কাগজ গুলি কোমর বেঁধে এই মিথ্যা একযোগে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এতে দেশ আর জাতির কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়ে তাদের আদৌ কোন মাথা ব্যথা নেই। এক কথায় আপনাদের চাই ক্ষমতা আর গদী। দেশ জাতি, ধর্ম তাতে জাহান্নামে যায়, যাক। গদী দখল করতেই হবে আপনাদের । স্বার্থপর আর বলে কাকে?

ঃ কি, আমরা স্বার্থপর? আমাদের দলের লোকেরা স্বার্থপর?

ঃ শুধু স্বার্থপরই নয়। স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী আর ঘরশত্রু বিভীষণ। ভারতের গুজরাটে আর অন্যান্য প্রদেশে উগ্র সাম্প্রদায়িক ভারতবাসীরা যে হাজার হাজার মুসলমানদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারছে, তাদের সর্বস্ব লুট করছে, মহিলাদের ধর্ষণ করছে-কৈ, তা নিয়ে তো একটা কথাও আপনাদের দলের মুখে নেই? এই সত্য ঘটনা নিয়ে তো আপনাদের সমমনা কাগজগুলো একটা কথাও লেখে না? এই জাজ্জল্যমান সত্যকে বেমালুম চেপে রেখে এদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের মিথ্যা কথা ঐ বেহুদা কাগজগুলো ছাপায় কোন আক্কেলে আর আপনারা তা বলেনই বা কোন লাজে? স্বার্থের জন্য এতটা দালালী আর অপপ্রচার করতে পারে আপনাদের দল আর দলের লোকেরা?

ঃ স্বার্থের জন্যে?

ঃ বিলকুল স্বার্থের জন্যে। ভারত আপনাদের প্রভু। ভারতের দালালী করাই হলো আপনাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। ঐ দালালী করাতে আপনাদের অনেক লাভ অনেক

পাওনা। কাজেই ভারত নাখোশ হলে আপনাদের স্বার্থ ভীষণ ভাবে ক্ষুণ্ন হবে হেতু ভারতের ঐ নৃশংসতার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলতে পারেননি আপনারা। পারেনি আপনাদের দলের একটা লোকও, পারেনি ঐ ভাদা কাগজগুলোর একটা কাগজও। কোনদিনই তা পারবেন না কেউ আপনারা। অথচ নিজদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন আর হত্যার নিছক বানোয়াট কাহিনী সবাই আপনারা অনর্গল প্রচার করে বেড়াচ্ছেন দেশের ভেতরে আর বাইরে।

ঃ বললেই হলো? কেন আমরা তা বেড়াবো? তাতে আমাদের লাভ কি!

ঃ ঐ তো বললাম, লাভ স্বার্থসিদ্ধি করা। নানা প্রকার অপপ্রচারের মাধ্যমে দেশটাকে একটা সাম্প্রদায়িক আর অস্থিতিশীল দেশ বলে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে, আপনাদের দলের ক্ষমতা অর্থাৎ গদী দখলের পথ প্রশস্ত হয়—এই কারণে। আপনাদের মাথায় তো শুধু ঐ এক চিন্তা—গদী দখল—গদী দখল—গদী দখল।

ঃ বটে!

ঃ শুধু কি তাই? আপনাদের স্বার্থে আর হীন উপার্জনে ঘা লাগলেও যে আপনারা আরো কত আজগুবী অপপ্রচার চালাতে পারেন—আপনাদের দলের আর বামদলগুলির বর্তমান আবিষ্কার বাংলাভাই রূপকথাটিই তার প্রমাণ। রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, আত্রাই রাণীনগর—প্রভৃতি এলাকায় দীর্ঘদিন যাবত সর্বহারা নামক একদল সংগঠিত সন্ত্রাসী মানুষ জবাই করে দেদার চাঁদা আদায় করে বেড়াচ্ছে। হত্যার ভয় দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করছে। চাঁদা না দিলে দিনে দুপুরে জবাই করছে তাকে বা তাদেরকে। দিন রাত সব সময় ঐ সব এলাকায় এমন মানুষ জবাই করার ঘটনা সমানে ঘটছে। একই পরিবারের ছয় সতজনকেও একসাথে জবাই করছে তারা। জবাই করার ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করছে। চাঁদা আদায় করছে চিঠির সাথে কাফনের কাপড় পাঠিয়ে। ক্ষেতের ফসল পর্যন্ত অগ্রীম দাবী করে আসছে আর আদায় করে ছাড়ছে। এইসব নৃশংস কাজ কারবার, এগুলো ছিল ঐ সব এলাকার নিত্য দিনের ঘটনা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে এ যাবত একটা কথাও তো আপনাদের দল আর বামদলগুলোর মুখ থেকে বেরোয়নি? একটা টুশব্দও তো করতে তাদের শোনা যায়নি? সর্বহারাদের অত্যাচারে জনগণের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ায় সর্বহারা নামের এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জনগণ যখন একজোট হয়েছে, পুলিশও জনগণের ব্যাপক সমর্থন পেয়ে যখন রুখে দাড়িয়েছে ঐ কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আর তাদের প্রতিরোধে সর্বহারারা যখন খামুশ হয়ে যাচ্ছে, অমনি আপনাদের দল আর বামদলগুলো ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিয়েছে এই প্রতিরোধকারী জনগণের বিরুদ্ধে। তাদের জাগ্রত মুসলিম জনতা, আলকায়দা বাহিনী এবং সবশেষে 'বাংলাভাই' নাম দিয়ে এদের দমন করার জন্য আপনাদের দল আর বামদলগুলো উঠে পড়ে লেগেছে। চীৎকার জুড়ে দিয়েছে, এই বাংলাভাইয়ের দল ঐ এলাকায় মানুষ মেরে শেষ করে ফেলছে। এর হেতু কি?

সর্বহারাদের এতদিনের এতবড় অন্যায়ের প্রতিকার শুরু হলো যখন, তখনই বামদলগুলোর আর বিরোধী দলের আঁতে ঘা লাগার হেতু কি?

গৌতম মিয়া বললো, হেতুটা কি বলে মনে করছেন আপনারা?

ঃ তাদের স্বার্থে ঘা লাগা। অবৈধ উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়া।

ঃ অবৈধ উপার্জন মানে?

ঃ মানে জঘন্য উপার্জন। থলের বিড়াল ক্রমেই বেরিয়ে আসছে এখন। বিভিন্ন তদন্তের প্রেক্ষিতে, জনগণের মুখ থেকে আর বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে এখন দেখা যাচ্ছে—সর্বহারাদের আদায় করা ঐ লক্ষ লক্ষ চাঁদা সর্বহারারা একাই ভোগ করতো না। ঐ চাঁদার সিংহভাগ পেতো আপনাদের দল ও বামদলগুলো। বিশেষ করে, সপ্তাহে সপ্তাহে ঐ অবৈধ পথে প্রচুর অর্থ আসতো আপনাদের দল ও বামদলগুলির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের পকেটে। খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই সব ডাকসাইটে নেতৃবৃন্দই সর্বহারাদের গডফাদার। সর্বহারারা এই সব নেতাদেরই মদদপুষ্ট একটি সন্ত্রাসীদল। সর্বহারাদের লালন করে সর্বহারাদের মাধমে দীর্ঘদিন যাবত এই হীন উপার্জন করে আসছেন এই সব বর্ণচোরা নেতা নেত্রীরা। সর্বহারাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠায়, সেই প্রচুর আয় তাঁদের বন্ধ হয়ে গেছে আর অমনি আপনাদের দল আর বামদলগুলো একসাথে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। বাংলাভাই নামের ঐ প্রতিরোধকারী সংগঠন বা জনগণের জোট ভেংগে যাক, সর্বহারারা আবার মানুষ জাবাই করে চাঁদা আদায় করুক আর তার মোটা ভাগ তাঁদের দিতে থাকুক—এই হলো এইসব নেতানেত্রীর উদ্দেশ্য। কি হীন আর নীচু মানসিকতা এদের।

ফারুক মাহমুদ এই প্রেক্ষিতে বলে উঠলো, শেম্-শেম্।

গৌতম মিয়া প্রশ্ন করলো, তাঁরা যে চাঁদার ভাগ পেতেন, তা কি নিশ্চিতভাবে জানেন আপনারা?

মনোয়ার হোসেন বললো, নিশ্চিতভাবে জানার দরকার কি? "ঠাকুর ঘরে কেরে, আমি কলা খাইনি," এ থেকেই তো বোঝা যায়। সর্বহারাদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের সময় একটা কথাও যারা বললো না, সর্বহারাদের যেই থামিয়ে দেয়া হলো আর অমনি তারা হৈ-হৈ করে উঠলো, এ থেকে কি বুঝা যায়? স্বার্থে ঘা লাগার ব্যাপার নয় কি? এছাড়া বিভিন্ন লেখালেখিতে, স্থানীয় জনগণের বর্ণনায় আর তদন্তকারী টিমের আলোচনায় এই সত্য ক্রমেই এখন প্রাধান্য পাচ্ছে আর সর্ব সাধারণের কানেও পৌঁছে যাচ্ছে।

ঃ তাহলে আপনারা নিশ্চিত যে এখবর ঠিক?

ঃ আলোচনায় এসেছে যখন, তখন আরো কিছুদিন যাক, ঠিক-বেঠিক ভবিষ্যতই তা বলবে। অবশ্য ধামাচাপা দিয়ে ফেললে কিছুই জানা যাবে না। তবে যা রটে তা কিছু কিছুতো বটেই।

ঃ বটে। তাহলে আপনারা এও মনে করেন যে সর্বহারারাই কেবল সন্ত্রাসী আর 'বাংলাভাই' এর দল দুধে ধোওয়া মুক্তি দূত?

আপাতত অবস্থাটা একশোভাগ এই রকম। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের পেটে। আমরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নই।

গৌতম বললো, এসব কথা কোনটাই আপনাদের ন্যায্য কথা নয়। আমাদের দল কখনো হীন স্বার্থপর দল নয়। আমাদের দল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। জনগণের প্রতি আমাদের দলের দরদ অপরিসীম। তাই আমাদের দল সর্বক্ষেত্রেই জনগণের কথা বলে। জনগণের দুঃখ কষ্ট দেখলেই আমাদের দল সেই ইস্যু নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলে—তা দেশের যে কর্ণারেই হোক।

ঃ জনগণের দুঃখ কষ্ট দেখলেই নয়, বরং বলুন নিজেদের স্বার্থ আর ইস্ট ব্যাহত হলেই। ডাহা উল্টা কথাটা বলেন কেন? নিজ স্বার্থ ছাড়া দেশ-জাতি-জনগণ, এসবের কোন তোয়াক্কা রাখে নাকি আপনাদের দল?

ঃ কে বলে রাখে না? আমাদের দল মানেই জনগণের দল। কোন পক্ষপাতিত্ব, জুলুম, অন্যায় অবিচার-এসব কিছুই আমাদের দলের ডিক্শনারীতে নেই। কারণ আমাদের দল অত্যন্ত কঠিনভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

ঃ কঠিন ভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী? বাহবা, কথা একখানা বলেছেন বটে। ক্ষমতা ছাড়া যে দল আর কিছুই বোঝে না, ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে গেলেই যে দলের মাথা খারাপ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় সেই দল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী? একথা বলছেন আপনি কোন মুখে?

আর কথা খুঁজে না পেয়ে গৌতম মিয়া গায়ের জোরে বললো, কোন মুখে মানে? আমাদের দলের প্রধান হলেন গণতন্ত্রের প্রতীক। গণতন্ত্রের মানসকন্যা। গণতন্ত্রের সরোবরেই তাঁর জন্ম। তাঁর দল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হবে না কেন?

জবাবে মনোয়ার হোসেনও ব্যাঙ্গ করে বললো, থাক-থাক, আর বুলেন না ছাব! হুন্‌লে হালায় ঘোড়ায় আবার হাসবো!

গৌতম মিয়া চোখ গরম করে বললো, তার অর্থ?

মনোয়ার হোসেন শক্তকণ্ঠে বললো, আপনাদের নেত্রীর বাপ গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় শাসন চালু করে রক্ষীবাহিনীর দ্বারা বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়ে যেভাবে ঘোর স্বৈরতন্ত্র চালু করে ছিলেন, তাতে জেনারেল জিয়াউর রহমান এসে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু না করলে, এদেশে গণতন্ত্রের কোন নাম নিশানাই থাকতো না। তখন এই গণতন্ত্রের মানসকন্যার এই গণতন্ত্র থাকতো কোথায়? বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করে জিয়াউর রহমানই তাকে এদশের রাজনীতিতে আনলেন বলে গণতন্ত্রের মুখ দেখলেন আপনাদের নেত্রী। নইলে, জন্মগত ভাবেই যার ধমনীতে আছে স্বৈরতন্ত্রের রক্ত, তিনি হলেন 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা' গলার জোরে আপনারা তেলাপোকাকেও ময়ুর বানাতে পারেন। বটে!

ক্রোধে গর গর করতে করতে আবুল কাশেম কানাই বললো, খবরদার, বাজে কথা বলবেন না!

ঃ বাজে কথা? কানাই বাবুও বলছেন বাজে কথা? আপনারা এদেশটাকে যে ভারতের পায়ের তলে দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, এদেশ থেকে ইসলামকে উৎখাত করে এদেশের সকল অধিবাসীকে যে ভারতপন্থী করার জন্যে আদাপানি খেয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এদেশের সবাই আপনাদের মতো 'ভাদা' আর ভারতপন্থী হলে যে দেশটাকে অনায়াসে ভারতের সাথে এক করে দেয়া যায়, পূর্ণ হয় আপনাদের দীর্ঘদিনের অভিলাস—এসবও কি বাজে আর অন্যায় কথা?

ঃ তারপর?

ঃ স্বজাতি মুসলমানের চেয়ে বিজাতি হিন্দুরাই আপনাদের কাছে অধিক আপন আর অধিক প্রিয়। আপনারাই তাদের আস্কারা দিয়ে দিয়ে বেজায় বেয়াড়া আর দুঃসাহসী করে তুলেছেন। কথায় কথায় তারা এখন এই দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের হুংকার দেয়। এদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কোন প্রয়োজনই তাদের রাখেননি আপনারা—এটা কি অস্বীকার করতে পারেন?

ঃ তার মানে? আমরা তাদের আস্কারা দিয়েছি?

ঃ অফ্‌কোর্স্ দিয়েছেন! আস্কারা উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা জুগিয়ে তাদের চরম উদ্ধত করে তুলেছেন। নইলে একজন হিন্দু দারোগা জুতা পায়ে দিয়ে এদেশেরই মসজিদে ঢুকে মানীগুনী এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুসল্লীদের দাড়ি ধরে টানা হেঁচড়া করতে পারে কোন্ স্পর্দ্ধায় আর কার আস্কারায়? ভারতে একজন ম্লেচ্ছ জাতীয় হিন্দুর টিকিতেও কি হাত দেয়ার উপায় আছে কোন মুসলমান পুলিশের? তাহলে কি ভারতের হিন্দুরা হাড়গোড় আস্ত রাখবে তার? অথচ আপনাদের দেশে একজন হিন্দু পুলিশ জুতা পায়ে দিয়ে মসজিদে ঢুকে এতবড় একটা গর্হিত কাজ করলো, আর আপনারা করলেন কি? এর বিরুদ্ধে একটা নিন্দাবাদ জানাতেও পারলেন না। বরং দাঁত বের করে উল্টো আরো হাসলেন?

ঃ হাসলাম?

ঃ হ্যাঁ হাসলেন। শুধু হেসেই তবু থামলেন না। যারা নিন্দা—জানাতে গেল, এই গর্হিত কাজের যারা প্রতিবাদ করতে চাইলো, লাঠি শোটা নিয়ে তাদেরও বিরুদ্ধাচারণ করলেন। আপনাদের গুণের কি শেষ আছে? মুসলমানরে ঘরে জন্ম গ্রহণ করে মুসলমান জাতিকে উপহাস করার জন্য আপনারা কুত্তার মুখে দাড়ি লাগান আর কুত্তার মাথায় টুপি পরিয়ে উল্লাস করেন। বুদ্ধিজীবী নামের আপনাদের একদল দুর্বুদ্ধিজীবী এসব কাজে আরো পারঙ্গম। ইসলামকে হেয় করার জন্যে তারা আরো কত কি করছেন, বকছেন আর লিখছেন—তার হিসেব নেই। প্রগতির ধূয়া তুলে এরাও কত খেলাই না খেলছেন। ইসলামকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করার পাশাপশি কত রঙ্গই না দেখোচ্ছেন।

ঃ যেমন?

ঃ আপনাদের প্রগতিবাদী কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা এক মুখে প্রগতির কথা বলেন, নীতি-আদর্শ, সভ্যতা-ভব্যতার গালভরা বুলি আওড়ান, অগ্রসর মানুষ উন্নত চরিত্রের মানুষ বলে বুক উঁচিয়ে বেড়ান, অন্য দিকে তাঁরাই আবার যৌন বিকারগ্রস্ত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের আঁচলের তলে ঘুর ঘুর করে বেড়ান। তসলিমা নাসরিনের বিছানায় রাত কাটাতে কসুর নেই কারোই আর সেই চান্স্ পাওয়ার আশায় ছুটোছুটি করতে কমতি দেখা যায় না কারো মধ্যেই।

কৌশিক আহম্মদ কেদার বললো, কোথায় পেলেন এসব কথা?

ঃ ঐ তসলিমা নাসরিনেরই লেখা 'ক' উপন্যাসে। আপনাদের অগ্রসর মানুষ ঐ সব প্রগতির ফেরিওয়ালাদের মুখোশ সে উন্মোচন করে দিয়েছে। এতে করে তসলিমা নাসরিনের সাথে এতদিনের তাদের পিরীতের হাঁড়িতে পিঁপ্‌ড়ে ধরে গেছে। যে তসলিমা নাসরিন এতদিন তাদের কাছে ছিল দেবী, হাটে ঐ হাঁড়ি ভেঙ্গে দেওয়ার পর এখন সে তাদের কাছে ডাইনী হয়ে গেছে। এসব অর্থাৎ যত আর যে সব বিষয় তুলে ধরা হলো, তা চলমান ঘটনা। এরপরে যে আরো কত কি ঘটবে আর ঘটাবেন আপনারা, তা কে জানে।

ঃ বটে?

ঃ ঈমান আপনাদের এত ঠুন্‌কো, ইসলামের নামে আপনাদের গায়ে এত ফোসকা পড়ে যে, আপনারা মুসলমান, না হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-বুঝে ওঠে সাধ্য কার?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আপনাদের রক্ত পরীক্ষা করলে তবেই বোঝা যাবে—আপনাদের জন্মের উৎসটা কোথায়?

এ কথায় একসঙ্গে গর্জে উঠলো কেদার-কানাইদের দল। সবাই তারা সগর্জনে বললো, তবেরে! ব্যাটা কূপমণ্ডুক অর্বাচীন মৌলবাদীর দল। এতবড় স্পর্ধা আমাদের জন্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলে? মার শালাদের, মার—

তেড়ে এলো এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের দল। সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়ালো মনোয়ার হোসেন আর ফারুক মাহমুদও। সেই সাথে ড্রইংরুমের আন্দরমুখী দরজার আড়ালে অপেক্ষারত ইরফান মিয়া সহ সেই তিনচারজন বলিষ্ঠ যুবক তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো ড্রইংরুমের ভেতরে এবং লাঠি তুলে এই উচ্ছৃঙ্খলদের উদ্দেশ্যে হুংকার দিয়ে বললো, হুঁশিয়ার!

চোখ এদের বাঘের মতো জ্বলছিল। এদের হাতে লাঠি আর এই উগ্রমূর্তি দেখে, গৌতম গং-রা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। আঁতকে উঠে পেছন দিকে সরতে সরতে চীৎকার জুড়ে দিলো, খুন-খুন-খুন করে ফেললো—

এদের সাথের মেয়েগুলো এতক্ষণ সম্বিতহীন ভাবে এদের বাকবিতণ্ডা শুনছিল। তারা আরো অধিক ভয় পেয়ে চীৎকার দিয়ে উঠলো এবং একে অন্যকে

জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগলো থরথর করে। চীৎকারে ও আর্তনাদে এই মেয়েরা পরিস্থিতিটা আরো জটিল করে তুললো।

ড্রইংরুমে হৈচৈ শুনে ছুটে এলেন তলবদার সাহেব। "কি হলো-কি হলো" বলে এসে তিনি দুপক্ষের মাঝখানে দাঁড়ালেন। সাহস পেয়ে গৌতম মিয়া এবার ক্ষোভের সাথে বললো, একি দুলাভাই, নতুন কুটুম পেয়ে আপনি আমাদের বিলকুল পর করে দিলেন? লোক লেলিয়ে দিলেন আমাদের খুন করতে। আমাদেরকে আপনার কি আর কোন দরকারই পড়বে না?

www.boighar.com

তলবদার সাহেব বললেন, সেকি-সেকি! তা হবে কেন?

এরপর ভেতর থেকে আগত যুবকদের উদ্দেশ্যে তলবদার সাহেব বললেন, আরে তোমরা এখানে কেন? এসব কি হচ্ছে? যাও-যাও, ভেতরে যাও সবাই—

নির্দেশ পেয়ে ভেতরের লোকেরা ফের ভেতরে চলে গেল। নাজমুল আলম নানক তবু রুষ্টকণ্ঠে বললো, এক মাঘে শীত যায় না আংকেল! এরপর বাদী পক্ষ যখন এই বাড়ি ঘরের দখল নিতে আসবে, তখন কে তাদের ঠেকায়, দেখবো। আজকের এই লোকদের তখন কি খুঁজে পাবেন ভেবেছেন, না সে বুকের পাটা আছে এদের? ভবিষ্যতের ব্যাপারটা ভুলে যাবেন না বিলকুল!

ভবিষ্যতের সে চিন্তা খেয়ালে আসতেই তলবদার সাহেব বিচলিত হয়ে উঠলেন। ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, না-না, তা ভুলবো কেন? তা ভুলে যাবো কেন? আরে তোমরা কি আমার পর? তোমরাই তো আমার সব।

কানাই বললো, তাহলে আমাদের মারার জন্যে ওদের পাঠালেন কেন?

ঃ না-না, আমি পাঠাইনি-আমি পাঠাইনি। তাহলে বোধ হয় আমাকে সরিয়ে নিয়ে আমার স্ত্রী এই কাজ করেছে।

নানক প্রশ্ন করলো—কে? এই গুণ্ডারা হঠাৎ কোত্থেকে এলো?

তলবদার সাহেব ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—গুণ্ডা নয়-গুণ্ডা নয়, মেহমান। আজকের এই অনুষ্ঠানের মেহমান। তোমাদের চিনতে পারেনি তো তাই। তা সে যাকগে। চলো-চলো, ক্লাবঘরে চলো, এখানে থাকতে হবে না তোমাদের। ক্লাবঘরে গিয়ে বসিগে আমরা, চলো—

ঃ ক্লাবঘরে?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ ক্লাবঘরে। তোমরাও আজকের এই অনুষ্ঠানের মেহমান। আমি তোমাদের দাওয়াত করছি, এসো। ঐ ক্লাবঘরে বসে তোমাদের সাথে খানা খাবো আমি আজ। তোমাদের রেখে আর কোন মেহমানের সাথে আজ খানা খাবো না আমি। চলো-চলো—

সবাইকে ঠেলে নিয়ে ক্লাবঘরে চলে গেলেন তলবদার সাহেব। মনোয়ার হোসেনদের উপস্থিতিটা মুহূর্তে ভুলেই গেলেন তিনি।

১০

ফজরের নামাজ আদায় করে কুরআন তেলাওয়াত অন্তে ফারুক মাহমুদ হাঁটাহাঁটি করার জন্যে বাইরে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো কদর আলী ফারুক মাহমুদের সামনে এসে থপ্ করে বসে পড়ে বললো, সর্বনাশ হয়ে গেল ভাইজান! দুনিয়াটা উলটপালট হয়ে গেল! হায়-হায়, একি অসম্ভব ঘটনা

ফারুক মাহমুদ বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, সেকি, দুনিয়াটা উলটপালট হয়ে গেল কি রকম? এটা কি বলছিস্ তুই?

কদর আলী বললো, উলটপালট হয়ে গেল মানে দুনিয়াটা মিথ্যা হয়ে গেল এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোন মানেই আর রইলো না।

ফারুক মাহমুদ বললো, তাই নাকি? তা কি হয়েছে পরিষ্কার করে বল তো, শুনি।

ঃ দাঁড়িয়ে থাকলে বলি কি করে? স্থির হয়ে বসুন না!

ঃ আরে দূর! বেলা উঠে গেল, একটু হাঁটাহাঁটি কবতে যাবো—

কদর আলী ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, হাঁটাহাঁটি! কিসের হাঁটাহাঁটি? জিন্দেগীটা গোটাই যার বিবাণ হয়ে গেল—বরবাদ হয়ে গেল যার সব— হাঁটাহাটি করে তার আর হবেটা কি?

ঃ বরবাদ হয়ে গেল? কাব জিন্দেগী বরবাদ হয়ে গেল?

কদর আলী ক্ষোভের সাথে বললো, আপনার, আবার কাব?

ঃ সেকি! আমাব জীবন ববরাদ হয়ে গেল? আমার জীবন ববরাদ হলো কি করে?

ঃ কি করে আবার! যাদের সাথে উঠাবসা, মেলামেশা আব ঘনিষ্ঠতা তারা যদি সবাই এক পলকে শেষ হয়ে যায়, তাহলে জীবনে আর থাকেটা কি?

ঃ শেষ হয়ে যায়! তুই কাদের কথা বলছিস্?

ঃ ও বাড়ির কথা। ঐ ইয়াসমীন আরা ভাবী সাহেবা, তওবা, ঐ ইয়াসমীন আরা আপাদের বাড়ির কথা। কার কথা আর বলবো?

অলক্ষ্যে ফারুক মাহমুদের অন্তর কিঞ্চিৎ শিহরিত হলো কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে সে শিহরণ স্থায়ী হতে পারলো না। ফারুক মাহমুদ সঙ্গে সঙ্গে শংকিতভাবে প্রশ্ন করলো—কেন, কি হয়েছে ওদের?

ঃ ওরা সব খতম

ঃ খতম!

ঃ সব কাবার!

মনে মনে ফের চমকে উঠলো ফারুক মাহমুদ। বললো, সেকি! কি বলছিস?

ঃ ও বাড়িতে এখন আর কেউ নেই। শুধু চিল আর চামচিকেই উড়ে বেড়াচ্ছে ওখানে। গোটা বাড়ি উজাড়।

ঃ সেকি! তাহলে সবাই তারা গেল কোথায়?

ঃ ঐ দুনিয়ায়। এ দুনিয়ায় তারা আর কেউ নেই

ঃ কদর আলী।

ঃ আমার কথা বিশ্বাস না হয়, যেয়ে দেখে আসুন।

ঃ কি বলছিস্ পাগলের মতো! তারা কি সবাই মারা গেছে?

ঃ এখন তো সবে সকাল। এতক্ষণ না গেলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে।

কদর আলীর পাগলামীটা এতক্ষণে ফারুক মাহমুদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবার সে শক্ত কণ্ঠে বললো, চোপ্‌রও বেয়াকুফ কাঁহাকার। তুই কি বলতে চাস তা সরাসরি বলবি, না সেরেফ আবোল তাবোল বকে মেজাজটা আমার খাট্টা করে দিবি? কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে, তার অর্থ কি?

ঃ অর্থটা হলো, পুলিশ এসে মোটরগাড়ী ভর্তি করে ও বাড়ির সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। হয় সমদ্দুর, নয় বড় কোন দরিয়ায় সবাইকে ফেলে দেয়ার জন্যে ধরে নিয়ে গেছে।

ঃ বটে? দরিয়ায় ফেলে দেবে?

ঃ দেবে না? বাঁচিয়ে রেখে এ দুনিয়াটা কি আবার নোংরা করার সুযোগ দেবে?

ঃ তাজ্জব! তোর কোনো কথারই তো মাথামণ্ডু পাচ্ছিনে আমি দুনিয়াটা নোংরা করার অর্থ? কি করেছে ওরা?

ঃ সারারাত ধরে ও বাড়ির সবাই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মেয়ে পুরুষ মিলে এমনভাবে নাচানাচি, মাতামাতি আর চীৎকার করেছে যে, আশেপাশের কোন বাড়ির কোন মানুষ ওদের মহল্লায় টিকতে পারেনি। বাধ্য হয়ে তারা ফোন করে সংবাদ দিয়েছে পুলিশকে। পুলিশ এসে দেখে, হ্যাঁ, ঘটনা একদম সত্যি। নারী পুরুষ মিলে এমন ফষ্টি নষ্টি করছে যে, নারী পুরুষ অনেকের পরনে এক টুকরো কাপড়ও নেই। সে এক বিচ্ছিরি অবস্থা। কোন মানুষ চোখ তুলে দেখতে পারে না সে সব। কে যে কাকে নিয়ে জড়াজড়ি করছে আর গড়াগড়ি করছে, তার কোনই ঠিক নাই। একদম ধূলোয় অন্ধকার ব্যাপার। এসব দেখলে পুলিশ কি আব ছাড়ে? ঘেরাও করে সবগুলোকে ধরে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেছে। একজনও পালিয়ে যেতে পারেনি।

কিছুটা আঁচ করে ফারুক মাহমুদ ফের প্রশ্ন করলো—তুই জানলি কি করে?

ঃ কছের আলী বললো সব। ঐ বাড়ির পাশের বাড়ির চাকর কছের আলী

ঃ কছের আলী বললো, ঐ বাড়ির সবাইকে পুলিশ এসে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেছে?

ঃ হ্যাঁ, তাই বললো। বললো, ঐ বাড়ির সবাইকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে। কুকুর বিড়াল ছাড়া ও বাড়িতে মানুষ বলতে আর কেউ নেই

ঃ কেউ নেই? ইয়াসমীন আরা, তার আম্মা, আব্বা,-এঁরা কেউ নেই?

ঃ নেই-নেই। কছের আলী বললো, কাউকে রেহাই দেয়নি পুলিশ। ঐ সব বিচ্ছিরি রকমের নষ্টামী দেখে পুলিশ সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে।

ফের ধমক দিলো ফারুক মাহমুদ। বললো, থাম্! ইডিয়েট কাঁহাকার! ইয়াসমীন আরা, তার আব্বা, আম্মা, এঁরাও নষ্টামী করেছে, বলতে চাস্?

ঃ না-না, তা বলবো কেন? কছের আলী বললো, এটা হচ্ছে একের পাপে দশের শাস্তি। ঐ বাড়িতে এসব হচ্ছে দেখে পুলিশ ও বাড়ির কাউকেই ছাড়েনি।

এরপর মাথায় হাত দিয়ে কদর আলী ফের জার জার কণ্ঠে বললো, হায়-হায়-হায়! একের পাপে দশের শাস্তি হয়ে গেল ভাইজান! এতক্ষণ ওদের লাশ হয়তো ভেসে উঠেছে দরিয়ায়!

কদর আলী বসে বিলাপ করতে লাগলো। ফারুক মাহমুদ এই বেয়াকুফের কাছে আর কিছুই জানতে চাইলো না। তবে একটা কিছু যে ঘটেছে, এটা সে বুঝতে পারলো। তাই, কি ঘটেছে তা জানার জন্যে সে রওনা হলো ইয়াসমীন আরাদের বাড়ির দিকে।

ইয়াসমীন আরাদের বাড়িতে এসে ফারুক মাহমুদ দেখলো, ড্রইংরুমেই বিষণ্ন মনে বসে আছে ইয়াসমীন আরা আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে চাকর ইরফান মিয়া। ফারুক মাহমুদকে দেখেই ইয়াসমীন আরা সজীব হয়ে উঠলো এবং সরবে বললো, এই যে আপনি এসে গেছেন! আসুন-আসুন, বসুন। আপনাকে খবর দেয়ার জন্যে এই মাত্র ইরফান চাচাকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছিলাম।

পাশের আসনে বসতে বসতে ফারুক মাহমুদ বললো, যা শুনলাম তাকি সব সত্যি?

ইয়াসমীন আরা বললো, কি শুনলেন? যা শুনলেন তা আগে বলুন তো, শুনি? দেখি, কতখানি শুনেছেন।

কদর আলীর কাছে যা শুনেছিল, ফারুক মাহমুদ তা সবিস্তারে বর্ণনা করে গেল। নষ্টামীর আর নোংরা দৃশ্যের বর্ণনাটাও যথা সম্ভব সবই দিয়ে গেল। শুনে ইয়াসমীন আরা বললো, হ্যাঁ, আপনি যা শুনেছেন, তা প্রায় সবই সত্যি। তবে এবাড়ির সবাইকে, অর্থাৎ আমাকে, আব্বাকে, আম্মাকে ধরে নিয়ে গেছে—একথা সত্যি নয়। এ বাড়ির কাউকেই পুলিশ ধরে নিয়ে যায়নি। চাকর-বাকরদেরও নয়।

ঃ হ্যাঁ, তাই তো দেখছি! তাহলে কাদের ধরে নিয়ে গেল? ঐ মার্কামারা লম্পট-লম্পটিদের?

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদেরই। তবে ঐ কয়জনই নয়। আব্বাজানের ফালতু প্রশ্রয় পেয়ে লম্পট-লম্পটিতে ঐ জলসাঘর একদম ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। একদিকে গৌতম, নানক, কানাই, কেদার সহ নতুন আরো জনাপাঁচেক বখাটে মস্তানের আর অপরদিকে বন্দনা, মাধুরী অজন্তা জুলিয়েট সহ ঐ রকমই আরো চারপাঁচজন লম্পটির আগমনে জলসা ঘর একদম ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। সেকি মদ খাওয়া আর সেকি বেশ্যাপনা! এরা

এমন মাতলামী, নোংরামী আর হিন্দি ক্যাসেট চালিয়ে এমন হৈচৈ জুড়ে দিয়েছিল যে, উপরতলার দরজা জানালা বন্ধ করেও ঘরে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল আমাদের। প্রতিবেশীদেরও ঐ একই অবস্থা। বাধ্য হয়ে তারা তাদের ঠিক করনীয়টাই করেছে। ফোন করে খবর দিয়েছে পুলিশকে।

ঃ আপনার আব্বাও কি তাহলে আপনাদের সাথে উপর তলায় ছিলেন?

ঃ হ্যাঁ, তাই ছিলেন।

ঃ পুলিশ সেখানে যায়নি?

www.boighar.com

ঃ গিয়েছিল। তারা আমার আব্বাকে ডেকে নিয়ে যথেষ্ট হুমকি-ধমকি করেছিল। কয়েকবার হান্টারও দেখিয়েছে আমার আব্বাকে।

ঃ বলেন কি! তাঁর মতো লোককে হান্টার দেখালো পুলিশ? বিশেষ করে, তিনি যে এই বয়সে নষ্টামী করতে পারেন না, এটা কি বুঝলো না পুলিশ?

ঃ আসলে পুলিশের যে অফিসার পুলিশ টিমের সাথে এসেছিলেন, তিনি আমাদের থানার বর্তমান দারোগা সাহেব নন। দুতিন দিন আগে এই থানায় বদলী হয়ে আসা নতুন সেকেন্ড অফিসার। কে কোন্ চরিত্রের, তার ততটা জানা ছিল না, তাই।

ঃ আচ্ছা।

ঃ তাছাড়া, এ বাড়ির বর্তমান মালিক তো আমার আব্বাই, নাকি? তাঁর বাড়িতে এই রকম সৃষ্টি ছাড়া নোংরামী আর ইতরামী হবে আর পুলিশ তাকে ছেড়ে কথা বলবে, এটা কি কখনো হয়, বলুন?

ঃ তা বটে-তা বটে। তাহলে ঐ লম্পট-লম্পটিদেরই ধরে নিয়ে গেছে শুধু?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওদেরই!

তাহলে আপনাদের আশেপাশের বাড়ির লোকজন, মানে চাকর বাকর, আপনাদের বাড়িতে এসে কাউকে দেখেনি বলে যে খবর দিয়েছে—সেটা মিথ্যা?

ঃ না ঠিক মিথ্যা নয়। তারা এসে ঐ জল্‌সাঘরের সামনে মদের কিছু খালি বোতল, ছেঁড়া জামা-ব্লাইজের কতকগুলো টুকরো আর কয়েক পাটি জুতো স্যাণ্ডেলই পড়ে থাকতে দেখেছে শুধু, আমাদের দেখতে পায়নি। আমরা তখন উপর তলায় ছিলাম আর উপর তলায় থেকেই জানালা দিয়ে আশপাশের পড়শীদের আনাগোনা দেখলাম। নীচে নেমে এলাম তো এই অল্প কিছুক্ষণ আগে।

তাই বলুন। তা পুলিশ ওদের গাড়ী ভরে কোথায় নিয়ে গেল? খবর রটেছে, ওদের নদীতে ফেলে দিয়ে ডুবিয়ে মারবে। এর অর্থ কি?

ঃ তা হবে কেন? তাই কি তারা দেয়, না বিনা বিচারে তা দিতে তারা পারে? তাদের আপাতত থানায় নিয়ে গেছে। আচ্ছা মতো খানিক উত্তম-মধ্যম দিয়ে পরে ওদের কোর্টে চালান দেবে। কেস্‌টা তো পাবলিক নুইসেন্সের বেশি কিছু নয়। কিছু জরিমানা ছাড়া নাকি এর আর কোন শাস্তি নেই। পুলিশ ওদের যতখানি বানাবে, ততখানিই ওদের আসল শাস্তি।

ফারুক মাহমুদ অতঃপর ঘৃণা ভরে বললো, ছিঃ -ছিঃ-ছিঃ! এরপর ঐ প্রগতিশীল অগ্রসর মানুষ গৌতম নানকের দল আর বন্দনা মাধুরীদের ঝাঁক বাইরে মুখ দেখাবে কি করে আর সবার সামনে মাথা উচু করে চলবে কি করে?

জবাবে ইয়াসমীন আরা তাচ্ছিল্যের সাথে বললো, কি যে বলেন! নিজেদের অগ্রসর মানুষ বলে দাবি করে যারা তারা আদৌ কি কোন চরিত্রবান মানুষ, না লাজ লজ্জা বলে আদৌ তাদের আছে কিছু। এসব ঘটনাকে থোড়াই পরোয়া করে ওরা। থার্টিফাস্ট নাইট, ভ্যালেন টাইন ডে, ইত্যাদি উদযাপনে নোংরামী করার অপরাধে পুলিশ আরো কতবার এভাবে ধরে নিয়ে গেছে ওদের। উত্তম মধ্যম দেয়ার সাথে এইসব নট নটীদের আরো কতভাবে লাঞ্ছিত করেছে পুলিশ, তবু কি ওদের শরম আছে, না লাজ হয়েছে কিছু? লোকচক্ষুর আড়ালে এরা নরকের কীট। বাইরে বেরুলে উন্নত, অগ্রসর আর প্রগতিশীল মানুষ।

ঃ সেকি? ছেলেরা না হয় ছেলে বলে পার পেয়ে যায়, কিন্তু মেয়েগুলো? ওদের কি জাত পাত নেই? মা-বাপ নেই ওদের?

ঃ থাকলে কি হবে? গিয়ে দেখুনগে, বাপ মায়েরাও হয়তো ঐ একই রকম। ঐ একই ঝাড়ের বাঁশ। বুড়ো বাপ মেয়ের বয়সী মেয়ের সাথে প্রেম করে বেড়াচ্ছে আর বুড়িমা ঠোঁটে আলতা দিয়ে ছেলের বয়সী বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঢলাঢলি করছে।

ঃ ইয়াসমীন আরা!

ঃ এ আর অবাক হওয়ার ব্যাপার কি? পত্র পত্রিকায় তো আজকাল দেখতেই পাচ্ছেন, কত খ্যাতনামা লেখক আর খ্যাতনামা শিল্পীদের এ ধরনের কীর্তিকলাপের কথা! অগ্রসর মানুষদের ব্যাপার স্যাপার তো!

ফারুক মাহমুদ সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা পাচ্ছি বৈকি! তা কথা হলো এদের এই চরিত্র জেনেও আপনার আব্বা এদের এতটা প্রশ্রয় দেন কেন?

ইয়াসমীন আরা উদাস কণ্ঠে বললো, ঐ যে আব্বার একটা অন্ধ বিশ্বাস-এরাই-শেষকালে উদ্ধার করবে তাঁকে। মানে, রক্ষা করবে তাঁর এই বাড়িঘর আর মিলকারখানা সব। মোকদ্দমায় হেরে গেলে, এরাই বাদীদের লাঠির জোরে কোন কিছুই দখল নিতে দেবে না। বাদীপক্ষকে তাড়িয়ে দিয়ে এই সব কিছুই আব্বার সম্পত্তি বানিয়ে দেবে।

ফারুক মাহমুদ স্মিতহাস্যে বললো, তাই কি কখনো হয়? আইনে হেরে গেলে লাঠি দিয়ে তাকি কখনো রদ করা যায়? কোর্টের রায়ে বাদীপক্ষ এই বিষয় সম্পত্তি পেলে, কোর্টই বাদীপক্ষকে এগুলোর দখল নিয়ে দেবে। ওরা করবে কি?

ইয়াসমীন আরা বললো, সে কথা তো আমরা বুঝি, কিন্তু আমার আব্বা তা বোঝেন না। মামলায় হেরে যাবে এটা নিশ্চিতভাবে বুঝে শেষ ভরসা হিসেবে আব্বা এদের এখন আরো শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন।

ঃ মামলায় হেরে যাবেন, সেটা উনি কি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চিতভাবে?

ঃ পেরেছেন বৈ কি! হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্টের রিপোর্ট আব্বার পক্ষে আসেনি, বদীদের পক্ষে এসেছে। এর পর আর ভরসা থাকে কি?

ঃ তা বটে।

ঃ মামালার তারিখও অতি নিকটে। এই তারিখেই চূড়ান্ত রায় হয়ে যেতে পারে। একান্তই তা না হলে, পরের তারিখে হবেই। আর রায় হলে হারও আব্বার হবেই। আব্বার পক্ষের উকিলও এ ব্যাপারে নিশ্চিত। ফলে, আব্বা আরো আওয়ারা হয়ে উঠেছেন। কাজেই মামলায় রায় না হওয়া পর্যন্ত আব্বা এদের কাঁধে করে রাখবেনই। এদের হাতছাড়া করবেন না।

ঃ বলেন কি! এতবড় এই নষ্টামীর পরেও?

ঃ এর পরেও। আমার বিশ্বাস এই নোংরামী এ বাড়িতে চলতেই থাকবে এর পরেও। এ ইতরদের তো লাজ নেই। ছাড়া পেলেই ওরা আবার হাজির হবে এখানে এসে।

ঃ তাজ্জব! তাহলে তো আপনার আর আপনার আম্মার এখানে থাকাই ভীষণ বিপদজনক। এই মদ-মাতলামী আর নোংরামীর মধ্যে থাকলে তো বেইজ্জতির হাত থেকে আপনারাও রেহাই পাবেন না।

ঃ সেই ভাবনাতেই তো দিশেহারা হয়ে গেছি। আজ পুলিশ আমাদের রেহাই দিয়ে গেলেও, আগামীতে আর রেহাই দেবে না। এই নোংরামীর সাথে কমবেশি আমরাও জড়িত ভেবে আমাদের নিয়েও টানা হেঁচড়া করবে।

ঃ কি সাংঘাতিক! তাহলে তো সত্যিই এখানে আর থাকা চলে না, আপনাদের।

ঃ চলে না বলেই তো এত ভাবনা আমার। এই মুসিবত থেকে কিভাবে বাঁচবো, ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছিনে। এইজন্যেই ইরফান চাচাকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছিলাম আপনাকে ডেকে আনতে। একমাত্র আপনিই এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন আমাদের। অর্থাৎ। আমাকে আর আমার আম্মাকে।

ঃ বলেন কি, আমিই পারি? কিভাবে?

ঃ আমাকে আর আমার আম্মাকে দু'একদিনের মধ্যেই আপনি আপনার দোকান বাড়িতে পার করে নিন। এখানে থাকলে মান ইজ্জত যে আর কিছুই থাকবে না আমাদের, তা আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি। পুলিশ তো পরের কথা, ঐ নোংরা কুত্তারাই যে এসে হামলা করবে না আমার উপর তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। বিশেষ করে, আমার আব্বা ওদের হাতে জিম্মি হয়ে যাওয়ায়, ওদের সাহস এখন আকাশে উঠে গেছে। আমি যে একেবারেই অসহায় এটা ঐ লম্পটেরা ঠিকই বুঝে নিয়েছে। এবার এলে ওরা যে আমার দিকেও হাত বাড়াবে না, এটা আর মোটেই নিশ্চিত-ভাবে বলার উপায় নেই।

ঃ ইয়াসমীন আরা!

ঃ তাই যত শিগ্গীর সম্ভব, আপনি আমাদের আপনার ওখানে নিয়ে নিন।

ভেতর থেকে তলব আসায় ইরফান মিয়া অনেক আগেই ভেতরে চলে গিয়েছিল। তবু ঘরে আর কেউ আছে কিনা, ফারুক মাহমুদ ক্ষিপ্র নজরে তা একবার যাচাই করে নিল। এরপর বিস্মিত কণ্ঠে বললো, সেকি! আপনি কি আমার বউ? নিয়ে নেবো কোন অধিকারে?

ঃ যে অধিকারে নেয়া যায়, সেই অধিকার দু'একদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করে ফেলুন। আমি আমার পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করছি।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ যে কথা আগেও আপনাকে বলেছি, সেই কথা আজও আবার বলছি, আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল। আপনাকে ছাড়া এ জীবনে আর কাউকেই ভাবতে পারিনে আমি। আপনিও আপনার ঐ অসুখের পর এমনই ইচ্ছে আর অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন। আজ চরম মুহূর্ত উপস্থিত। আমি আর মোটেই দেরী করতে চাইনে।

ঃ কিন্তু—

ঃ আর কিন্তু নয়। 'আমি একজন সামান্য লোক, সামান্য একজন দোকানদার'—এসব বাহানার পর্ব অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এসবকে কখনোই আমি আদৌ কোন অন্তরায় মনে করিনি। আপনার সাথে পরিচয়ের পর থেকেই আমি মনে মনে যে আশা পোষণ করে আসছি, আমার সে আশা, আমার সে অভিলাষ, আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। একে আর উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। সে দিনের সে সিদ্ধান্ত আজও আমার ফাইন্যাল সিদ্ধান্ত। কাজেই আর কোন বাহানার মধ্যে না থেকে স্পষ্ট জেনে নিন, আমার আর আম্মার মান সম্মান রক্ষার দায়দায়িত্ব সব এখন আপনার। যা করার তা সত্বর করুন, আমি আর ভাবতে পারিনে।

এই সময় ইয়াসমীন আরার আম্মা আসমা বেগম সাহেবা দরজার আড়াল থেকে বললেন, হ্যাঁ বাপজান, আমিও সেই অনুরোধই করতে চাই তোমাকে। আমি তোমাদের সব কথা শুনলাম। এরপর আর গড়িমসি না করে, আমার মেয়ের দায়িত্বটা যথাসত্বর সম্ভব, তুমি গ্রহণ করো বাপজান।

মায়ের গলা শুনে ইয়াসমীন আরা শরমে ছুটে পালালো তৎক্ষণাৎ। ইয়াসমীনের আম্মা ড্রইংরুমে আসতেই ফারুক মাহমুদ সবিস্ময়ে বললো, সেকি চাচী আম্মা! আপনিও সে কথা বলছেন?

আসমা বেগম বললেন—বলছি বাপজান। আজই কেবল এ কথা বলছি, তা নয়। এ ইচ্ছে আমার দীর্ঘদিনের। অনেক দিন আগে থেকেই মনে মনে তোমাকে আমি পছন্দ করে রেখেছি। আমি স্থির করে রেখেছি, আদবে-আক্কেলে, চেহারায়-চরিত্রে, জ্ঞানেগুণে আমার ইয়াসমীন আরার যোগ্য বর তুমি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

ঃ সেকি চাচী আম্মা, আমি একজন সাধারণ মানুষ তা জেনেও? উপযুক্ত বিদ্যাহীন, অর্থবিত্তহীন, পয়পরিচয়হীন, আমি একজন সামান্য দোকানদার। তবু আমাকেই পছন্দ করলেন আপনি?

ঃ হ্যাঁ বাপজান তোমাকেই আর একমাত্র তোমাকেই আমার পছন্দ। আমার মেয়ের জন্যে তোমার চেয়ে উমদা পাত্র আজও আর কেউ চোখে পড়েনি আমার। বিরাট বিদ্যা আর বিপুল বিষয় বিত্ত চাহিদা নয় আমার। ও সব থাক আর না থাক, আমার চাহিদা একজন ঈমানদার আর সৎ সুন্দর মানুষ সেদিক দিয়ে তুমি আমার চাহিদা ষোল আনাই পূর্ণ করেছো বাপজান মানুষ সৎ আর ঈমানদার হলে তার দারিদ্র কখনো স্থায়ী হতে পারে না। বড়লোক হতে না পারলেও, অন্তত ভদ্র ভাবে জীবন যাপনের সংস্থান তার হয়েই যায়। ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তায়ালাই সে ব্যবস্থা করেন

ফারুক মাহমুদ ইসস্তত করে বললো, কিন্তু এখনি তো আমার এমন কোন পুজি নেই, যা দিয়ে ভদ্রভাবে চলার ব্যবস্থা করবো এছাড়া ভবিষ্যতে—

ঃ হয়ে যাবে বাপজান, হয়ে যাবে সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো। ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠার জন্যে যে পূঁজি লাগে, তাও আমিই যোগান দেবো। আমার আব্বার বিষয় বিত্তের যে অংশ আমার নামে ভাগ করে রাখা আছে, সেটা কিন্তু নগণ্য নয় বাপজান। তা দিয়ে সব কিছুই হয়ে যাবে। তুমি আমার মেয়ের ইচ্ছেটা পূরণ করো। তার দায়িত্ব গ্রহণ করো।

ঃ তার সে ইচ্ছে পূরণের আগ্রহ আমারও যথেষ্টই আছে চাচী আম্মা। কিন্তু সে আগ্রহ আমার যত প্রবলই হোক, তা কার্যকর করি আমি কি করে? মামলায় যদি আপনাদের এই বাড়িঘর চলে যায়, তাহলে তো আমার ঐ দোকানবাড়িও চলে যাবে। তখন আমার নিজের দাঁড়ানোর জায়গাই থাকবে না, ইয়াসমীনকে নিয়ে আমি দাঁড়াবো কোথায়?

আমরা যেখানে গিয়ে দাঁড়াই, তোমরাও আমাদের সাথে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে আমি আর আমার স্বামী গিয়ে আমাদের ঐ পুরানো বাড়িতে উঠবো। আপাতত তোমরাও গিয়ে আমাদের সাথে সেখানেই উঠবে। এরপর অতি সত্বর ভাল পূঁজি পাট্টা সহকারে তোমাদের জন্যে পৃথক বাসস্থান আর বড়সড়ো দোকান-পাটের ব্যবস্থা করে দেবো এর উপর ইয়াসমীন আরা পাশ করে বেরোলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না। তুমি শুধু মন খোলাসা করে বলো, আমার মেয়েকে শাদি করতে তুমি খোশদীলে রাজী আছো কি না।

ফারুক মাহমুদ নতমস্তকে আর স্মিত হাস্যে বললো, রাজী তো মনে মনে আমি অনেকদিন আগে থেকেই চাচী আম্মা। আপনারা আমাকে গ্রহণ করতে পারবেন কিনা সেই চিন্তা করেই নীরব আছি এতদিন।

আসমা বেগম অত্যন্ত খোশকণ্ঠে বললেন, আলহামদু লিল্লাহ। আর চিন্তার কোন কারণ নেই বাপজান। আমার মেয়ের আমিই সব। ওর আব্বার এখানে কোন ভূমিকাই নেই। তিনি এখানে একেবারেই গৌণ। সেই আমিই সর্বান্তঃকরণে তোমাকে চাচ্ছি। কাজেই কথা শেষ। এবার বলো, শাদিটা অতি সত্বর সেরে ফেলতে তোমার কোন

অসুবিধে আছে কিনা। একটা অনাড়ম্বর শাদি। দিন এলে আড়ম্বরের কথা তখন ভাবা যাবে। আপাতত তাকে তোমার কাছে রাখার অধিকারটা প্রতিষ্ঠিত হোক

ঃ ঠিক আছে চাচী আম্মা। তবে এই মুহূর্তে শাদির ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে আর কয়েকদিন দয়া করে অপেক্ষা করুন। বর্তমানে আমি একটা জটিলতার মধ্যে আছি। জটিলতাটা কেটে গেলেই আমি সানন্দে আর সর্বান্তঃকরণে শাদি করতে পারবো। তবে কথা দিচ্ছি, আজ থেকেই ইয়াসমীন আরার দায় দায়িত্ব সব আমার। তার মান সম্মান হেফাজত করার ব্যাপারেও সর্বক্ষণ সতর্ক আর সজাগ থাকবো আমি। এ নিয়ে আপনি আর আপনার মেয়ে আদৌ যেন আর কোন দুশ্চিন্তার মধ্যে না থাকেন—এই আমার অনুরোধ।

এর জবাবে আসমা বেগম সাহেবা শংকিত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন দাঁড়ায় যে, চট করে তাকে শাদি না করলে তুমি তাকে রক্ষে করতে পারবে না, তখন? অর্থাৎ তোমার সেই জটিলতা কাটার আগেই যদি—

ফারুক মাহমুদ দৃঢ় কণ্ঠে বললো, তখন প্রয়োজন হলে দুপুর রাতে আর রাস্তায় দাঁড়িয়েও আমি তাকে শাদি করবো তৎক্ষণাৎ।

ঃ ওয়াদা?

ঃ ওয়াদা আম্মাজান।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

আসমা বেগম তৃপ্তির সাথে ঊর্ধমুখে তাকালেন

১১

ইয়াসমীন আরার আম্মার কাছে ফারুক মাহমুদের ওয়াদা করে আসার পর তিনটে দিনও গেল না ঐ তিন দিনের দিনই তারিখ ছিল মামলার আর মামলার রায় বেরোলো সেই দিনই মামলায় শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন ইয়াসমীনের আব্বা আবদুর রাজ্জাক তলবদার সাহেব। সমস্ত বাড়িঘর আর মিল কারখানার নিরঙ্কুশ মালিক হলো বাদীপক্ষ। আদালত সেই মর্মে রায় ঘোষণা করলো এবং বদীপক্ষকে বাড়িঘর ও মিলকার-খানার দখল বুঝে দেয়ারও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো

দখল নিতে গেলে বিবাদী পক্ষের তরফ থেকে প্রচণ্ড বাধা আসবে—একথা বাদীপক্ষ আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল এবং সেই মোতাবেক আদলতকে অবহিত করলে, আদালত বাদীকে তার বিষয় সম্পত্তির দখল নিয়ে দেয়ার জন্যে স্থানীয় থানার ও.সি.কে নির্দেশ প্রদান করলো।

সঙ্গে সঙ্গে এ খবর রটে গেল চারদিকে। মামলায় কি রায় হয়—এটা জানার জন্যে উভয়পক্ষের সংশ্লিষ্ট লোকজন কান খাড়া করে ছিল। কান খাড়া করে ছিল নাজমা বেগম ও নাজমার বর, তথা ফারুক মাহমুদের বন্ধু মনোয়ার হোসেনও। খবর পাওয়া মাত্র সে সস্ত্রীক ছুটে এলো তলবদার সাহেবের বাড়িতে। ছুটে এলো তলবদার সাহেবের শালা সম্বন্ধী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনও। মনোয়ার হোসেনের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল উভয়বিধ। এক, আত্মীয় তলবদার সাহেবের দুর্দিনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ানো আর দুই, দোকানঘর বেহাত হয়ে যাওয়ার জন্য ফারুক মাহমুদের একটা ব্যবস্থা করার বিষয়ে ফারুক মাহমুদের সাথে আলাপ আলোচনা করা। ফারুক মাহমুদও যথা সময়ে এসে হাজির হলো তলবদার সাহেবের গৃহে। www.boighar.com

ইতিমধ্যে খবর গেল গৌতম-নানকদের কাছেও। একদিন পরেই থানা থেকে ছাড়া পেয়েছে তারা। আদালত থেকে বেরিয়ে এসেই তলবদার সাহেব তাদের কাছে গেলেন আর তলবদার সাহেবের আহবানে তারাও সদল বলে এসে গ্যাঁট হয়ে বসে গেল তলবদারের জল্‌সা ঘরে।

মামলার রায় বেরোলো বেলা বারোটায়। আদালতের নির্দেশে আদালতের পেয়াদা ও প্রসেস্ সার্ভারসহ থানার বড় দারোগা গাড়ী ভর্তি ফোর্স্ নিয়ে তলবদার সাহেবের বাড়িতে এসে হাজির হলেন বেলা তিনটেয়। সাথে এলেন বাদীপক্ষের উকিল, বাদীর হয়ে মামলার তদবির কারক, এবং রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ও লোকজন চিনিয়ে দেয়ার জন্যে একজন সনাক্তকারী।

মামলার রায়ের খবর এসে পৌঁছার সাথে সাথে মহাহুলুস্থুল পড়ে গেল তলবদার সাহেবের বাড়িতে। অধিক আকুল হয়ে উঠলেন তলবদার সাহেবের পত্নী আসমা বেগম সাহেবা। মনোয়ার হোসেন এবং কিছু পরে পরেই ফারুক মাহমুদ সেখানে এসে হাজির হলে আসমা বেগম সাহেবা তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন কি হবে বাবা সকল। শুনছি বাদীপক্ষ আজই বাড়ির দখল নিতে আসছে। আমাদের বের করে দেবে বাড়ি থেকে। জিনিসপত্র কিছুই গুছানো হলো না। এতসব লটবহর নিয়ে এখনই আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো কেমন করে?

জবাব দিলো ফারুক মাহমুদ। বললো, ব্যস্ত হবেন না আম্মাজান। বের করে দিতে চাইলেই তো হবে না, সেজন্যে সময় দিতে হবে। বাদীপক্ষের লোকজনদের সমঝিয়ে সে ব্যবস্থা করে নেবো'খন।

আসমা বেগম সাহেবা ফারুক মাহমুদকে বললেন, তোমার জিনিসপত্তর কি গুছিয়ে নিয়েছো বাপজান? তোমার জিনিসপত্তর আর দোকানের মালামাল—সে সবও তো আমাদের ঐ আগের বাড়িতে পার করে নিতে হবে।

মনোয়ার হোসেন আসমা বেগমকে প্রশ্ন করলো—ফুফাজী কোথায়? ইয়াসমীন আপার আব্বা। আসমা বেগম বললেন, উনি কি আর এসব চিন্তার মধ্যে আছেন? উনি আছেন ঐ গৌতম আর তার সঙ্গী মস্তানদের পেছনে বাতাস দেয়া নিয়ে।

একথায় মনোয়ার হোসেন বললো, তাহলে একটু দেখাই যাক না কি হয়? বাদীপক্ষকে ওরা যদি সত্যি সত্যিই ভাগিয়ে দিতে পারে, তাহেল তো আর এবাড়ি ছেড়ে যেতে হচ্ছে না এখনই। ভবিষ্যতেও হয়তো ছেড়ে যেতে না হতেও পারে।

ফারুক মাহমুদ হেসে বললো, খোয়াব দেখছিস দোস্ত? আদালতের রায় বানচাল করে দেবে ঐ মস্তান আর লম্পটেরা? তাহলে তো গোটা এই শহরটাই ওরা এতদিন দখলে নিয়ে বসে থাকতো।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ অর্থাৎ আইনতো আমি জানি, নাকি? আমি লোকটাকে তুই ভুলেই গেলি তাহলে? এটা হয় না। আইনের শক্তি আইন দিয়ে ছাঁদতে হয়, লাঠি দিয়ে ছাঁদা যায় না। একটু অপেক্ষা করে দেখ্, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়!

ঃ তাই নাকি? তাহলে তো ফুফু আম্মার এই ব্যস্ততা মোটেই অমূলক নয়? এত লট বহর নিয়ে হঠাৎ করে—

ঃ আরে থাম্ না। বললামই তো আমি বাদীপক্ষের লোকদের যথাসম্ভব সমঝাবো। তারা সময় দিলে কোর্টের আর আপত্তি করার কিছু থাকবে না।

ঃ না দিলে?

ঃ সেটা তখন দেখা যাবে। কোর্টে দরখাস্ত করলে কোর্টও—

এসব কথাবার্তা হচ্ছিল তলবদার সাহেবের ড্রইংরুমে। এই সময় বাইরে ভীষণ আর্তনাদ আর ভয়ার্ত চীৎকার শুরু হলো।

কোর্ট থেকে লোক এসেছে বাড়ির দখল নিতে শুনেই "মার, মার শালাদের। মেরে একদম ফ্ল্যাট করে দে? বলে জলসাঘর থেকে হুংকার দিয়ে বেরিয়ে এলো গৌতম নানকের দল। তাদের ধারণা ছিল, আদালত থেকে পেয়াদা-পিওন এসেছে বাদীপক্ষকে বাড়ির দখল নিয়ে দিতে। এক গাড়ীভর্তি পুলিশ নিয়ে যে থানার বড় দারোগা হাজির, তা তারা কেউ জানতো না। হৈ হৈ করে এসেই তারা দারোগা পুলিশের সামনে পড়ে গেল।

তাদের দেখেই দারোগা সাহেব সোল্লাসে বলে উঠলেন, আরে এইতো-এইতো সেই পলাতক আসামীরা! হারামজাদারা এখানে, শহরের এই মহল্লায়, এসে গাঢাকা দিয়ে আছে!

বলেই তিনি পুলিশ ফোর্সের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বললেন, এ্যারেস্ট, এ্যারেস্ট দেম্। কুইক। একজনও যেন পালিয়ে যেতে না পারে। উঃ! ব্যাটাদের খুঁজে খুঁজে কি হয়রানটাই হচ্ছি।

শুনে হেডকনস্টেবল বললো, সেকি স্যার, দিন দুয়েক আগে তো এরা আমাদের লক্ আপ্-এই ছিল! এদের তাহলে ছেড়ে দেয়া হলো কেন?

দারোগা সাহেব বললেন, আরে সে সব কি জানি? ছেড়ে দিয়েছেন সেকেণ্ড অফিসার। নেতা-নেত্রীদের চাপে দু'চার ঘা দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন। কোর্ট পর্য্যন্ত নেননি।

ঃ স্যার!

ঃ উনি নতুন লোক তাই জানতেন না যে, এদের ধরার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছুটে বেড়াচ্ছি আমি। এতদিন এদের ধরতে না পারায় আমার চাকরী যায় যায় অবস্থা। খুন-ধর্ষণ-লুট-প্রভৃতি আট দশটা কেসের এরা এক একজন আসামী। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের ছত্র ছায়ায় এরা বেঁচে যাচ্ছে এতদিন। যান, তুলুন ব্যাটাদের ভ্যানে—

হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে ইতিমধ্যেই গাড়ী ভর্তি সেপাইয়েরা ছুটে এসে ঘিরে ফেলেছিল গৌতম গংদের বন্দুকের নলের মুখে এদের গ্রেপ্তার করাও প্রায় শেষ করে ফেলেছিল। এবার হেড কনস্টেবল্ এসে সবার পাছায় বন্দুকের বাঁটের গুঁতো মারতে মারতে বলতে লাগলো, ওঠ কুত্তার বাচ্চারা, ঐ পুলিশভ্যানে ওঠ্। এতদিন ঘুঘুই দেখেছিস্ কেবল, তোদের নেতানেত্রীদের জোরে, ফাঁদটা দেখিস্নি। এবার চল্ থানায়। তোদের নেতানেত্রীরা হাত লাগানোর আগেই লক্আপে তুলে তোদের আজ সেই ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়বো—চল্।

হেড কনস্টেবলের দেখাদেখি অন্যান্য সেপাইরাও একই সাথে এদের পশ্চাৎভাগে বন্দুকের বাঁটের বাড়ি মারতে লাগলো। এক এক ঘায়ে গৌতম-নানকের দল আঁত্কে উঠে চীৎকার জুড়ে দিলো, ওরে বাবারে! মলামরে! বাঁচাও-বাঁচাও! ছেড়ে দেন স্যার, পায়ে পড়ি স্যার, আকাম-কুকাম আর জীবনেও করবো না!

আর্তনাদ শুনে ড্রইংরুম থেকে আস্মা বেগম সাহেবা, মনোয়ার হোসেন ও অন্যেরা ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এসে সবাই দেখলেন, পুলিশেরা তখন মাস্তানদের সবাইকে পুলিশ ভ্যানে তুলে ফেলছেন বন্দুকের বাঁটের শক্ত ঘা মেরে মেরে। আগন্তুকদের কেউ কেউ ঘটনা কি জানতে চাইলে সনাক্তকারী হিসাবে যে লোক এসেছিলেন, তিনি বললেন, সে সব পরে জেনে নেবেন। জেগে ঘুমাচ্ছেন নাকি সবাই। এবার বাড়িটা ভ্যাকেট্ করে দিন আপনারা।

এরপরে তিনি দারোগা সাহেবকে বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন, এই বাড়ি যারা দখল করে নিয়ে আছে, তাদের চিনিয়ে দিই আসুন—

দারোগা সাহেব সহকারে আগন্তুকেরা সবাই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লেন। এদের পেছনে পেছনে ফের বাড়ির ভেতরে চলে এলেন আসমা বেগম, মনোয়ার হোসেন ও অন্যান্য সকলেই।

ভেতরে এসে সনাক্তকারী খুঁজে খুঁজে তলবদার সাহেব, আস্মা বেগম ও ইয়াসমীন আরাকে ডেকে এনে এক জায়গায় করলেন এবং দারোগাকে বললেন, ঝি-চাকর নিয়ে আপাতত ইনারাই এই বাড়ি দখল করে আছেন স্যার।

দারোগা সাহেব বললেন, ঠিক আছে, এখনই এদের এ বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু বাদী কই? মানে, এই বাড়ির দখল নেবে কে? তাকে তো এখনো চিনলাম না।

বাদীপক্ষের তদবির কারক এবার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ফারুক মাহমুদকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে, এই নওজোয়ান স্যার। এই বাড়ির মানে এই সম্পত্তির আসল মালিক এখন এই লোক।

শুনামাত্র এই বাড়িতে উপস্থিত আত্মীয় বান্ধব সকলে চমকে উঠলেন এক সাথে। দারোগা সাহেব প্রশ্ন করলেন, এই নওজোয়ান, মানে এই লোক বাদী?

বাদীপক্ষের তদবির কারক বললেন, হ্যাঁ স্যার। এখন বাদী এই ফারুক মাহমুদ বাবাজী। আসল বাদী ছিলেন এর আব্বা ফিরোজ সাহেব। মামলার শুরুতেই তিনি মারা গেছেন। এখন তাঁর এই ছেলের পক্ষ হয়ে আমরাই এতদিন এ মামলা চালালাম। আদালত মূল বাদীর এই ছেলেকেই বাড়ির ও মিল কারখানার মালিকানা দিয়েছে আর তাঁর এই ছেলেকেই সব কিছুর দখল নিয়ে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

দারোগা, বাদীপক্ষের উকিল, সনাক্তকারী, মামলার তদবিরকারী ও আদালতের পিওন পেয়াদাবাদে এই বাড়িতে উপস্থিত সকলেই সীমাহীন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে একসঙ্গে আওয়াজ দিলেন, সে কি!!

মনোয়ার হোসেন বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, এই লোক বাদীর ছেলে মানে?

মামলার তদবির কারক বললেন, মানে, বাদী মরহুম ফিরোজ আহমদ সাহেবের ছেলে। ফিরোজ সাহেবের ইন্তেকালের পরে তাঁর এই ছেলেই বাদী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার হয়ে, অভিজ্ঞ উকিল মোক্তারের মাধ্যমে আমরা মামলা চালালাম কোর্টে। ফারুক মাহমুদ বাবাজীর সে জন্যে কোর্টে হাজির হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। সমস্ত কাজ আমরা করেছি।

মনোয়ার হোসেন ফের বিস্ময়ের অতল তলে তলিয়ে গেল। বিস্ময়ের অতল তলে তলিয়ে গেলেন এবাড়ির অন্যান্য সকলেই। কারো মুখে কোন কথা ফুটলো না। মনোয়ার হোসেন এবার ফারুক মাহমুদকে প্রশ্ন করলো, সে কিরে! এসব কি শুনছি? আমি স্বপ্ন দেখছি নাতো?

ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে এবং হাসিমুখে ফারুক মাহমুদ বললো, না দোস্ত, সবই বাস্তব আর সত্যি ঐ যে একদিন বলেছিলাম না, বৈষয়িক ব্যাপারে বিরাট এক সমস্যার মধ্যে আছি আমি। এই মামলাই সেই সমস্যা

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো! তা সে কথা তাহলে এতদিন গোপন রেখেছিলি কেন? আমাকেও বলিস্‌নি কি ব্যাপার?

ঃ বলতে আমি চেয়েছিলাম দোস্ত অত্যন্ত আগ্রহের সাথেই বলতে আমি চেয়েছিলাম। বলবো বলবো করতেই তুই এই বাড়ির আত্মীয়া নাজমা বেগম সাহেবাকে শাদি করে ফেললি। ফলে এদের কাছে আগেই সব ফাঁশ হয়ে যেতে পারে ভয়ে তোকেও আমি আর বলিনি। বিশেষ করে, এদের বাড়িতেই যখন আছি, নিরাপত্তার প্রশ্নে আর মামলার স্বার্থে এটা ফাঁশ হয়ে যাক— এটা আমি চাইনি

মনোয়ার হোসেন সরবে বলে উঠলো—কি তাজ্জব-কি তাজ্জব! তা ব্যাপার কি-সব খুলে বল্‌তো?

ঃ সে তো অনেক কথা।

ঃ হ্যাঁ, ঐ অনেক কথাই বল্।

ঃ ব্যাপারটা হলো, রাজনীতি নামের এই ভাল্লুকনীতির চাপে পড়ে ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করা আমার পক্ষে এমনিতেই খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ায় বড় বড় সব মামলাই সর্বপ্রথম আমার কোর্টে আসতো। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে বাদী-আসামী উভয় পক্ষ নিয়ে রাজনৈতিক নেতা নামের ছোট বড় দুই ঝাঁক অপদেবতা এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তো আমার ঘাড়ের উপর। এসব কথা তোকে আমি আগেই বলেছি। এসব কারণে চাকরী যখন ছাড়বো ছাড়বো করছি, ঠিক সেই সময় আব্বা ইন্তেকাল করলেন আর এত টাকা দিয়ে কেনা এই বিষয় সম্পত্তি বেহাত হতে চললো। মামলার বাদী না থাকায় মামলাটা খারিজ হয়ে যায় যায় অবস্থা। দেখেশুনে ছেড়ে দিলাম চাকরী। ছেড়ে দিলাম মানে রেজিগনেশান লেটার সাবমিট করে এসে হাত দিলাম এই মামলায়। বিজ্ঞ আইনজীবি নিয়োগ করে আব্বার বন্ধু স্থানীয় কয়েকজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত লোককে লাগিয়ে দিলাম এই মামলার তদবিরে।

ঃ তারপর?

তারপর একদিন কদর আলীকে সঙ্গে নিয়ে আমিও চলে এলাম এই রাজধানীতে। মামলার খোঁজ খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে এখানে বেশ কিছুদিন থাকবো বলে বাক্সো-পেট্‌রা বেঁধে নিয়ে চলে এলাম। থাকার জন্যে বাসা খুঁজতেই নসীবগুণে পেয়ে গেলাম এই মামলার বিবাদীরই দখলকৃত ঐ দোকানবাড়ি। যদিও খুব রিস্কি ব্যাপার হয়ে যায়, তবু সঙ্গে সঙ্গে এই দোকান বাড়িই ভাড়া নিয়ে দোকান খুলে বসে গেলাম। আমার পরিচয় যাতে করে ফাঁশ হয়ে না যায়, সেজন্যে অতিশয় সাধারণ লেবাসে আর সতর্ক ভাবে চলতে লাগলাম। এই শেষেরদিকে অবশ্য আমার সে সতর্কতা আর ছিল না। ধরা পড়ারও ভয় ছিল না তেমন আর। কারণ, এই বাড়ির সাথে ইতিমধ্যেই আমি একাকার হয়ে গেছি।

দুচোখ বিস্ফারিত করে মনোয়ার হোসেন বললো, বলিস কিরে! এই ঘটনা

ঃ হ্যাঁ দোস্ত, এই ঘটনা। ঐযে দুই একদিন আমাকে ঐ কোর্টের এলাকাতে দেখা গেছে বলে যে খবর পেয়েছিলি তুই, তা অন্য কারণে নয়, এই মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই সেখানে গিয়েছিলাম।

ঃ তাজ্জব! তোর পেটে পেটে এত!

শুধু তাজ্জবই নয়, ফারুক মাহমুদের পরিচয় ও কাহিনী শুনে চিন্তার অতীত তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন এ বাড়ির বাসিন্দারা ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই। তাদের বাকশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল। বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন বহিরাগত ব্যক্তিরাও দারোগা সাহেব

বিস্মিত কণ্ঠে মনোয়ার হোসেনকে প্রশ্ন করলেন, কি আশ্চর্য! তা আপনি এই ফারুক মাহমুদ সাহেবকে চেনেন?

জবাবে মনোয়ার হোসেন বললো, শুধু চিনিই নয়, এ আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ একজন মস্তবড় বিদ্বান ব্যক্তি আর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট। রেজিগনেশান লেটার সাবমিট করে এলেও এক্ষণে খবর, তার সে রেজিগনেশান এ্যাক্সেপ্টড্ হয়নি। কতৃপক্ষ তাকে লীভ উইদাউট পে করে রেখেছেন। এমন একজন সৎ আর বিজ্ঞ হাকিমকে ছাড়তে রাজী হয়নি। এর ফলে, এখনও উনি তার চাকুরীতেই আছেন

ঝটপট হাত তুলে পুলিশী কায়দায় সালাম ঠুকে দারোগা সাহেব বললেন, এক্সকিউজ্ মী! বেয়াদবী কিছু হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন স্যার।

ফারুক মাহমুদ হেসে বললো, আরে না-না, বেয়াদবী করলেন আপনি কোথায়? আপনার ডিউটি আপনি ঠিকভাবেই তো করে যাচ্ছেন।

দারোগা সাহেব খোশকণ্ঠে বললো, তাহলে হুকুম দিন স্যার আমি এদের বের করে দিই?

ফারুক মাহমুদ বললো, এদের কাদের?

দারোগা সহেব বললেন, এই বাড়িটা যারা দখল করে নিয়ে আছে তাদের আর তাদের ঝি চাকরদের

ঃ অর্থাৎ, এই তলবদার সাহেব, তাঁর স্ত্রী আর তাঁর এই মেয়েকে?

ঃ জি-জি। তার সাথে আর যাদের বলেন—

ঃ না দারোগা সাহেব, এঁদের কাউকেই না। ঝি-চাকরদেরও না। এঁদের বের করে দিলে বাড়ির দখল নেয়াই যে তাহলে হবে না আমার। এদের সাথে আমারও এবাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হবে। এদের ছেড়ে এখন তো আর আমি একা থাকতে পারবো না। সেটা আমার মৃত্যু তুল্যই হবে।

ঃ কেন স্যার, কেন-কেন?

ঃ কারণ তলবদার সাহেবের মেয়ে এই ইয়াস্মীন আবা বেগম আমার হবু স্ত্রী-উড্ বি ওয়াইফ তলবদার সাহেব আমার হবু শ্বশুর আর তাঁর স্ত্রী আমার হবু শাশুড়ী। ওয়াদাবদ্ধ ব্যাপার স্যাপার এসব আত্মীয়-স্বজন সব জুটেই গেছেন। আল্লাহ চাহে তো শাদিটা আমাদের আজ রাতেই সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। এদের বের করে দিয়ে আমি এখানে থাকবো কাকে নিয়ে?

ঃ স্যার!

ঃ এ মামলায় আমি জিতিনি ও.সি. সাহেব অনেক আগেই আমি হেরে বসে আছি। শুধু এই বাড়িঘর আর মিলকার-খানাই নয়, এর সাথে অনেক আগেই আমি আমার যথাসর্বস্ব এঁদের দিয়ে বসে আছি। এরপর আর দখল নেবো কি। আমার বলে তো রাখিনি কিছুই।

ঃ স্যার!

ঃ বের করে দেয়া যাদের একান্ত প্রয়োজন আর এই বিষয় বিত্ত আর বাড়িঘরের ত্রিসীমানা থেকে যাদের চিরদিনের মতো দূরে রাখা প্রয়োজন, তারা এখন আপনার পুলিশ ভ্যানে। ওদের নিয়ে যান। ওরা যেন আর এদিকে পা বাড়াবার সাহস না করে সেইটেই একটু অতঃপর নিশ্চিত করবেন কাইন্ডলী।

ঃ ও.কে.স্যার। এনিয়ে ভাববেন না। এরা এক একজন অনেকগুলো ভয়ংকর ভয়ংকর কেসের আসামী। অনেক কেসের সাজাপ্রাপ্ত আসামীও বটে। একবার যখন ধরতে পেরেছি বদমায়েশদের আর ছেড়ে কথা নেই অধিকাংশই পুলিশবাদী কেস্। কাজেই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাতে না পারি, আমরা ওদের আজীবন জেল হাজতে পচাবোই। এখন আসি তাহলে?

ঃ থ্যাংক হউ, আসুন।

ভ্যানভর্তি আসামী আর দলবল নিয়ে দারোগা সাহেব চলে গেলেন। এবার আস্মা বেগম আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, ফারুক মাহমুদ! বাপজান! সোবহান আল্লাহ! এতবড় মানুষ তুমি! সাবাস দেই আমার ইয়াসমীন আম্মার পছন্দ আর তার নসীবকে।

ফারুক মাহমুদ বিনীত কণ্ঠে বললো, আমাকে ক্ষমা করুন আম্মা। আপনাদের কাছে যে লুকোচুরি করতে হয়েছে আমাকে, তা নিতান্ত দায়ে পড়েই করতে হয়েছে— ইচ্ছে করে নয়। সেজন্যে দয়া করে আপনারা সবাই আমাকে মাফ করে দিন।

ইয়াসমীন আরা এবার ফুঁশে উঠে বললো, সবাই মাফ করলেও এমন একজন বর্ণচোরা, প্রবঞ্চককে আমি মাফ করবো না। কখ্খনো না

প্রত্যুত্তরে ফারুক মাহমুদ কপট খেদে বললো, না করলে এখানকার সব কিছু ফেলে ছুড়ে দিয়ে আমিও আমার নিজের ঠিকানায় চলে যাবো। জীবনেও আর এদিকে আসবো না—কখ্খনো না।

www.boighar.com

ইয়াসমীন আরা বললো, না এলে বয়েই গেল! কদর আলীর কাছ থেকে আগেই সে ঠিকানা নিয়ে রেখেছি আমি।

বলেই ইয়াসমীন আরা হাসি চেপে সেখান থেকে দ্রুত সরে যেতে লাগলো। তাকে উদ্দেশ্য করে নাজমা বেগম উচ্চকণ্ঠে বললো, তাহলে তার অর্থটা কি দাঁড়ালো রে ইয়াসমীন?

www.boighar.com

জবাবে মনোয়ার হোসেন বললো, অর্থটা বুঝলে না? কম্লা ছাড়লেও, কুম্লী নেহি ছোড়ে গা'

মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগেলেন আস্মা বেগম সাহেবা। সশব্দে হাসতে লাগলেন উপস্থিত সকলেই

স মা প্ত

বইঘর ও রোকন